ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার

ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী এম্. এ., পি, এইচ্. ডি.

বাণীকণ্ঠ, ভক্তিরত্ন, শাস্ত্রী, বাচস্পতি

অধ্যাপক, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা



প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৩৩ কলেজ রো • কলিকাতা ৯

BHARATIYA SAMSKRITIR UTTARADHIKAR

[Cultural Heritage of India]

By

Dr. Dhyanesh Narayan Chakrabarti
M. A., Ph. D. Vanikantha, Bhaktiratna,
Shastri, Vachaspati
Prof. Rabindra Bharati University, Calcutta

Published by :
Sri Nitai Chandra Bhakta
Progressive Book Forum
33, Collage Row. Calcutta—9
India.

First Publication
19th, August, 1959

প্রকাশক : শ্রীনিতাই চন্দ্র ভক্ত, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৭০০০০৯
মুদ্রাকর : শ্রী নিমাই চন্দ্র ভুঁইঞা, বর্ণশ্রী প্রেস, ১/১ এ বৈকুণ্ঠ সম্মিলনী লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

শ্রীঃ

ভূমিকা

জন্ম, দীক্ষা ও শিক্ষা সূত্রে শাশ্বত ভারতীয় সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে এই দীন সারস্বত পরিবর্ধিত। এই সনাতনী সংস্কৃতির সর্বতঃপ্রসারী রূপ যতই দেখেছি, ততই বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হয়েছি। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তার বিচার করেছি, বর্তমান যুগ-জিজ্ঞাসার উত্তরও তাতে যথেষ্ট পেয়েছি। শ্রদ্ধাসহকারে সাধনার দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক সকল দিকেই আমাদের মহনীয় এবং বরণীয় উত্তরাধিকার এই সংস্কৃতি হতে আমরা লাভ করতে পারি। দীর্ঘকাল ধরে যৎসামান্য অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ এবং সমীক্ষণের পর সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে কখনো অন্তরের তাগিদে, কখনো বা অনেকের অনুরোধে নানা নিবন্ধ লিখতে হয়েছে; বলতে হয়েছে এবং হচ্ছেও প্রচুর। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বহু মনীষী সাধুবাদে ধন্য করেছেন। আমাদের বিশাল সংস্কৃতির সার্বভৌম রূপটি শ্রদ্ধাবানের কাছেই উন্মোচিত হয়। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্" গীতার বাণীটি সর্বক্ষেত্রেই অর্থবহ। ক্ষুদ্র পরিসরের জীবনে স্বল্প সময়ে এই বিপুল সংস্কৃতির কতটুকুই বা জানতে পারি। তবুও "যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই"। বিচিত্র জীবনের সকল বিষয়েই আকর্ষণ অধমকে অনেকটা পল্লবগ্রাহী করেছে। তারই কিছুটা নিদর্শন হয়তো বর্তমান নিবন্ধাবলী।

মদীয় অধ্যাত্ম গুরুদেব ভুবনমঙ্গল বিগ্রহ শ্রীমৎ সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব, পিতৃদেব কবিশেখর বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ, মাতৃদেবী বাৎসল্য-মূর্তি মহামায়াদেবী, শাস্ত্র-সুহৃদ্ ধর্মরত্ন ডঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, সংস্কৃতিমূর্তি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষাগুরু ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ মনস্বিমণ্ডলীর আগ্রহ এবং উৎসাহে অনেকগুলি নিবন্ধ রচিত হয়েছিল। বিশেষ করে সম্প্রতি অমৃতলোকগত কল্যাণ-মিত্র, সারস্বতাগ্রজ, ডঃ গোপিকামোহন ভট্টাচার্য এবং ডঃ সোমেন্দ্র নাথ বসু, যাঁরা ছিলেন আমার বহু সাংগঠনিক কর্মের নিষ্কাম, নিরন্তর অভিন্ন-হৃদয় সঙ্গী, তাঁদের অনুরোধে বিশেষ কয়েকটি প্রবন্ধ রচিত হয়েছিল। সহধর্মিণী শ্রীমতী ঊষা দেবী ও পুত্র শ্রীমান্ নির্মাল্য নারায়ণের অবিরাম তাগিদ এবং প্রকাশক শ্রীযুক্ত নিতাই চন্দ্র ভক্তের তৎপরতা ও আগ্রহেই প্রবন্ধাবলীর গ্রন্থরূপে কলেবরে গ্রহণ। নিবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে রচিত হয়েছিল। তাই, বর্তমান গ্রন্থে তার স্থানে স্থানে ঈষৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্পাদিত হলেও সাময়িকতার স্পর্শ ও পুনরুক্তি কোথাও কোথাও রয়েছে। নানা কারণে মুদ্রণ প্রমাদ কিছু কিছু থাকায় শুদ্ধিপত্র দেওয়া হল। আমার তত্ত্বাবধানে গবেষণা-সিদ্ধ সারস্বত ডঃ শ্রীপুলিন রঞ্জন

সূচীপত্র

সংস্কৃতির সংকটে ভারত

চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিকদের মতে মানব সভ্যতা আজ সংকটাপন্ন। ভোগের প্রতিক্রিয়া, অস্ত্রের প্রতিযোগিতা এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্তমানের সাংস্কৃতিক প্রগতির দুর্লক্ষণ। বিভিন্ন সংস্কৃতির উদয়, বিলয় এবং সমন্বয়ে বিশ্ব সভ্যতার ইতিচক্র হয় আবর্তিত। নিজের মৃত্তিকা এবং আকাশকে অস্বীকার করে কারোই উজ্জীবন এবং বিবর্ধন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সম্ভব নয়। তাই, আমাদের আত্মরক্ষা এবং আত্মোন্নয়নের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির তুলনামূলক বিচারের মাধ্যমে মূল্যায়ন এবং যথার্থ পন্থার অনুসরণ আজ একান্ত অপেক্ষিত।

যুগজিজ্ঞাসার জলধিতরঙ্গে ভারতের আধুনিক চিত্ত আজ বিক্ষুব্ধ। অষ্টাদশ শতকে প্রতীচ্যে ঘটে গেছে শিল্পবিপ্লব। ভৌগোলিক জয়যাত্রা এবং বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে সেদিন ইউরোপের জীবন-সমুদ্রে যে তরংগ উঠেছিল সেটি ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের মানসতটে এসে প্রতিহত হ'ল। ফলে প্রসুপ্ত জাতির দীর্ঘ নিদ্রা গেল টুটে। নবজাগৃতি তথা রেণেসাঁর জোয়ারে নবোত্থিত জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধানে সেদিন নব্যভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় যাত্রা করল প্রতীচ্যের ভাবজগতে। সাংস্কৃতিক দাসত্বের (Cultural Slavery) শৃংখলে বাঁধা পড়ল ভারতের শিক্ষিত চিত্ত। তখনই আবার মনীষী ভুদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ন্যায় একদল মনীষী জাতিকে আত্মস্থ হবার পথে জানিয়েছিলেন উদাত্ত আহ্বান। তাঁদের সে আহ্বানে জাতির একটা অংশ সাড়া দিয়ে কল্যাণের পথে হয়েছিল অভিযাত্রী। বিংশ শতাব্দীর তথা রাজনৈতিক স্বাধীনোত্তর ভারতের সমস্যা আরো জটিল। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতা এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ আজ আবার আমাদের ঘরছাড়া এবং লক্ষ্মীছাড়া করতে চলেছে। নানা আপাতলোভনীয় মানস ভোজ্যের পশরা নিয়ে আমাদের ক্ষুধার্ত চিত্তকে আজ তারা প্রলুব্ধ করছে। 'দেশ দেখা চোখ হারানো' বৈদেশিক ভাব-দাস নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে ও শিক্ষায় বহির্মুখ পতঙ্গের ন্যায় আত্মসম্বিৎ হারিয়ে, আমরাও চলেছি আত্মিক আত্ম-হত্যার অশুভ পথে। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা চলে—

"মাতালের পক্ষে মদ্য যেরূপ খাদ্য অপেক্ষা প্রিয় হয়, আমাদের কাছেও দেশহিতৈষণার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড় হইয়া উঠিয়াছিল। যে দেশ প্রত্যক্ষ, তাহার ভাষাকে অপমান করিয়া, তাহার ইতিহাসকে অস্বীকার করিয়া, তাহার সুখ দুঃখকে নিজের জীবনযাত্রা হইতে বহুদূরে রাখিয়াও আমরা দেশহিতৈষী সাজিতেছিলাম।"

দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি-ধর্ম তথা দেশের সামগ্রিক রূপকে অবজ্ঞা, অস্বীকার এবং অপমান করে দেশহিতৈষণার প্রমত্ততা বর্ত্তমান সর্বগ্রাসী রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। স্বদেশের সব কিছুকে লঘু ক'রে দেখবার এবং বিদেশী চশমার রঙ্গীন দৃষ্টিতে জাতীয় জীবনকে বিচার করার শিক্ষা এবং দীক্ষা নিরন্তর দিয়ে চলেছেন এক শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী। ভারতের ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ভারতের দৃষ্টিতে আলোচিত না হয়ে হচ্ছে প্রতীচ্যের দৃষ্টিতে। তাতে সরল জনসাধারণ এবং উৎসাহী তরুণ সম্প্রদায় বিভ্রান্ত হয়ে এবং অনেকটা অন্ধতাবশতঃ স্বদেশীয় সংস্কৃতির যথার্থ মূল্যায়নে আজ বিমুখ ও অক্ষম। তাই বিশ্ব ইতিহাসের পটভূমিকায় ভারতীয় ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য সবার সামনে আজ তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন। যে সাম্যবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং মানবকল্যাণ-বোধের নামে জনগণ ও তরুণ সম্প্রদায়কে বিদেশীয় ভাবাদর্শে প্রলুব্ধ করা হচ্ছে সেগুলো ভারতীয় শাশ্বত জীবনাদর্শে যে অনেক পূর্ব থেকেই আরো বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এবং মঙ্গলকর রূপে বর্তমান ছিল, সেটা আজ তথ্যযোগে উপস্থাপিত করা আত্মস্থ ব্যক্তিদের অবশ্য কর্তব্য। ভারতীয় ধর্মাদর্শের অনুশীলন কেন্দ্রগুলিকে এই পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনে আজ সমবেতভাবে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ ক'রতে হবে। নৈলে ভারতের ও বিশ্বের মহতী বিনষ্টিকে কখনো ব্যাহত করা যাবে না।

বিশ্ব-ইতিহাসের এক অপূর্ব বিস্ময় ভারতীয় সংস্কৃতি। গ্রীস, রোম্, ব্যাবিলন, মিশর এবং মহাচীনের সংস্কৃতিও প্রাচীনত্বের গৌরবে ধন্য। কিন্তু এই সব অতীত সভ্যতার স্রোতোধারা অনেকদিন হল কালের মরুপথে হারিয়ে গেছে। সেই সব প্রাচীন সংস্কৃতি আজ ঐতিহাসিকের গবেষণায় বিষয়ে পরিণত হ'য়েছে। বর্তমানে সেই সকল ভূখণ্ডে জেগে উঠেছে এক নূতন জীবনাদর্শ, উড্ডীন হ'য়েছে এক নবীন সংস্কৃতির জয়পতাকা। লুপ্ত হয়ে গেছে তার অতীত ধর্ম ও জীবনধারা।

মুখ্যতঃ, বৈদেশিক আক্রমণের ফলে রাজনৈতিক পরাধীনতা এবং তারই অনিবার্য ফল সাংস্কৃতিক পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হবার জন্যেই সেই সকল দেশের জনসাধারণ স্বকীয় সংস্কৃতিকে ভুলে যেতে বাধ্য হয়েছে। রাজনৈতিক পরাধীনতার (Political Slavery) অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল সাংস্কৃতিক পরাধীনতা (Cultural Slavery)। নবাগত বিজয়ীদের প্রবল রাজনৈতিক শক্তি, নিষ্ঠুর অত্যাচার, কোথাও কোথাও উচ্চতর জীবনাদর্শ এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নবাগত সংস্কৃতির গুরুত্বের জন্যেই ঐ সব দেশের অতীত সভ্যতা স্বাভাবিকভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ভারতের বুকেও বৈদেশিক আক্রমণকারীদের উন্মাদ-নৃত্য মোটেই কম হয়নি। শক-হূণ-পাঠান-মোগল "...ধারা বাহি, জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে" এসে বারংবার

ভারতভূমিকে বিধ্বস্ত করেছে। বিদেশী বিজয়ীরা এক হাতে অস্ত্র, আর এক হাতে তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে সন্ত্রাসের সৃষ্টি ক'রেছিলো এই দেশে। বক্তিয়ার উদ্দিন খিলজি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ ক'রে নির্বিচারে সকল আবাসিককে হত্যা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল গ্রন্থাগারের হস্তলিখিত অমূল্য গ্রন্থরাজির বিপুল সঞ্চয়কে জ্বালানী কাষ্ঠরূপে সদ্ব্যবহার করে তাঁর সৈন্যবাহিনীর ছয় মাসের রান্নার কাজ চালিয়েছিলেন। "তুজুক্-ই-ফিরোজশাহী"তে আছে, ফিরোজ্-শা-তুঘ্লক্ পরমানন্দে ছয় লক্ষ পুরুষ কাফেরকে হত্যা ক'রে তাদের রক্তে চিল্কা হ্রদের জলকে রঞ্জিত ও ঘনীভূত ক'রেছিলেন আর বৃদ্ধা এবং একেবারে বালিকাদের শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলে রেখে সকল যুবতী নারী এবং সবারি স্বর্ণ রৌপ্য ও মণিমাণিক্যাদি লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে যান। মোগল পাঠানদের অত্যাচারে সারা ভারতে কতবার রক্তস্রোত প্রবাহিত হ'য়েছিল, শিল্পসুষমাসমৃদ্ধ কত মন্দির ধূলিসাৎ হ'য়েছিল, কত নারী অপহৃতা এবং ধর্ষিতা হ'য়েছিল, তার ইয়ত্তা নেই। তাদেরই পশুসুলভ কামপ্রবৃত্তি হ'তে আত্মরক্ষার জন্য বহু সহস্র রাজপুত নারী জহরব্রতের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় জ্বলন্ত বহ্নিতে আত্মবিসর্জন ক'রেছিলেন। এই সব চরিত্রহীন আক্রমণকারীদের কামবহ্নিতে মাতা-জায়া-কন্যাকে সমর্পণ করতে রাজী না হওয়ার একমাত্র অপরাধে সমগ্র রাজপুত জাতি কি ভাবে নির্যাতিত হ'য়েছে, তা সর্বজনবিদিত। বিধর্মী মোগলদের নিরন্তর নিষ্ঠুর নির্যাতন হ'তে আত্মরক্ষার জন্যই সনাতন হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত শক্তিশালী শিখ সম্প্রদায়কে বাধ্য হয়ে সশস্ত্র খালসা হতে হ'য়েছিল। শিখ গুরু তেগবাহাদুর এবং গোবিন্দ সিংহের জীবনের ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনাবলী স্মরণীয়। রক্তে এবং নীতিতে তাদেরই উত্তরপুরুষদের এই আচরণ বিংশ শতাব্দীতেও আজ প্রাক্স্বাধীন এবং স্বাধীনোত্তর পূর্ববঙ্গে কিভাবে সুপরিকল্পিতভাবে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হ'চ্ছে, তা কারো অজ্ঞাত নয়। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরুর "Glimpses of World History"-তে রয়েছে সোমনাথ মন্দিরে যে পঞ্চাশ হাজার নারী এবং শিশু আশ্রয় নিয়ে ছিলো, তাদের সবাইকে গজনীর সুলতান মাহ্মুদ একদিনেই হৃষ্ট চিত্তে পৈশাচিক উল্লাসে হত্যা করেন। পণ্ডিত নেহেরুর ন্যায় অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিও উল্লিখিত গ্রন্থে সত্যের খাতিরে লিখতে বাধ্য হয়েছেন—

"Muslim Arabs came and went and built mosques, and some times preached their religion and some times even converted people......It was only when in the eleventh century Islam came to India in the guise of a conqueror, sword in hand, that it produced a violent reaction and the old toleration gave away to hatred and conflict.

This wielder of the sword who came to India with fire and slaughter was Mahmud Ghazni......Year after year he raided India and sacked and killed and took away with him vast treasure and large numbers of captives. Altogether he made seventeen raids and only one of these into Kasmir was a failure, The others were successfull, and he became a terror over the North. He went as far South as Pataliputra, Mathura and Somnath. From Thaneswara he took away, it is said, 200,000 Captives and vast wealth. But it was Somnath that he got the most treasure. For, this was one of the great temples, and the offerings of centuries had accumulated there. It is said that thousands of people took refuge in the temple when Mahmud approached, in the hope that a miracle would happen and the god they worshippled would protect them. But miracles seldom occur, except in the imaginations of the faithful, and the temple was broken and looted by Mahmud and 50,000 people perished, waiting for the miracle which did not happen. (Glimpses of World Hist.—Pt. Jawaharlal Nehru. P—154—155)

তারপর বৃটিশ সরকারের অত্যাচার আরো সূক্ষ্ম এবং সুদূরপ্রসারী। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা এবং দূরদর্শিতার সঙ্গে সুকৌশলে এই দেশবাসীকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দাসে পরিণত করার গভীর চক্রান্ত এবং প্রবল প্রয়াস ছিল বৃটিশ শাসনের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। এতো নির্যাতন এবং আজো এতো প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতি যে বিলুপ্ত হয়নি, এইটাইতো ইতিহাসের এক মহা বিস্ময়, ঐতিহাসিক স্যার আর্ণল্ড্ টয়েন্‌বী বলেছেন—Wonder of World History।

ভারতের গৌরবময় ইতিহাস না জানার ফলেই অনেকেই এখন প্রতীচ্য ভাবাদর্শের 'হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে' বিভ্রান্ত হয়ে বহির্মুখ'পতঙ্গের মত আত্মবিস্মৃতি এবং পরানুকরণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক আত্মহত্যার পথে ছুটে চ'লেছে। বিজাতীয় শিক্ষায় এবং ভাবাদর্শে "দেশ দেখা চোখ হারানো" স্বাধীন ভারতের নেতৃবৃন্দ সেই আত্মহননের পথেই আমাদের এখনো পরিচালিত ক'রছেন। ঊনবিংশ শতকের স্থিতধী, দূরদর্শী মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় 'স্বধর্মবিদ্বেষ' এবং 'স্বজাতি-বিদ্বেষ'কেই মূলধন ক'রে নিয়ে তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর প্রগতির পথে যাত্রা। **পরানুকরণ এবং প্রগতির সীমারেখা** তাঁদের মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে হারিয়ে গেছে। পরিণামে জাতির

অশেষ দুর্গতি। ভারতবন্ধু খৃষ্টধর্মাবলম্বী ইংরেজ মনীষী, সত্যদর্শী বিচারপতি, অসাধারণ পণ্ডিত, তন্ত্র সাধক স্যার জন্ উড্রফের কথাগুলি আত্মজিঘাংসু ভারতীয়দের চৈতন্য-সম্পাদনের জন্য আজো স্মরণীয়—

"India lives because of the world purpose, which she has to fulfil ; because the world will be enriched by what she can give to it. The Indian youths of today are the custodians. Proud of their guardianship, let them cast aside false shame of themselves and their own, as also fear and sloth."

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন পৃথিবীতে যার প্রয়োজন আছে সেটিই বেঁচে থাকে, আর যার প্রয়োজন শেষ হ'য়ে গেছে সেটি বিলুপ্ত হ'য়ে যাবেই। এতো প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতি যে আজো বিলুপ্ত হ'য়ে যায়নি, তার কারণ এখনো বিশ্বের প্রয়োজনেই, এই সংস্কৃতিকে বেঁচে থাক্‌তে হবে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দেরও এইটেই হল অভিমত। Survival of the fittest—সূত্র এখানে প্রযোজ্য।

যুগ যুগান্ত ধ'রে প্রবহণশীলা এই অখণ্ড ভারতীয় সংস্কৃতির চিরন্তনী ধাত্রী অমৃতময়ী সংস্কৃত ভাষা। এই সংস্কৃতির মতো এই ভাষাও চিরসঞ্জীবিতা। প্রথম জীবনে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামরিক চিকিৎসক, এবং পরে সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ বিদেশী মনস্বী স্যার হোরেস্ হেম্যান্ উইল্‌সন্ এই সংস্কৃত ভাষাতেই সংস্কৃতের বন্দনা রচনা ক'রে ব'লেছেন—

> "অমৃতং মধুরং সম্যক্ সংস্কৃতং হি ততোঽধিকম্।
> দেবভোগ্যমিদং যস্মাদ্ দেবভাষেতি কথ্যতে ॥
> ন জানে বিদ্যতে কিং তন্মাধুর্যমত্র সংস্কৃতে।
> সর্বদৈব সমুন্মত্তা যেন বৈদেশিকা বয়ম্ ॥
> যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাৎ যাবদ্ বিন্ধ্য-হিমাচলৌ।
> যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্ ॥"

এই সংস্কৃত ভাষায় পরিণত জ্ঞানের অভাবের জন্যই ভারতীয় সংস্কৃতির সম্যক্ পরিচয় অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতীয়ের এখনো অজ্ঞাত। আজ যখন নবোত্থিত জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর-সন্ধানে অনেক ভারতীয় অন্যান্য দেশের সংস্কৃতি-ভাণ্ডারের দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ ক'রে চলেছে, তখন স্বামীজীর ভাষায় ব'ল্‌তে হয়,—"বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইয়াছে।" মাইকেল মধুসূদনের ভাষায় বলা চলে—

> "পরধনলোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ পরদেশে,
> ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি ॥"

যে সব মহদ্‌ভাবরাজির সন্ধানে যাঁরা আজ ইংল্যাণ্ড-আমেরিকা, ফরাসী-জার্মেণি, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের দ্বারস্থ হ'চ্ছেন, তখন তাঁদের স্মরণ

কর্তে বলি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক Will Durant এর কথাগুলি—

"India was the motherland of our race, and Sanskrit the mother of Europe's languages; she was the mother of our Philosophy, mother through the Arabs of much of our mathematics, mother through the Buddha of the ideals embodied in Christianity; mother through the village-community of self-goverment and democracy. Mother India is in many ways the mother of us all"

এই গৌরবময় ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বল রূপরেখার দু'একটি সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করা যাক্। মানুষের কল্যাণ এবং বিশ্বের উন্নয়নই নাকি পৃথিবীর সকল মতবাদের পরম লক্ষ্য। কিন্তু, ভারতীয় সংস্কৃতির সনাতন তথা হিন্দু সাধকবর্গ ব্যতীত আর সকল মতবাদীরাই মনে করেন তাঁদের নিজ নিজ মতবাদই মানবের কল্যাণ এবং বিশ্বের উন্নয়নের একমাত্র অকৃত্রিম পন্থা। সেই সেই মতাদর্শের বহির্ভূত ব্যক্তিরা অতীব দুর্জন, কোথাও গণশত্রু, কোথাও শ্রেণীশত্রু এবং কোথাও বা ধর্মশত্রু। তাই, সেই হতভাগ্যদের স্বীয় মতে স্থিত হ'য়ে বেঁচে থাকার অধিকার দিতে এই সব সমুদার মানবকল্যাণীরা সম্মত নন। নিজের ধর্মের, দলের বা গোষ্ঠীর প্রাচীরের অভ্যন্তরে যাঁরা বাস কর্ছেন, তাঁদের প্রতি সজ্জন-দুর্জন নির্বিশেষে অনেক সময় তাঁরা সহৃদয় ও সমদর্শী। কিন্তু, সেই প্রাচীরের বাইরের নিখিল বিশ্ববাসীর প্রতি তাঁরা হিংসান্ধ ও মদান্ধ। মধ্যযুগে ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ধর্মোন্মত্ততা কি ভাবে বিধর্মীদের ধর্মান্তরিতকরণ এবং নিধনের ভূমিকা রচনা করেছিল, তা ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন। করুণাঘন যীশুখৃষ্ট এবং সমদর্শী মহম্মদের তথাকথিত অনুগামীদের অস্ত্রবলে আত্মপ্রসারের অভিযান তার উজ্জ্বল নিদর্শন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, পারমাণবিক বোমার প্রয়োগ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের উপর অত্যাচার, ভিয়েৎনামে বহুবর্ষ ধরে নিষ্ঠুর লোকনির্যাতন খৃষ্টধর্মাবলম্বীদেরই কারুণ্য। খৃষ্ট জগতের ধর্মসম্রাট রোমের পোপ এবং নোবেল পুরস্কৃতা করুণাময়ী মাতা টেরেসার সেবার আড়ালে ধর্মান্তরিত করণে যথেষ্ট উৎসাহ। কিন্তু খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের দ্বারা এই সব অমানবিক নিষ্ঠুরতা নিয়ে এই করুণার অবতারদের আশ্চর্য নীরবতা লক্ষণীয়। আরো আশ্চর্যের কথা এই করুণাময়ীদের সংস্কার দ্বারা ভারতে উত্তর পূর্বপ্রান্তের যে নাগা, মিজো, ত্রিপুরীরা ধর্মান্তরিত হ'য়ে আলোকিত হ'য়েছে, তারা নিরন্তর নিষ্ঠুর নর হত্যার দ্বারা সন্ত্রাস সৃষ্টি ক'রে ভারতের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বকে সংকটাপন্ন ক'রে তুলছে। এই দেশদ্রোহিতা এবং নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এই কারুণ্যের প্রতিমূর্তি মাতা-পিতা-

ভ্রাতারা কখনও একটি কথাও বলেন না। পশ্চিম পাকিস্তানকে হিন্দুশূন্য করা, পূর্ববঙ্গে বার বার হিন্দুনিধন ও নির্যাতন, মাতৃজাতির উপর সরকারী ও সামাজিক প্রশ্রয়ে এবং ধর্মনেতাদের গোপন ও প্রকাশ্য সমর্থন ও উৎসাহে বর্বর অত্যাচার, তথা নির্লজ্জ ভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন ইসলামী সাম্যের অধুনাতন সংস্করণ। এই সব ধর্মের বাইরে যারা আছে তারা নরকগামী। তাই করুণাপরবশ হ'য়ে তাঁরা এই হতভাগ্য নরকগামীদের নির্যাতন এবং নিধনের মাধ্যমে স্বর্গের স্বর্ণলোকে প্রেরণ ক'রে মহদুপকারই সাধন ক'রছেন ব'লে সরলভাবে বিশ্বাস করেন। মানুষকে এইভাবে স্বর্গের পথে নিয়ে যাওয়া তাঁরা পুণ্যকর্ম ব লেই মনে ক'রেছেন। অবিকৃত ইতিহাসের এই হ'ল সাক্ষ্য। কোরাণাদি ধর্মগ্রন্থে রয়েছে এর স্পষ্ট নির্দেশ।

মুক্তবুদ্ধি সন্ন্যাসী, ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ, সর্বধর্মসমভাবের প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনে ১৮ই নভেম্বর ১৮৯৬তে Practical Vedanta নিয়ে দীর্ঘ ভাষণ কালে ঐস্লামিক মানব প্রীতির স্বরূপ বিশ্লেষণে বলেছেন—

There has not been a religion that has clung to this dualism more than that founded by the prophet of Arabia, and there has not been a religion which **has shed so much blood and been so cruel to other men.** In the Koran there is the doctrine that a man who does not believe these teachings should be killed ; it is a mercy to kill him ! And the surest way to get to heaven, where there are beautifull houris, and all sorts of sense-enjoyments, is, by killing these unbelievers. Think of the bloodshed there has been in consequence of such beliefs !

[Practial Vedanta. P—90] Advaita Ashram—

বর্তমান যুগে ধর্মীয় প্রস্থানের স্থান নিয়েছে রাজনৈতিক মতাদর্শ। এখনো চলছে সেই পুরাণো অসহিষ্ণুতা এবং ছলে বলে কৌশলে ভিন্ন মতাবলম্বীদের দলান্তরীকরণ, নইলে নির্যাতন ও নিধন। বিশ্বমানবের কল্যাণের নামে বিশ্বধ্বংসের মহড়ায় এই সব তথাকথিত মানবদরদীরা আজ নির্লজ্জ প্রতিযোগিতায় যুযুধান এবং নির্মম। বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের বিশ্বধ্বংসের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিংশ শতাব্দীর কলঙ্কময় ইতিহাস। সবল রাষ্ট্রের দুর্বল রাষ্ট্র তথা জনগণের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচারে বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ আজ নীরব। তিব্বত, পূর্ববঙ্গ, হাঙ্গেরী, ভিয়েৎনাম, কাম্পুচিয়া, পোল্যাণ্ড এবং আফ্গানিস্তানের সাম্প্রতিকতম ঘটনাবলীতে রাষ্ট্রসংঘের নীরবতা লক্ষণীয়। এই বিংশ শতাব্দীর প্রগতির যুগে দেশে দেশে কিভাবে নির্লজ্জ-ভাবে রাজনীতির

নামে নিষ্ঠুর ভাবে নরহত্যা চলেছে সেই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী মনীষী ৺ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬০ সনের অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বসু স্মারক ভাষণমালায় তথ্যসহ পরিসংখ্যান দিয়ে বলেছেন—

"রুশিয়া—জগতের মধ্যে রুশিয়া এক বিশেষ শক্তিশালী রাষ্ট্র। সম্রাট (Tsar) দিগের রাজত্ব চলিয়া গেলে যে রাষ্ট্রনায়ক হইতেছে সে নিজে শিরচ্ছেদ হওয়ার ভয়ে ভীত। ষ্ট্যালিনের পরে ম্যালিনকভকে বধ করা হয় ও পুলিশের যে কর্ত্তা হইয়াছিল তাহাকে হত্যা করিয়া হত্যাকারী তাহার আসনে বসিয়াছে। (কেবল সর্ব্বশেষে যিনি ছিলেন তাঁহাকে অবসর লইতে অনুমতি দেওয়া হয় ও নগণ্য হইয়া জীবন-যাপন করিতে দেওয়া হইয়াছে)।

রুশিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সকলের মঙ্গলের জন্য লক্ষ লক্ষ লোককে খুন করা হইয়াছে ও এক প্রদেশের সমস্ত অধিবাসীকে সাইবেরিয়াতে কারাগারে থাকিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

ক্যাটিন অরণ্যে (Katyn forest) ৫৫০০০ হতভাগ্য পোল্যাণ্ড বাসীকে ধীরে ধীরে খুন করিয়া গোর দেওয়া হইয়াছে। জার্মানীরা ষ্ট্যালিনকে দোষ দেয়। কিন্তু ষ্ট্যালিন বলে যে জার্ম্মানিরা ইহা করিয়াছে। পরে জানা গিয়াছে ঐ অপকর্ম্মটি ষ্ট্যালিনেরই কাজ। ষ্ট্যালিন এতকাল মিথ্যা বলিয়া আসিয়াছে।

জার্ম্মানি—২০ বৎসর পূর্ব্বে ৬০ লক্ষ ইহুদিকে ইউরোপের সভ্য সমাজে থাকার অনুপযুক্ত বলিয়া খুন করা হইয়াছে। এইরূপ কাণ্ড এখন বন্ধ হইলেও ঘৃণার ভাব কি একেবারে গিয়াছে?

তুরস্ক—১৯২০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি আতাতুর্ক কামাল পাশার আমলে—আর্ম্মিনীগণ তুরস্কের নূতন জাতীয়তার সহিত যোগ দিতে পারিল না। এজন্য তাহাদিগকে খাইতে না দিয়া ও বেওনেটের খোঁচা দিয়া ১০ লক্ষ আর্ম্মিণীকে গোপনে বধ করা হইয়াছে। (আমেরিকা হইতে প্রকাশিত টাইম পত্রিকা ২৬-৭-৬০ তারিখের সংখ্যা হইতে প্রাপ্ত।)

চীন—আমাদের ভারতবর্ষের উত্তরে জনবহুল চীন দেশ। সে দেশে লোকে কিরূপ সুখে আছে দেখা যাউক। চীনে নূতন শাসনতন্ত্র হইয়াছে। সে শাসন যাহারা ভালভাবে মানিয়া লইতে পারে নাই তাহাদিগকে যথারীতি বধ করা হইয়াছে। হতের সংখ্যা প্রায় ২॥০ কোটি হইবে। (নিরপেক্ষ লোকের মতে)। চীন তিব্বতে যাহা করিয়াছে—চক্ষু উপড়াইয়া ফেলা, জীবন্তে ছাল ছাড়ানো—সেগুলি না হয় না বলিলাম—এই হইল চীনাদিগের অগ্রগতির পরিচয়।

অ্যালজিরিয়া—অ্যালজিরিয়ার স্বাধীনতা লাভের যুদ্ধেপ্রায়ই খবর পাওয়া গিয়াছে যে ফরাসী দম্পতিকে পাইলেই পুরুষকে গোপনে হত্যা করিয়া স্ত্রী-লোকটির প্রতি বলাৎকার করা হইয়াছে।

দক্ষিণ কোরিয়া—কিছুদিন পূর্বে সীঙ্গম্যান রীর (Syngman Rhee) পতনের পর জানা গেল যে তাহার আদেশে দক্ষিণ কোরিয়া হইতে কম্যুনিজম্ নিশ্চিহ্ন করার জন্য সহস্র সহস্র কম্যুনিষ্টকে হত্যা করা হইয়াছে, স্ত্রীলোকদিগকে বলাৎকার করা হইয়াছে।

আমেরিকার দখলে জাপান চারি বৎসর ছিল ও জার্ম্মানীতে চতুঃশক্তির অবস্থানকালে উভয়দেশে সহস্র সহস্র জারজ সন্তান জন্মিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় নারী জাতির প্রতি অত্যাচার কমে নাই।

কয়েদী নির্যাতন—আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই যে অপরাধ স্বীকার করাইবার ও দলের সর্দার বা ক্ষমতাশালী লোকদিগের নাম বদলাইবার জন্য যথেষ্ট নির্যাতন করা হইয়াছে ও সম্ভব হইলে তাহাদের দিয়া শত্রু দমন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট শাসিত দেশে, বিশেষত রুশিয়াতে আমরা শুনিয়া অবাক হইয়া যাই যে বন্দীদিগকে এত যন্ত্রণা দেওয়া হয় যে বন্দীরা কাতর হইয়া এমন প্রার্থনা করে যে আমাদিগকে এখনই গুলি করা হউক এই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। ইহার তুলনা পাওয়া যায় না। রুশিয়ায়, চেকোশ্লোভাকিয়া দেশে ও চীন দেশে ইহা প্রায়ই হইয়াছে……।"

[সুস্থ জীবনযাত্রার উপায়—পৃ—১৯]

যেই ধর্ম মানুষকে নম্র ও সহিষ্ণু করে, সেই ধর্মকে এবং ভগবানকে রাষ্ট্র হতে উৎখাত করার জন্য আহ্বান জানিয়ে মহামতি (?) লেনিন ১৯২৩ এ সোভিয়েট রাশিয়ার সরকারী শিক্ষা সম্মেলনে বলেন—

"We have struck the kings from the Earth—Now let us strike the kings from the heavens. We must hate. **Hatred is the basis of Communism. Children must be taught to hate their parents** if they are not Communists. If they are, then the child need not respect them, need no longer worry about them. **Religion must be abolished. The best Country** is **a godless Country.** If religion pass out quitely, our attitude will be one of benevolent tolerance. But, if it resists we will hasten its exit by violence propoitioned to its resistance." [Truth, Golden Jub. Vol—P. 75]

বর্তমানে বৈজ্ঞানিক মুক্তচিন্তার নামে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ কার্ল মার্ক্সের দ্বান্দ্বিক জড়বাদকেই মানবকল্যাণের অদ্বিতীয় পন্থারূপে কেউ কেউ মনে করেন। লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট রাশিয়ায় এবং মাও-সেতুং-এর নেতৃত্বে চীনে রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তাঁদেরি পরিসংখ্যান অনুসারে বহু কোটি মানুষের নির্বিচার হত্যার দ্বারা প্রশাসন অধিকার ক'রে রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে সেই নীতিকে পূর্ণোদ্যমে কার্যকর করা হয় বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় এবং মধ্যভাগে। ঐ নীতির

পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা বিশ্বকল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হ'ল কিনা আজ মুক্তবুদ্ধিতে ভেবে দেখা প্রয়োজন।

খৃষ্টধর্ম এবং ইস্‌লাম রাষ্ট্রক্ষমতা অস্ত্রবলে করায়ত্ত করে পৃথিবীর দেশে দেশে প্রসারলাভ করেছিল। স্ব স্ব দেশেও প্রশাসনিক ক্ষমতা করায়ত্ত করে শাসন এবং শোষণের জন্য কখনো প্রচলিত রাজশক্তির সঙ্গে মৈত্রী, আবার কখনো বা যুদ্ধ এই দুই ধর্মের যাজকবর্গ করেছেন। মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাস বস্তুতঃ তারই বর্ণনা। সোভিয়েট দেশে খৃষ্টীয় ধর্মশক্তি প্রজাপীড়ক রাজশক্তির সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে জনগণের দুঃখকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পরিবর্দ্ধিত করে। ফলে তৎকালীন ঐতিহাসিক কারণেই দার্শনিক মার্ক্‌স্‌ এবং এঙ্গেল্‌স্‌ রাজশক্তির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মকেও উৎপাটিত করার সংকল্প ঘোষণা করেন। ধর্মের শাশ্বত, দেশ-কাল-নিরপেক্ষ কল্যাণকর রূপের কথা তাঁরা ভাবেন্‌নি। ধর্মধ্বজী খৃষ্টীয় যাজকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে মূল ধর্মের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ক'রে তাঁরাও আবার অবৈজ্ঞানিক এবং অদূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। ফলে, ঐ মতবাদীরা জনগণের সর্বজনীন চেতনার মর্যাদাকারীরূপে নিজেদের ঘোষণা করেও বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের হৃদয়লালিত শান্তি এবং সুনীতির অবলম্বন ধর্মকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যানের জন্য দীর্ঘকাল জেহাদে লিপ্ত রয়েছেন। অথচ বাস্তব সত্য হচ্ছে ঐ মতবাদের রাষ্ট্রগুলিতেও মানুষের অন্তরে আজও ধর্মভাব ক্রমবর্ধমান। ফলে, ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে ওঁদের সংবিধান আজ অভিজ্ঞতার আলোকে সংশোধন করতে হচ্ছে। মস্কোর "প্রগতি প্রকাশন" হতে ১৯৮২ তে "লেনিন ধর্ম প্রসঙ্গে" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে লেনিন্‌ বিভিন্ন রচনায় ধর্ম সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা যাক্‌।

"ধর্ম আধ্যাত্মিক পীড়নের অন্যতম প্রকার বিশেষ" (পৃঃ—৭) ধর্ম একপ্রকার আধ্যাত্মিক সুরা বিশেষ এবং এরই মধ্যে পুঁজি দাসদের মনুষ্য ভাবমূর্ত্তি এবং অল্পবিস্তর মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার দাবী নিমজ্জিত। (পৃঃ ৮) "জগতের সবচেয়ে জঘন্য একটা জিনিসের উপদেশ—ধর্মপ্রচার"। (পৃঃ—১৫) ধর্ম জনগণের পক্ষে আফিঙ্‌ স্বরূপ, মার্ক্‌সের এই উক্তিটা ধর্মপ্রসঙ্গে মার্ক্‌স্‌-বাদের তথা সমস্ত বিশ্বদৃষ্টির মূল কথা। আধুনিক সমস্ত ধর্ম ও গির্জা, সমস্ত সর্ববিধ সংগঠনকে মার্ক্‌স্‌ সর্বদাই মনে করতেন বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার সংস্থা, শ্রমিকশ্রেণীর শোষণ বজায় ও তাদের ধাপ্পা দেওয়াই তার কাজ। (পৃঃ ২০)

মার্ক্‌স্‌বাদ হল বস্তুবাদ। সেই দিক থেকে তা আঠার শতকের এন্‌সাইক্লোপিডিষ্টদের বস্তুবাদের মতো ও নির্মম ধর্ম বিরোধী......—ধর্মের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে। এটা সমস্ত বস্তুবাদের, সুতরাং মার্ক্‌স্‌বাদেরও আঁকাখ। সুতরাং ধ্বংস হোক্‌ ধর্ম, নিরীশ্বরতা জিন্দাবাদ, নিরীশ্বরবাদী মতের প্রচারই হ'ল আমাদের প্রধান কর্তব্য।" (পৃঃ—২৩) "মার্ক্‌স্‌বাদীকে হতে

হবে বস্তুবাদী, অর্থাৎ ধর্মের শত্রু" (পৃঃ– ২৫)। "সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত রকমের ভগবান গঠন হল ঠিক মাথামোটা কূপ মণ্ডূকের, সাধারণ, দুর্বলচিত্ত মানুষের নির্বোধ আত্মপরিচিন্তনই, অর্বাচীন পেটি বুর্জোয়ার সম্নাবিষ্ট আর অবমাননা যে পেটি বুর্জোয়া এবং হতাশাগ্রস্ত"। (পৃঃ– ৪৫) "ধর্মীয় বন্ধ ধারণাগুলো থেকে মেহনতী মানুষকে বাস্তবিক মুক্ত করাই পার্টির লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে সব চেয়ে বহুবিস্তৃত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং ধর্মবিরোধী প্রচার পার্টিকে সংগঠিত করতে হবে।" (পৃঃ – ৫৫)

মার্ক্সের বহুল প্রচলিত বাক্য হচ্ছে Religion is opium—ধর্ম হচ্ছে আফিঙ্। নেশায় মানুষকে সাময়িক শান্তি এবং শক্তির উত্তেজনা দান ক'রে পরিণামে ক'রে দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্থ। নেশার ঘোর কেটে গেলে সে পূর্বের সুস্থাবস্থা হতেও শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়। কিন্তু, ধর্মপথে গিয়ে পরিণামে দুর্বল এবং শক্তিহীন হয়েছে এমন তো কাউকে দেখা যায়নি। বরং চ ধর্মের আশ্রয়ে শান্তি, শক্তি এবং সহিষ্ণুতা তাকে মহত্তর জীবনে উন্নীত করেছে—এই তো ইতিহাসের সাক্ষ্য। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিকুল হতে যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ, মহাবীর, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, রামমোহন, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র, প্রমুখ সকলেই ছিলেন ঈশ্বরে বিশ্বাসের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি, ধর্মপথের পথিক ও প্রবক্তা। এঁদের অবৈজ্ঞানিক, নেশাগ্রস্ত, মতিচ্ছন্ন, দুর্বলচিত্ত বলতে হয় মার্ক্সের বিশ্লেষণে তা কি যুক্তিযুক্ত ও ইতিহাসসিদ্ধ? বরং চ দেখা যায় পরিণত প্রজ্ঞায় এবং অভিজ্ঞতায় নিরীশ্বরবাদী দর্শন আজ বিজ্ঞান প্রত্যাখ্যান করছে।

রাশিয়ার বিখ্যাত মনীষী আলেকজাণ্ডার সোলঝেনিৎসিন নিরীশ্বরবাদী, জড়বাদী, কামনিষ্ঠ মতবাদের প্রয়োগের ফলাফল ভোগ করে লিখেছেন—

"We have become hopelessly enmeshed in onr slavish worship of all that is pleasent, all that is comfortable, all that is material—We worship things, we worship products.

You imagine, you see danger in other parts of the globe and hurl the arrows from your depleted quiver there. But the greatest danger of all is that you have lost the will to defend yourselves.

We, the oppressed people of Russia, the oppressed people of Eastern Europe, watch with anguish the tragic enfeeblement of our sufferings, We would like to accept it without having to pay the monstrous price of death and slavery that we have paid.

Will we ever suceed in shaking of this burden which is

giving free rein to the spirit that was breathed into us at birth, that spirit that distinguishes us from animal world." [Truth Vol. XLIV. No 18]

ধর্মবিধৃত নীতিহীনতার ফলে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার শিশ্নোদরপরায়ণতা সমাজকে আজ কোন্ অবস্থায় নিয়ে গেছে তার বিবরণ হল—

"According to the latest estimate by the U.N. Population Council the Soviet Union has the World's highest abortion rate-10 million abortions are performed each year or 180 for every 1000 women aged 15 to 44. Unmarried mothers, the States leading demographers say, should get maximum attention and material support because they do something great," [Truth 17. 4. 81]

উগ্র ভোগবাদী, খৃষ্টধর্মাবলম্বী, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা এবং গণতান্ত্রিক চেতনায় অতি প্রগতিশীল ধনী আমেরিকার আজ বৃহত্তম সমস্যা তাঁদেরই "Time" (11 July, 1977) পত্রিকার ভাষায় "The Youth Crime Plague"—"More than half of all serious crimes (murder, rape, aggravated assault, robbery, burglary, motor Vehicle theft) in the U. S. are committed by youths aced ten to seventeen. Since 1960, juvenile crime has risen twice as fast as that of adults."

অনেকের মতে যে দেশ সুসভ্য শৃংখলাসম্পন্ন সেই বৃটেনের অবস্থা—

"Wanton destruction of public property by juveniles has reached an epidemic level 85000 cases before courts almost twice the 1972 figures"

অতি স্বাচ্ছন্দ্য এবং আর্থিক নিরাপত্তার দেশ সুইডেন এবং ডেনমার্কের অবস্থা The Statesman (9th April, 1 82) এর সংবাদে—

"In northern Sweeden the number of suicides has gone up at an alarming rate. It is estimated that during the 1970 suicides incroased by 100%. In Denmark, it was reported that the number of Suicides has increased by 20% during 1981."

তাই ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলা ১৯৩৮এ ভারতীয় হিন্দুর ধর্মধৃত সংযত জীবনের জয়গান করে বলেছেন—

"The solution, India has given to the problem of women family, love and marriage are indeed grand."

ব্যক্তি এবং পারিবারিক জীবন যেমন ঐসব উন্নত দেশে কলুষিত এবং অশান্ত হচ্ছে, তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনও হচ্ছে নানা ভাবে বিপর্যস্ত।

এই সব রাষ্ট্রে সত্যিকারের বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদেই চলেছে। বর্তমানের রাজনীতিকরা আদর্শগত সংঘাতকে ক্রমশঃ গোষ্ঠীগত এবং পরে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন। আস্তিক্য-বুদ্ধি-হীন, ভোগলিপ্সু, নীতিহীন, প্রতীচ্য রাজনীতির সর্বগ্রাসী রূপের এই হচ্ছে ফলশ্রুতি। শেষবার পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণ ক'রে এসে ক্রান্তদর্শী রবীন্দ্রনাথ এই তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের বিশ্ব রাজনীতির কর্মধারা বিশ্লেষণে বলেছেন—

"শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ-রাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম প্রলয়মন্থনক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হ তে। লজ্জা শরম তেয়াগি'
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়॥"

পক্ষান্তরে মানুষের সমাজে শাশ্বত সঙ্গে সাম্য প্রতিষ্ঠা করে মহতী মৈত্রী এবং প্রকৃত কল্যাণের পথ নির্দেশ ক'রে চলেছে ভারতীয় জীবনাদর্শের অমৃতবাণী। বর্তমান যুগজিজ্ঞাসার সদুত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি যে বিভিন্ন ভাবে দিতে পারে তার অনুধ্যান আজ একান্ত প্রয়োজন।

প্রথমতঃ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ভগবদ্‌বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর। ভারতবর্ষ মনে করে—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। ভারতীয় ঋষির প্রত্যয় শংকরাচার্যের ভাষায়—

"মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥

ত্রিভুবন ভারতবাসীর স্বদেশ, আর সবাই তাঁর বন্ধু। তাঁরা বিশ্বাস করেন জগতের সবাই যখন একই পরম পিতার সন্তান, তখন সবাই সবার ভ্রাতা। কেউ শত্রু নয়, ছোট নয়, যতই সে অন্য মতাবলম্বী হোক্ না কেন। সকল মানুষকেই ভারতবাসী মানুষের মর্যাদা দিয়ে থাকে। 'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজুকুটিল নানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যঃ,"—শিবমহিম্ন স্তোত্রের এই কথাগুলি স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর প্রথম ভাষণে উদ্ধৃত করে পরমহংসদেবের 'যত মত তত পথ, সবশেষে এক সৎ'—এর যাথার্থ্য প্রমাণ করেন। ভারতীয় সংস্কৃতির নির্যাস গীতার সেই বাণী—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব

ভজাম্যহম্"—যে যেভাবেই উপাসনা করুক না কেন, তার দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়-হিন্দুর এই সমুদার বাণী স্বামিজী তাঁর পাঁচ মিনিটের সেই ঐতিহাসিক প্রথম ভাষণে উল্লেখ করে সকলকে বিস্মিত করেছিলেন। সামর্থ্য, সংস্কার আর রুচি অনুসারে সাধনার বৈচিত্র্য হিন্দুর মর্ম কথা। হিন্দুর শাস্ত্রীয় পুজোপদ্ধতিতে রয়েছে বহু মতের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। যে কোন দেবতার পুজোকালে গণপতি, বিষ্ণু, শিব, সূর্য, শক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন দেব-দেবীর অর্চনাও অবশ্যকরণীয়। নিরাকার ব্রহ্মের সঙ্গে সাকার মূর্তি, এমন কি তরুলতা ও শিলাখণ্ডের অর্চনায়ও তার বিরোধিতা নেই। শক্তির মন্দিরে, শিবের মন্দিরে বিষ্ণুর শালগ্রাম শিলারও অবস্থান এখানে অবলীলাক্রমেই চলে। হিন্দুর অধ্যাত্মসাধনায় যাঁরা দীক্ষিত নন, তাঁরাই অজ্ঞতাবশতঃ এই বৈচিত্র্যের মধ্যে অনৈক্যের আবিস্কার করেন। ধর্মচর্যার আনুষ্ঠানিক অনুশীলনের অভাবেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত মর্মানুধ্যানে তাঁরা অক্ষম। কিন্তু, এই সাধনার চিন্তা এবং চর্যায় যাঁরা সত্যিকারের দীক্ষিত, তাঁদের কাছে এই ঐক্য প্রত্যক্ষ। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধানই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। উপনিষদের ভাবরসগুণে ভারতীয় হিন্দু বিশ্বাস করেন—

একো দেবঃ সর্বভুতেষু গুঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।'

সুতরাং সর্ব প্রাণীর সঙ্গেই তাঁরা অনুভব করেন আত্মীয়তা। দৈহিক প্রকাশের বৈচিত্র্যের অন্তরালে একই পরম দেবতার অস্তিত্বের জন্য প্রতিটি মানুষই এক সূত্রে বাঁধা। আরাধ্য দেবতাকেই তো তিনি সর্বজীবে দেখেন। তাই, কেউ তাঁর কাছে শত্রু হ'তে পারেন্ না।

এই মৈত্রী সাধনারইতো বিশেষ প্রকাশ বৈষ্ণবী ভাবনা। বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে-'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে। তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।' 'নামে রুচি এবং জীবে দয়ার' কথা বৈষ্ণব অহরহ তাই মনে রাখেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী তাই বৈষ্ণব। **মৈত্রীর মাধ্যমে সাম্যপ্রতিষ্ঠা এবং বীর্যের সঙ্গে সত্যাগ্রহের শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।** প্রতীচ্য রাজনীতির হিংসার মাধ্যমে রক্তাক্ত পথের পরিবর্তে ভারতীয় সাধনায় মৈত্রীর মাধ্যমে প্রেমের পথে সাম্যপ্রতিষ্ঠা জগতের অধিকতর হিতকর এবং বাঞ্ছনীয়। মহাপ্রভু ও মার্ক্সের মতের এবং পথের মুক্ত বুদ্ধিতে এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তুলনামূলক আলোচনা আজ পথে, প্রান্তরে একান্ত প্রয়োজন।

সকল দেবতা একই পরব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ।—

"একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।"

—এই তো সকল ভারতীয়ের সুদৃঢ় প্রত্যয়।

"সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট ঃ"

—"সকল মানুষেরই হৃদয়ে একই পরমেশ্বর বিরাজ করছেন"- এর যথার্থ

সাধক সকল ভারতীয়। তাই ভারতে অধ্যাত্মমার্গের সকল পথিকই পরিণামে মানবপ্রেমিক হ'তে বাধ্য।

নিরীশ্বরবাদী মানবকল্যাণকামী এবং ঈশ্বরবিশ্বাসী মানবকল্যাণকামীর মধ্যে বিরাট প্রভেদ। নিরীশ্বরবাদীর মানব এক বিশেষ গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ। আর সেই গোষ্ঠী তৈরী হ'য়েছে বিশেষ এক বিশ্বাস তথা ভোগের মতবাদকে আশ্রয় ক'রে। ফলে তদ্‌বহির্ভূত মানবকে মানবের মর্যাদা দানে তিনি কার্যতঃ কুণ্ঠিত। তাঁর প্রেম সংকীর্ণ, সীমিত, গোষ্ঠীগত। ফলে তিনি অপরের প্রতি অন্ধ শুধু নন, হিংস্রও বটে। মতের সঙ্গে না মিল্‌লেই তাকে তিনি মনে করেন শ্রেণীশত্রু এবং সর্বপ্রকারে বধ্য। ফলে পৃথিবীর কত প্রান্ত মানবকল্যাণের নামে মানবের রক্তস্রোতে প্লাবিত হয়েছে এবং হচ্ছে তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস তার সত্য সাক্ষ্য ক্রমাগত দিয়ে চলেছে। ধর্মের ভিত্তি না থাকায় নিরীশ্বরবাদীর কাছে শেষ পর্যন্ত দুর্নীতির ভেদবিচার কুসংস্কার। ইষ্টসিদ্ধির জন্য পন্থার বিশুদ্ধির বিচারে তিনি সদাই পরাঙ্‌মুখ। স্নেহ, মায়া, মমতা, নম্রতা শুচিতা, কৃতজ্ঞতা এবং জীবনের নীতি ও মূল্যবোধ মানসিক দুর্বলতা ও ক্ষতিকর কুসংস্কার বলেই তিনি মনে করেন। কর্মফল এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকায় তিনি হন অহংকারে বিমূঢ়। প্রয়োজনে কোন কুকর্মই তাঁর কাছে পরিত্যজ্য নয়। এই বিষয়ে হিন্দু ধর্ম ব্যতীত অপর সকল ধর্ম এবং প্রতীচ্যের সকল রাজনৈতিক মতাদর্শের রূপ একই। তাঁরা অপরের প্রতি সমানভাবেই অন্ধ ও সদাই রূঢ়। আর বিপরীত হ'ল ভারতীয় সংস্কৃতির বাণীবাহক মানবকল্যাণকামীদের আদর্শ ও আচরণ। কিন্তু আজ আমাদের দেশের সমাজতন্ত্রী এবং গণতন্ত্রীরা অন্ধ অনুচিকীর্ষায় এই মুক্ত বুদ্ধিটাই সর্বাগ্রে হারিয়ে ফেলেছেন, ভুলে গেছেন ঐতিহাসিক পরম্পরার স্বদেশীয় অখণ্ড স্বরূপটি। বর্জনের সঙ্গে গ্রহণেও যে বিচারের প্রয়োজন সেই কথাটি তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন। নির্বিচারে গ্রহণের মতো নির্বিচারে বর্জনও সমভাবে দূষণীয়।

"যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে"—

বৃহস্পতিস্মৃতির এই বাক্যটি গ্রহণ এবং বর্জন উভয়কালেই স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

ভারতীয় সংস্কৃতির আর একটি বড়ো কথা ত্যাগ। ইন্দ্রিয়সংযম এবং ভোগবিরতি ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ কথা। ভোগ পশুর ধর্ম। ত্যাগ মানুষের ধর্ম। পৃথিবীর সকল রাজনৈতিক মতবাদীরা মনে করেন ভোগের উপকরণ যোগানোই মানবকল্যাণের পরম পন্থা। কিন্তু অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন অগ্নিশিখা অধিকতরভাবে প্রজ্বলিত হয় ঠিক তেমনি, যতই ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করি না কেন, ভোগের তৃষ্ণা এবং ফলে অশান্তি ততই পরিবর্ধিত হয়।—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥"

যত পাই, তত চাই। পাওয়ার পরেই মনে হয় কবির ভাষায়—"যাহা চাই, তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা পাই, তাহা চাইনা।" ফলে দুঃখ বেড়েই চলে। আর, ভোগকামনার শেষ না থাকায়, তখন পাপ-পুণ্য-নীতিবোধহীন ভোগাদর্শী মানুষ পরিণামে অপরকে বঞ্চিত করতে কুণ্ঠিত হয় না। ভোগীরা একে অপরকে বঞ্চিত করার সুযোগ সন্ধান করে। অন্তরে নিবৃত্তির আদর্শ না থাকলে ভোগাদর্শী মানুষ তার অনন্ত ভোগকামনার পরিতৃপ্তির জন্য নিয়তইতো ভোগ্য-বস্তুর সন্ধানে অশান্ত হ'য়ে ছুটে বেড়াবে। এই রকমের ভোগবাদী সমাজে আপাততঃ সাম্য প্রতিষ্ঠা করলেও সেটি স্থায়ী হবে না। ভোগকামনা এবং সাম্যের আদর্শ পরস্পর বিরোধী। ভোগকামনা মানুষকে করে উদ্দাম ও সাম্য-বিস্মৃত। ব্যক্তিগত ভোগস্পৃহা এবং নীতিহীনতা ক্রমে গোষ্ঠীগত এবং জাতিগত জীবনে সঞ্চারিত হবে। ফলে বিশ্বশান্তিও হবে বিঘ্নিত। একই সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী আদর্শের পথিক হয়েও গোষ্ঠীগত ভোগের প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় রাশিয়া এবং চীন বর্তমানে পরস্পরকে শত্রু মনে করে। একই ভোগের ধর্মের পথিক ইরাক ও ইরাণের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং আয়াতুল্লা খোমেনীর নির্দেশে সহস্র সহস্র নর-নারীর নিষ্ঠুর হত্যা বর্তমানের বাস্তবঘটনা। জীবজগতে দেখা যায় একই গোষ্ঠীর সারমেয়কুল মাংসলোভী হওয়ায় একই মাংসখণ্ডকে অবলম্বন করে পরস্পর হিংস্র দ্বন্দ্বে নিরত। একই ধর্মাবলম্বীদের দেশে দেশে রক্তক্ষয়ী বর্তমান সংগ্রামও এই ভোগেরই প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

অন্যদিকে ভারতীয় সংস্কৃতি বলেছে—"**ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্**"—"**ত্যাগেনৈকমমৃতত্বমানশুঃ**"—"**ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ**"। ত্যাগই ভারতীয় সংস্কৃতির পরম কথা। ইন্দ্রিয়সম্পন্ন মানুষের সহজাত ভোগপ্রবৃত্তিকে তাঁরা স্বীকার করে বলেছেন—"**প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা**"। ত্যাগই মানুষকে করে মনুষ্যত্বের মহিমায় প্রদীপ্ত। আর ত্যাগেরই জয়গান করেছে ভারতীয় সংস্কৃতি চিরকাল। হিন্দুর সকল আচার অনুষ্ঠানের অন্তরালে রয়েছে মানুষকে ত্যাগের পথে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস। মানুষের মধ্যে ভোগপ্রবৃত্তিকে সংযত করে স্বাভাবিকভাবে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীমদ্‌ভাগবতকার বলেছেন—

"যাবদ্ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি। (ভাগবত ৭।১৪৮)

যতটুকু ভোগ্যবস্তুতে উদরপূর্তি মাত্র হয় অর্থাৎ জীবনধারণ করা চলে, ততটুকু ভোগ্যবস্তুতেই মানুষের অধিকার। অধিক যে গ্রহণ করতে চায় সে চোর, তাই দণ্ডনীয়। ঋগ্বেদের ঋষি বলেছেন—

"মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ
সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎস তস্য।
নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং
কেবলাঘো ভবতি কেবলাদি। (ঋগ্বেদ ১০।১১৭।৬)

যে সংকীর্ণচিত্ত, তার অর্জিত ভোগ্যবস্তু ব্যর্থ। স্বার্থপরের সঞ্চিত বস্তু সত্যই তার নিজের মৃত্যুকেই ডেকে আনে। যে সম্মানিত এবং সুহৃদ্‌বর্গকে পোষণ করে না, কেবল একাকী ভোগ করে, সে শুধু পাপকেই অর্জন করে। গীতায় বলা হয়েছে—

"ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা
যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।"

—যারা শুধু নিজের জন্যই অন্ন প্রস্তুত করে, তারা পাপকেই করে ভোগ। মহাভারতের শান্তিপর্বে বলা হয়েছে, নিজের জন্য ভোগের সংকোচ এবং অপরের জন্যে ভোগের বিস্তারই সুখের কারণ।—

"বিস্তরাঃ ক্লেশসংযুক্তাঃ সংক্ষেপাস্তু সুখাবহাঃ।
পরার্থং বিস্তরাঃ সর্বে ত্যাগমাত্মহিতং বিদুঃ॥"

(মঃ ভাঃ, শাঃ ২৯১।২০)

পূর্বে ভৃত্য এবং অতিথিবর্গকে ভোজন করিয়ে পরে নিজে ভোজন করবে - এই হ'ল যুধিষ্ঠিরের প্রতি নির্দেশ—

"ভৃত্যাতিথিসু যো ভুঙ্‌ক্তে ভুক্তবৎসু সদা নরঃ।
অমৃতং কেবলং ভুঙ্‌ক্তে ইতি বিদ্ধি যুধিষ্ঠির॥"

(মঃ ভাঃ, শাঃ ২২০।১৩)

যে অপরকে না দিয়ে নিজেই কেবল চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে, মহাভারতকারের মতে তাকেই বলা হয় নৃশংস—

"ভক্ষ্যং পেয়মথো লেহ্যং যচ্চান্যৎ স্বাদুভোজনম্॥
প্রেক্ষমাণেষু যোঽশ্নীয়াৎ নৃশংসমিতি তং বদেৎ॥"

(মঃ ভাঃ ১৫।১৪১)

শ্রীমদ্‌ভাগবতকার বলেছেন, মানুষের মধ্যের দেবতাকে পরিত্যাগ করে যারা কেবল মূর্তির মধ্যেই দেবতাকে অর্চনা করে, তাদের এই অর্চনা ব্যর্থ, ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র।

"যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥"

(শ্রীমদ্ ভাগবত ৩-২৯-২২)

যে ভূমি নিয়ে আজকাল এত হানাহানি এবং কৃষকের স্বার্থরক্ষার নামে এত হিংসা তার সমাধানে মনুসংহিতায় বলা হচ্ছে-জঙ্গল কেটে কর্ষণ করে যে শস্য উৎপাদন করে ভূমির মালিকানা তারই— "স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতো মৃগম্ (মনু সং—৯-৪৪)

নিরন্তর কর্মানুশীলনের নির্দেশ ভারতীয় ধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য। "কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি" বলে নিষ্কামভাবে নিরন্তর কর্ম করার আদেশ দিয়েছেন শাস্ত্রকার। ভোগে সংযম অথচ কর্মে নিষ্ঠার মাধ্যমে উৎপাদন—এ এক অপূর্ব

পন্থা। ভোগের নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে কর্মে বিরতির প্রবণতা স্বাভাবিক। ফলে প্রত্যাশা না থাকলে কেউ কাজ করতে চায় না। তাহলে তো পরিণামে দেশ উৎপাদনের অভাবে দরিদ্র হ'য়ে পড়বে, বিশ্ববাসী হবে নিঃস্ব। ঋষিরা বলেছেন, উৎপাদনে সবাইকে সর্বদা নিযুক্ত থাকতে হবে। সেখানে রাজর্ষি জনককেও হল চালনা ক'রে শ্রমের মর্যাদা ঘোষণা করতে হয়। আমাদের জীবনের চারটি পর্যায়কেই আশ্রম বলা হয়েছে। আ সমন্তাৎ শ্রমো যত্র স এব আশ্রমঃ— সর্ব-প্রকারে শ্রমদান করতে হবে বলেই আশ্রম। 'জীবনটি নিরন্তর শ্রমেই কাটাতে হবে।' তাই আমাদের জীবন হল আশ্রম। অপরের শ্রমার্জিত অর্থের দ্বারা স্বাচ্ছন্দ্যপুষ্ট শ্রমিকনেতা না হয়ে প্রতিটি ব্যক্তিকেই শ্রমিক হতে বলেছেন আর্য ঋষি। উৎপাদনের প্রাচুর্যের সঙ্গে ভোগের সংযম ঋষি-নির্দেশ। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে সামর্থ্যানুসারে শ্রম দান করতে হবে। কিন্তু ভোগ করবে সংযতভাবে, ন্যূনতম প্রয়োজনানুসারেই শুধু। তখন, অনায়াসেই উদ্বৃত্ত ভোগ্য পণ্য সমাজের মধ্যে পঞ্চমহাযজ্ঞাদির মাধ্যমে স্বেচ্ছায় সানন্দে পুণ্যকর্ম-বোধে বণ্টন করবেন উৎপাদক। এতে লুণ্ঠনাদির দ্বারা পশুসুলভ হিংস্রকর্মের মাধ্যমে ধনবণ্টনের দ্বারা রক্তাক্ত সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হবে না। হিংসার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হবে না নূতন হিংসার। শান্তির পথে হবে সাম্যের প্রতিষ্ঠা এবং সেই সাম্য হ'বে চিরস্থায়ী। হিংসার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাম্য প্রতি-হিংসার অনলে কিছুদিন পরেই বিনষ্ট হয়। এই হিংসালব্ধ সাম্যকে রক্ষার জন্য আরো বহু হিংসার আশ্রয় নিতে হয়। পৃথিবীর সকল সাম্যবাদী এবং ইসলামী দেশের ইতিহাসের রক্তরঞ্জিত অধ্যায় এবং লৌহযবনিকার অস্তিত্ব তাই লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য।

ভারতীয় আদর্শে দাতা গ্রহীতার কাছেই থাকবে কৃতজ্ঞ হয়ে। হিংসার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হ'তে মুক্ত হবে ধনী-দরিদ্র, শ্রমিক-মালিক, পণ্ডিত-মূর্খ।— "আচারপ্রভবো ধর্মঃ।"—নিত্য আচরণ এবং অনুশীলনের মাধ্যমে হিন্দুর জীবনে এই সাম্য, মৈত্রী এবং ত্যাগের মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা ক'রেছেন শাস্ত্রকার। কেবল চিন্তামূলক তত্ত্ব নয়, তথ্যনিষ্ঠ চর্যার ওপর তাই তাঁরা এতো গুরুত্ব দিয়েছেন। ভারতীয় সংস্কৃতি অনুসারে নিত্যই প্রতিটি গৃহীর অবশ্য করণীয় হ'ল পাঁচটি কাজ। তাকে বলা হয় পঞ্চ মহাযজ্ঞ।

(১) ব্রহ্মযজ্ঞ তথা বেদপাঠ। নিত্যই জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা চিত্তের মার্জনা এবং বুদ্ধির বৈশদ্য সম্পাদন এর লক্ষ্য।

(২) দেবযজ্ঞ হ'ল ভগবানের উপাসনার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শান্তিলাভ, দুঃখ নিবেদন ও শক্তিসংগ্রহ।

(৩) পিতৃযজ্ঞের মাধ্যমে নিত্য পিতৃপুরুষকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। মন্ত্রপাঠ ক'রে শুধু তাঁদের নয়, বিশ্বভুবনের সবারি তর্পণ তথা তৃপ্তি বিধানের অনুষ্ঠান করি আমরা। লোকান্তরিত আত্মজনের সঙ্গে

সঙ্গে পৃথিবীর সর্বমানব, এমন কি ইতর প্রাণীর পর্যন্ত তৃপ্তির জন্য আমরা জল দান করি। শেষ পর্যন্ত এ জন্মের এবং অন্য জন্মেরও শুধু মিত্র নয়, শত্রুর পর্যন্ত কল্যাণকামনায় নিষ্ঠাবান হিন্দু নিত্য তর্পণকালে মন্ত্রপাঠ করে—

"আ-ব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ! দেবর্ষি-পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্ত ভুবনত্রয়ম্॥
যে বান্ধবাঽবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥"

এইভাবে অন্য জন্মের পর্যন্ত শুধু বন্ধু নয়, শত্রুরও কল্যাণ-কামনা এবং তৃপ্তি সাধনের প্রয়াস ভারতীয় সংস্কৃতির হিন্দুর ধর্মাচার ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও নেই। আমাদের অনুষ্ঠান আমরা পালন করি না, মন্ত্র-পাঠও করি না এবং সংস্কৃত না জানায় অর্থোপলব্ধিও হয় না। অজ্ঞতাবশতঃ স্বদেশের সাম্য এবং মানবকল্যাণের কাম্য পন্থার কথা জানি না বলেই প্রতীচ্যের ভাবদাসত্ব গ্রহণ করতে আমরা অদূরদর্শী স্বাজাত্য-বিস্মৃত নেতাদের নেতৃত্বে চলেছি।

(৪) নৃযজ্ঞের মাধ্যমে নিত্য শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শে অতিথি-সেবার মহদ্ধর্ম ভারতীয় সংস্কৃতির আর এক বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় হিন্দু গৃহী অতিথিকে না দিয়ে নিজে অন্নগ্রহণ করবেন্ না। হিন্দু গৃহে নিজের ভৃত্যের সঙ্গে সমান খাদ্যই গ্রহণ করবেন।

"সামান্যং ভোজনং ভৃত্যৈঃ পুরুষস্য প্রশস্যতে"।

পৃথিবীর কোথাও কোথাও অতিথি এলে পুলিশে খবর দেবার প্রথা আছে। কিন্তু কেবলমাত্র ভারতেই বলা হয়—

"অতিথিঃ নারায়ণঃ সাক্ষাৎ।"

আমাদের প্রতিটি সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে সমাজের সবাই যাতে উপকৃত হয় তারই প্রয়াস-পরিলক্ষিত হয়।

মন্দিরে মন্দিরে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই ক্ষমতা অনুসারে দান করেন, আবার প্রয়োজনানুসারে যার যতটুকু উদরপূর্তি হয়, ততটুকু প্রসাদ তাঁরা পেয়ে থাকেন। দেবার বেলায় each according to his capacity এবং পাবার বেলায় each according to his necessity—সূত্রের সার্থক প্রয়োগ ভারতের দেবমন্দিরে নিত্যই দেখা যায়।

(৫) সর্বশেষে ভূতযজ্ঞের মাধ্যমে আমাদের চারপাশের অবোলা জীব-জন্তুদের প্রতিও আহার্যদান আমাদের অবশ্যকর্তব্য। শুধু মানুষ নয়, সকল প্রাণীর সঙ্গেই মৈত্রী প্রতিষ্ঠা এবং সর্বজীবের কল্যাণসাধনই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ ধর্মনিষ্ঠ ভারতীয়দের নিরামিষ আহারের মূলেও রয়েছে এই জীবপ্রেম। অন্যদেশে মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীর খাদ্য-খাদক সম্পর্ক,

ভারতবর্ষে প্রেমের সম্পর্ক। কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ তাঁর "তপোবন" প্রবন্ধে বলেছেন—

"বহুকোটি লোক, প্রায় একটি সমগ্র জাতি, মৎস্যমাংস আহার একেবারে পরিত্যাগ করেছে, পৃথিবীতে কোথাও এর তুলনা পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে এমন জাতি দেখিনে যে আমিষ আহার না করে। ভারতবর্ষ এই যে আমিষ পরিত্যাগ করেছে সে কৃচ্ছ্রব্রত সাধনের জন্যে নয়, নিজের শরীরকে পীড়া দিয়ে কোনো শাস্ত্রোপদিষ্ট পুণ্যলাভের জন্যে নয়; তার একমাত্র উদ্দেশ্য জীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করা।

"এই হিংসা ত্যাগ না করলে জীবের সঙ্গে জীবের যোগসামঞ্জস্য নষ্ট হয়। প্রাণীকে যদি আমরা খেয়ে ফেলবার, পেট ভরাবার জিনিস বলে দেখি তবে কখনোই তাকে সত্যরূপে দেখতে পারিনে। তবে প্রাণ জিনিষটাকে তুচ্ছ করে দেখা অভ্যস্ত হ'য়ে যায় যে, কেবল আহারের জন্য নয়, শুধুমাত্র প্রাণীহত্যা করাই আমাদের অঙ্গ হ'য়ে ওঠে এবং নিদারুণ অহৈতুকী হিংসাকে জলে-স্থলে-আকাশে গুহায়-গহ্বরে দেশে-বিদেশে মানুষ ব্যাপ্ত করে দিতে থাকে। এই যোগভ্রষ্টতা, এই বোধশক্তির অসাড়তা থেকে ভারতবর্ষ মানুষকে রক্ষা করবার জন্যে চেষ্টা করেছে।"

ব্যষ্টি-জীবন এবং সমষ্টি জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত চতুরাশ্রম এবং চাতুর্বর্ণ্যের বিধান ভারতীয় সংস্কৃতির আর একটি অনবদ্য অবদান। আচরণের মধ্যেই ধর্মের বিকাশ। শুধু চিন্তা নয়, চর্যারও একান্ত প্রয়োজন। চিন্তা এবং চর্যায় সামঞ্জস্য-বিধান ভারতের শাশ্বত নির্দেশ। "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেক আমরা পরের তরে"—ভারতীয় সমাজেরই রীতি। ভোগীর সমাজ আত্মসুখের জন্য বিশ্বকে উপেক্ষা করে। ত্যাগীর সমাজ করে বিশ্বকে বরণ। তার জীবন "জগদ্ধিতায়"। ভারতের সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালিত হত ব্রহ্মজ্ঞ, নিরাসক্ত, ত্যাগী, চরিত্রবান্ ব্রাহ্মণ ঋষিদের নেতৃত্বে। বর্তমানের আইন-প্রণেতা এবং সমাজ-রাষ্ট্রশাসকদের সঙ্গে পার্থক্যটি বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। ভোটের জোরে এবং দলের দাপটে খুনী আসামী, চরিত্রহীন অপরাধী, দণ্ডনীয় ব্যক্তিও আজ আইন এবং দণ্ড নিয়ন্ত্রণ এবং প্রণয়নের অধিকার লাভ করতে পারে। তখন ত্যাগীর হাতে দেওয়া হত সমাজ নিয়ন্ত্রণের শক্তি। এখন দেওয়া হয় ভোগীর হাতে। ফল অনুমেয় এবং বর্তমানে নিত্য অনুভূত। প্রসঙ্গতঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বর্ণিত সমর্থগুরু ব্রহ্মজ্ঞ রামদাস স্বামীর মহারাষ্ট্রপতি শিবজীর প্রতি নির্দেশ স্মরণ করা যায়—

"তোমারে করিলি বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন।
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন॥"

তাই বর্তমানের যুগসমস্যা এবং যুগজিজ্ঞাসায় "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" প্রতীচ্যের অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে ভারতীয় সংস্কৃতির দুয়ারেই আমাদের যেতে হবে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"ভারতবর্ষ যদি খাঁটি ভারতবর্ষ হয়ে না ওঠে তবে পরের বাজারে মজুরিগিরি করা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। তাহলে তার আপনার প্রতি আপনার সম্মানবোধ চলে যাবে এবং আপনাতে আপনার আনন্দ থাকবে না। তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিন্তভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কি? সে সত্য প্রধানতঃ বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বাদেশিকতা নয় সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে,। ভারতবর্ষের সত্য **হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা। ব্রহ্মচর্য ব্রহ্মজ্ঞান, সর্বজীবে দয়া, সর্বভূতে আত্মোপলব্ধি—একদিন এই ভারতে কেবল কাব্যকথা, কেবল মতবাদরূপে ছিল না, প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একে সত্য করে তোলবার জন্য অনুশাসন ছিল।**

মনুষ্যত্বের যে অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভব আজ ঘরে বাইরে আমাদের জীবনকে বিষণ্ন করে তুলেছে, রাজনৈতিক বাত্যাবিক্ষোভে যে নবোত্থিত জীবন-জিজ্ঞাসা আমাদের চিত্তকে মথিত করে তুলেছে, সেই সংকটলগ্নে নবভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিশারী প্রগতিবাদী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত আহ্বান বিশেষভাবে স্মরণ করি—

"Before flooding India with Socialistic and Political ideas, first deluge the land with spiritual ideas. The first work that demands our attention is that the most wonderful truths confined in our Upanishads, in our scriptures in our Puranas must be brought out."

Dr. Arnold Toynbee "Indian Contribution to World-thought and Culture"— গ্রন্থে বর্তমানে বিশ্বের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতি তথা হিন্দুধর্মের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে লিখছেন—

"Today we are still living in this transitional chapter of the world's history. But, it is already becoming clear that a chapter which had a western begining will have to have an Indian ending if it is not to end in the self-desstruction of the human race. In the present age the world is on the material plane by Western technology. But this Western skill has not only "annihilated distance", it has armed the peoples of the

world with weapons of devastating power at a time when they have been brought to point-blankrange of each other yet having learnt to know and love each other. **At this superemely dangerous moment in human history, the only way of salvation for mankind is an Indian way.** Here we have the attitude and the spirit that can make it possible for the human race to grow together into a single family and in the atomic age, this is the only alternative to destroying ourselves.

In this atomic age the whole human race has a utilitarian motive for this indian way. No utilitarian motive could be stronger or more respectable in itself. The survival of the human race is at stake. Yet even the strongest and most respectable utilitarian motive is only a secondary reason for taking eternal Indian teaehing to the heart and acting on it. The primary reason is that this teaching is right—and is right because it flows from a true vision of spiritual reality."

মুক্তবুদ্ধি এই ঐতিহাসিক "A Study of History" নামক যুগান্তকারী গ্রন্থে ভারতীয় সনাতনী অধ্যাত্মচেতনা তথা হিন্দু ভাবাদর্শের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বলেছেন—

"Indian religions are not exclusive-minded. They are ready to allow that there may be alternative approaches to the mystery. I feel sure that in this, they are right and **this catholic minded Indian religious spirit is the only way to salvation for human beings of all religions in an age where we have to learn to live as a single family, if we are not to destory ourselves.**

বর্তমান বিশ্বে নিরীশ্বরবাদী কামনিষ্ঠ মতবাদ তথা Communism এবং প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সাহায্যে অত্যুগ্র ভোগবাদ আজ বিভিন্ন দেশে প্রগতির লক্ষণ বলে চিহ্নিত হয়েছে। ফলে মানবসভ্যতা আজ সংকটাপন্ন। ধর্মের স্থান কোথাও অস্বীকৃত, কোথাও বা সীমিত। তাতে আপাত বাড়বাড়ন্ত হলেও পরিণামে মহতী বিনষ্টি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর "কালান্তর" গ্রন্থে 'সভ্যতার সংকট" প্রবন্ধের শেষে মহাভারতীয় বাণী উদ্ধৃত করে আমাদের সচেতন করেছেন—

"অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥"

এই প্রসঙ্গে নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত বিশিষ্ট বৃটিশ পদার্থবিজ্ঞানী Sir Alfred Egerton এর কথাগুলো বিশেষভাবে স্মরণীয়—

"The civilisation of the future is perhaps not along the rextreme technology of the West, not in the direction of despotic Communism, but in the hands of those whose ancient-tradition and spiritual insight can perhaps give a fresh turn to the wheel which shapes man's future."

মনে রাখতে হবে এই ভারতীয় সংস্কৃতিই হল হিন্দু সংস্কৃতি। ভারতীয় সার্বভৌম ধর্মই হিন্দু ধর্ম। "হিন্দু ধর্ম" সম্বন্ধে স্পর্শকাতরতা, অযৌক্তিক বিদ্বেষ এবং অমূলক অনীহা নিজের অজ্ঞতা এবং আত্মবিস্মৃতিপরায়ণতাকেই সূচিত করে। মুক্তচেতা মনীষী ক্ষিতিমোহন সেন "ভারতের সংস্কৃতি" গ্রন্থে সুন্দরভাবে বলেছেন—"ইহলোক নিয়ে সাধনা হল সংস্কৃতি, অনন্তলোক নিয়ে সাধনা হল ধর্ম। ভারতের সংস্কৃতি ও ধর্ম দুয়ের মধ্যেই অনেক যুগের মানবমণ্ডলীর নানা দান মিলে মিশে আছে। সংস্কৃতি হতে ধর্মেই প্রবর্তকদের পরিচয় সহজে পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় ভারতের হিন্দু ধর্ম কোনো বিশেষ মহাপুরুষের দ্বারা প্রবর্তিত হয় নি। সেই জন্য হিন্দু ধর্মকে এক হিসাবে অপৌরুষেয় ধর্ম বলা যেতে পারে। ভারতে যত সংস্কৃতি বা ধর্ম এসেছে সবার সব দান একত্র মিলিত হয়েছে যে ধর্মে তাকে কোন ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম না বলে জন্মভূমির ভৌগোলিক নামে তাকে 'ভারতীয় 'ধর্ম' বলাই সঙ্গত। ভারতকে হিন্দু বলে। তাই এই দেশে সব সংস্কৃতির সমন্বয়ে বিধাতার নির্দেশে যে ধর্মটি যুগের পরে যুগের সাধনায় গড়ে উঠেছে, তাকে হিন্দের অর্থাৎ ভারতের, হিন্দু অর্থাৎ ভারতের ধর্ম বলাই ঠিক। ধর্মসাধনায় এই সমন্বয়কেই মহাত্মা কবীর ভারতের তপস্যা বলেছেন। তাই তাঁর গ্রন্থকে 'ভারতপন্থ' বলা হয়েছে। কবীরের শিষ্য যুগলানন্দ তাঁর সব 'গ্রন্থ সম্পাদনের সময় নিজেকে 'ভারতপথিক' যুগলানন্দ বলে পরিচয় দিয়েছেন।

মহাত্মা কবীরের সেই 'ভারতপন্থ' আজও সম্পূর্ণ সাধিত হয় নি। রামমোহন, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাপুরুষরা সবাই এই ভারতপন্থের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। বর্তমান যুগে নয়, মধ্যযুগেই নয়, ভারতের আদিকাল হতেই ভগবানের নির্দেশে এই সাধনা নিঃশব্দে নিরন্তর চলেছে।"

"সিন্ধু" থেকে হিন্দু এবং India শব্দের উৎপত্তি। সিন্ধুতীরবাসীদের আচার, ধর্ম এবং গোষ্ঠীকে আরবীয়েরা হিন্দু বলতেন। দন্ত্য-স "এর আরবীয় উচ্চারণ হল-"হ"। আবার এই "হিন্দু"ই গ্রীসদের উচ্চারণে Indu যার থেকে India। সুতরাং দেশ এবং সংস্কৃতিবাচক শব্দ হল এই হিন্দু। হিন্দু কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় নয়। তাই, মনীষী বিপ্লবী বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর হিন্দুর সংজ্ঞা রচনা করেছিলেন—

"আ সিন্ধুঃ সিন্ধুপর্যন্তা যস্য ভারতভূমিকা।
পিতৃভূঃ পুণ্যভূশ্চৈব স বৈ হিন্দুরিতি স্মৃতঃ॥

[সিন্ধু নদ হতে সমুদ্রপর্যন্ত প্রসারিত সমগ্রভারতভূমিকে যিনি পুণ্যভূমি এবং পিতৃভূমি মনে করেন, তিনিই হিন্দু, উপাসনার ধর্মীয় পন্থা তাঁর যাই হোক্ না কেন।

তাই আজ যুগজিজ্ঞাসায় হিন্দু তথা ভারতীয় সংস্কৃতির সদুত্তর আমাদের "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" প্রবৃত্ত করুক্। পরমদেবতা আমাদের বোধির মুক্তি সম্পাদন করে কল্যাণ কর্মে আমাদের নিয়োজিত করুন এই প্রার্থনা—

"স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু

ইসলাম, খৃষ্টান এবং ধর্মবিরোধী কামনিষ্ঠ মতবাদ যা ইন্দ্রিয়ভোগকেই মানবজীবনের পরমার্থ বলে মনে করে—এই ত্রিবিধ শক্তিই ভারতের সহিষ্ণুতা, ঔদার্য এবং ভারতসন্তানদের আত্মবিস্মৃতির সুযোগ নিয়ে নানা ছলে, কৌশলে এবং প্রলোভনে ভারতের বুকে সংগোপনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিবর্তন তথা পরিণামে বৈদেশিক আধিপত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সক্রিয়। এইজন্য বিদেশ হতে নানা রন্ধ্রে লক্ষ লক্ষ অর্থ এখানে আস্ছে। তাই মধ্যে মধ্যেই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উষ্মা ও আক্ষেপ প্রকাশ করলেও পরক্ষণেই আপাত ভোটের লোভে আবার বিস্মৃত হয়ে যান সেই সব অপপ্রয়াস। আপাত সাংসারিক ভোগজীবনে আকণ্ঠ মগ্ন ভারতবাসী তথা হিন্দু সন্তানদের এই সকল তুচ্ছ বিষয়ে ভাববার অবকাশ নেই। আশ্চর্যের বিষয়, পূর্ববঙ্গ এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হতে যাঁরা আত্মরক্ষার তাগিদে ১৯৪৭ এর পর রিক্ত হয়ে খণ্ডিত ভারতে ছুটে এসেছিলেন, তাঁরাও আজ সেই দুর্গতির কারণ ও স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে গেছেন। আর, খণ্ডিত ভারতের পুরুষানুক্রমে বসবাসকারী অধিবাসীরাও আত্মসন্তুষ্টির নেশায় মোহগ্রস্ত। যে সকল সম্প্রদায়ের মঠ-মন্দির ধ্বংস হ'য়েছিল, এখনো যে কোনো মুহূর্তে ধ্বংস হ'তে পারে সেই সব প্রতিষ্ঠানের কর্তা ও সেবকেরাও আজ আশ্চর্যজনকভাবে নীরব, কোথাও বা নির্যাতনকারীদের জন্য আত্মঘাতী সৌজন্যে উন্মুক্ত। ভারতের উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম অঞ্চল এবং পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, কেরালা ও তামিলনাদের খণ্ড খণ্ড অংশ আজ অগ্নিগর্ভ, খণ্ডিত ভারত হতেও পুনরায় পৃথক হবার চক্রান্তে নিমগ্ন। প্রশাসনকামী রাজনৈতিক দল-গুলো স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

ভারতের ধর্মীয় মেলায় যুগে যুগে হিন্দুর ধর্মদীপ্ত জীবনধারার সন্ধান এখনো মেলে। ভারতের শোচনীয় রাজনৈতিক পরাধীনতার যুগেও খৃষ্টান বিদেশী পরিব্রজক Mark Twain প্রয়াগের মাঘমেলা দেখে বিস্মিত, বিমুগ্ধ। শাশ্বত ভারতীয় সংস্কৃতির বন্দনায় তিনি বলছেন—

This is indeed India,······The cradle of the human race, birth place of human speech, mother of history, grandmother of legends, the great grandmother of tradition, whose yesterdays bear date with the moulding antiquities of the rest of nations···the one sole country under the sun that endowed with an imperishable interest for alien prince and alien peasant, for the tattered and the ignorant, the wise and the fool, rich and the poor, the bound and the free, the one land that all men desire to see, and having seen once by even a glimpse, would not give the glimpse for the show of all the rest of the globe combined."

এই ঘোর সংকটকালে ক্রান্তদর্শী রবীন্দ্রনাথের বাণীতেই আশ্বস্ত হবার চেষ্টা করি—

> ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে, হে ধরিত্রী, আছ তুমি জাগি
> ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান,
> দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান
> বৈরাগ্যের শুভ্রসিংহাসনে। ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
> মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টি হারা
> শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুণ্ড তা ঘেরি,
> বীভৎস চীৎকারে তারা রাত্রি দিন করে ফেরাফেরি
> নির্লজ্জ হিংসায় করে হানা হানি ॥ শুনি তাই আজি
> মানুষ জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।
>
> বলে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
> গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।

(সেঁজুতি)

ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য

স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার। স্বাধীনতার আশীর্বাদেই রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এবং প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব। তাই স্বাধীনতার স্পৃহা সর্বজনীন ও সার্বকালিক। কিন্তু, কিছু কিছু ক্ষমতামদমত্ত, পররাজ্যলোভী মানুষ যুগে যুগে নানা ছলে এবং আসুরিক শক্তিতে বিভিন্ন দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। তাদের শাসন, শোষণ এবং নির্যাতন নিপীড়িত মানবাত্মার মর্মভেদী আর্তনাদে যুগে যুগে সমাজ হয়েছে সচকিত। সবলের অত্যাচার হ'তে পরিত্রাণের জন্য দেশে দেশে সংঘটিত হয়েছে রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রাম। সাধারণতঃ জাগতিক স্বাধিকার অর্জনের জন্যই পৃথিবীর সর্বত্র সর্ব যুগে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবন-দর্শন হ'ল সকল দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল ভিত্তি। কোথাও অন্নের জন্য, কোথাও বা ক্ষমতার জন্য দেখেছি মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা।

ভারতবর্ষের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য অন্যান্য বহু ক্ষেত্রের ন্যায় এই মুক্তিসংগ্রামের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়েছে। কেবলমাত্র বস্তুবাদী দর্শনের রুটির কিংবা রুজির লড়াই ভারতের মুক্তিসংগ্রাম নয়। যুগযুগান্তব্যাপী বিশেষ এক অধ্যাত্মচেতনা ভারতের মুক্তিসংগ্রামে সঞ্চার করেছিল মহতী প্রেরণা। তারই ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বিশেষ কোন রাজনৈতিক শ্লোগানের পরিবর্তে একটি অভিনব মন্ত্র "বন্দে মাতরম্" সমগ্র ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। মননাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্রঃ—যা মনন করলে ত্রাণ পাওয়া যায় তাই হ'ল মন্ত্র। আসমুদ্র হিমাচল ভারতের নরনারীকে এই মন্ত্র স্বাধীনতার যুদ্ধে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চার করেছিল। এই মন্ত্র উচ্চারণ করেই ভারতের মুক্তিপাগল সন্তানেরা হাসি মুখে "ফাঁসীর মঞ্চে" জীবনের জয়গান গেয়েছিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা "জীবন-মৃত্যু"কে পায়ের ভৃত্য করে সেদিন দেশমাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে আত্মাহুতিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। সেই "মহামন্ত্রের" শতবার্ষিকীর পুণ্য লগ্ন গত হ'ল। তাই, স্বাধীন ভারতের দিকে দিকে এই মুক্তি-মন্ত্রের স্মরণে উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। "বন্দে মাতরম্"কে উপলক্ষ্য করে মাতৃবন্দনার যে উৎসব দিকে দিকে প্রতিপালিত হয়েছে, তার উৎসানুসন্ধানে যাত্রা না করলে ভারতীয় জাতীয়তার প্রকৃত তাৎপর্য আমাদের হৃদয়ংগম হবে না।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু দেশহিতৈষণার প্রমত্ততা নয়, এর পশ্চাতে রয়েছে যুগযুগান্তব্যাপিনী এক মহতী ভাবধারা, সত্যোপলব্ধিসঞ্জাত এক গভীর প্রত্যয়। দেশের মর্মোত্থিত সেই সত্যের আলোকে জীবনকে জাগ্রত না করলে বৈদেশিক শ্লোগানের আপাত উত্তেজনার অবসানে জাতীয় জীবন হবে অবসাদ—

গ্রস্ত, বিষাদ-খিন্ন। তাই স্বাদেশিকতার স্বদেশীয় রূপটির পরিচয় গ্রহণ অপরিহার্য কর্তব্য বলেই মনে হয়।

ভারতীয় দৃষ্টিতে স্বদেশ শুধু ভৌগোলিক সীমায় সীমিত জড়মৃত্তিকা-সমষ্টি নয়। বৈদিক ঋষির ধ্যান দৃষ্টিতে মাতা ধরিত্রী জড় প্রকৃতি বা ভূমিমাত্রাবশিষ্টা নন্। ঋগ্বেদের মন্ত্রে তিনি "প্রাণদায়িনী, অন্নদায়িনী, স্তন্যদায়িনী কল্যাণী মাতা"। যে বিস্তীর্ণা পৃথিবী দেশমাতৃকারূপে আমাদের কাছে উপনীতা "মাতা পৃথিবী মহীয়ং" বলে তাঁকে বহুবিধ স্তরে বন্দনা ক'রে চলেছেন ঋগ্বেদের ঋষি। অথর্ববেদের "পৃথিবীসূক্ত" ধরিত্রী বন্দনার অনবদ্য স্তুতি। ঋষি ভক্তিপ্লুত চিত্তে ব'লে চলেছেন—"পৃথিবী আমাদের কল্যাণী মাতা। তিনি ধর্মের দ্বারা ধৃতা। তিনি যেন আমাদের শ্রী এবং সম্পদে প্রতিষ্ঠিত করেন, বিনষ্ট করেন আমাদের প্রতি অন্যের বিদ্বেষ।

> "বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী।
> বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নিমিন্দ্র ঋষভা দ্রবিণে নো দধাতু॥
> যত্তে মধ্যং পৃথিবী যচ্চ নাভ্যং যাস্ত উর্জস্তন্বঃ সম্বভূবুঃ।
> তাসু নো ধেহ্যভি নঃ পবস্ব মাতা ভূমিং পুত্রো অহং পৃথিব্যা॥
> ……যা নো দ্বিক্ষত কশ্চন।"

বসুন্ধরার এই সন্তানবৎসলা কল্যাণী মাতৃমূর্তি ভারতীয় জনমানসকে চিরকালই অনুপ্রাণিত করেছে। সংহিতার পরে ব্রাহ্মণের যুগেও "ঐতরেয় ব্রাহ্মণে" ধরিত্রীকে দেবী শ্রীরূপে বন্দনা করা হয়েছে। উপনিষদের যুগে ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরা এই "শ্রী"কেই দেখেছেন শস্য ও সম্পদের দেবী লক্ষ্মীরূপে। "নারায়ণোপনিষদে" মাটির পৃথিবীকে মাতা লক্ষ্মী বা শ্রীরূপে বন্দনায় ঋষি কণ্ঠ মুখর। মাটিতো সত্যিই "মা"—টি। ধরিত্রীসন্তান মাতৃসাধক এখানে পৃথিবীকে স্তুতি করছেন—

> "অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
> শিরসা ধারয়িষ্যামি রক্ষস্ব মাং পদে পদে॥
> ভূমির্ধেনুর্ধরণী লোকধারিণী।
> ... .
> মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্॥
> মৃত্তিকে দেহি মে পুষ্টিং ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥"

অষ্টাদশ পুরাণের বহু শ্লোকে দেবী পৃথিবীকে ভূশক্তি এবং বিষ্ণুশক্তিরূপ অর্থাৎ জনয়িত্রী এবং পালয়িত্রীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যে শারদীয়া দুর্গাপূজায় মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সপ্তশতী চণ্ডী আমাদের অবশ্য পাঠ্য, তাতে "মহী" রূপে স্থিতা মহাশক্তি তথা জগন্মাতাকে বন্দনা করা হয়েছে।

> "আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
> মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।"

চণ্ডীতে "শাকম্ভরী" রূপে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেবী অন্নপূর্ণা তথা

দেশমাতৃকাকেই বন্দনা করা হয়েছে। আমাদের মাতৃ তথা শক্তিসাধনার সুগভীর রহস্য এবং বিস্তৃত আলোচনা তন্ত্রের মুখ্য উপজীব্য। ব্রহ্মের মুখ্যতঃ মাতৃরূপেরই পূজার্চনা তন্ত্রসাধনায় প্রাধান্য লাভ করেছে। তন্ত্রসাধকের ধ্যানদৃষ্টিতে পরমা মহাশক্তিই "জন্মদাত্রী মাতা, দুগ্ধামৃতদানে মানবশিশুর প্রাণরক্ষয়িত্রী পয়স্বিনী গোমাতা এবং দেশমাতা রূপে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূতা। তন্ত্রে স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে—

"সর্বপ্রসূর্জন্মভূমিঃ জননী গৌ পয়স্বিনী।
মহাশক্তের্জগন্মাতুঃ প্রতিরূপা সুশোভনা ॥

মাতৃভূমি তো বিশাল ধরিত্রীরই অংশবিশেষ। ক্ষুদ্রকে অবলম্বন করে বিরাটের অর্চনা, সসীম মূর্তিকে অবলম্বন করে অসীম ব্রহ্মের সাধনার কৌশল ভারতীয় প্রজ্ঞার মনোবিজ্ঞানসম্মত আবিষ্কার। খণ্ডের মাধ্যমে অখণ্ডের উপাসনা আমাদের বিশিষ্ট সাধন পদ্ধতি। তাই, বিশ্বমাতার স্তুতি-বন্দনা দেশমাতাকে অবলম্বন করেই আরম্ভ করার নির্দেশ দিয়েছেন তন্ত্র-সাধক। স্বদেশকে উপেক্ষা বা লঘু করে বিশ্বের কল্যাণ কখনো সম্ভব নয়। দেশপ্রেমেরই পরিণতরূপ বিশ্বপ্রেম। এই জন্যে সত্যিকারের বিশ্বপ্রেমিক দেশপ্রেমের ধারাপথেই স্বকীয় সাধনাকে প্রবাহিত করেন। নীতিহীন রাজনীতিকে জীবিকা বা আপাত-জনপ্রিয়তার জন্য সস্তা বিদেশী বুলিকে সেদিন ভারতের স্থিতধী দেশপ্রেমিকরা জীবন ধর্ম বলে গ্রহণ করেননি। সেই ঊনবিংশ শতকে জাগৃতির দিনে শক্তি তথা মাতৃসাধনার এই বৈদিকী এবং তান্ত্রিকী ধারাদুটির গঙ্গা যমুনা সঙ্গম রচিত হয়েছিল তাঁদের মানস-তীর্থে। শত শতাব্দীর ঐতিহ্যের ধারা পথেই বঙ্গ-ভারতের নব জাগরণে দেশমাতৃকার বন্দনা গানে ধ্বনিত হয়েছে দুর্গতিহারিণী মহাশক্তিরই স্তুতি-গীতি।

ঊনিশ শতকের খাঁটি বাঙালী জাতীয় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ধর্মধৃতা ভারত-ভূমিকে "জননী" বলে সম্বোধন করছেন—

"জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি
ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে।
তোমার সন্তান যত সকলেই জ্ঞানহত
কেন মিছে মর ভার বয়ে।"

সেই ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রমত্ততার যুগে প্রতীচ্য শিক্ষায় নিষ্ণাত হয়েও দূরদর্শী, স্থিতধী, মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় এক অনন্যসাধারণ পুরুষ। ইংরেজী-শিক্ষিত, হিন্দু কলেজের ছাত্র, উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী অথচ স্বাধীনচেতা, স্বাজাত্যবোধে উদ্দীপ্ত, স্বধর্মনিষ্ঠ, বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন তাঁর ন্যায় মনীষী সেকালে কেন একালেও একান্ত দুর্লভ। সংস্কৃত পণ্ডিতের সন্তান ভূদেব তন্ত্রসাধনায়ও ছিলেন সমুন্নত। সেযুগে প্রতীচ্য-বিদ্যানিষ্ণাত ভূদেব শাশ্বত ভারতীয় প্রজ্ঞালব্ধ অনুভূতি নিয়ে দেশকে প্রথম

মাতৃমূর্তিতে বন্দনা করেন। ১৮৭৬ এ প্রকাশিত "পুষ্পাঞ্জলি" গ্রন্থে জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে "অধিভারতীকে" তিনি বন্দনা জানাচ্ছেন। দেশমাতৃকাকে "অন্নদানরতা" মাতৃমূর্তি এবং দুর্গতিনাশিনী মহাদেবীরূপে দিব্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে ভূদেব রচনা করলেন "অধিভারতী-স্তুতি"।—

"মাতর্নমামি ভবতীং সতীদেহরূপাং
মাতর্নমামি বসুধাতল-পুণ্যতীর্থাং
মাতর্নমামি পদযুগ্মধৃতসমুদ্রাং
মাতর্নমামি হিমগৌরকিরীটভূষাম্ ॥
হেমাভা হরিদম্বরা পদতলে নীলাম্বুলীলাঞ্চিতা।
স্নিগ্ধা স্নিগ্ধতরঙ্গিণী সুরধুনী পীযূষ-নিঃস্যন্দিনী।
সূর্যেন্দু-প্রতিবিম্বিতাম্বরলৎ প্রালেয়-মৌলিজ্বলা
সৌম্যা "স্যাদধিভারতী" ভয়হরা নিত্যান্নদা শান্তয়ে ॥"

সুজলা সুফলা দেশমাতৃকার মহাশক্তিরূপে এই বন্দনাত্মক শ্লোকটি পূর্বে তিনি রচনা করেছিলেন এবং পরে 'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। ভূদেব ছিলেন সে যুগের বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ প্রতীচ্যবিদ্যানিষ্ণাত, স্বদেশীভাবাপন্ন মনীষিমণ্ডলীর গুরুস্থানীয় যুগপতি। বঙ্কিমচন্দ্রের অনবদ্য সৃষ্টি 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে এই "অধিভারতীর"ই বন্দনা এবং বর্ণনা আরো বিস্তৃত ভাবে পরিলক্ষিত হয়। চুঁচুড়াতে ভূদেবের বাসগৃহের নিকটেই জোড়াঘাটের পাশের বাটীতে বঙ্কিমচন্দ্র তখন বাস করতেন। ১৮৭৬-এর ২০শে মার্চ হতে ১৮৮০-র ৬ই নভেম্বর পর্যন্ত তিনি চুঁচুড়াতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং কমিশনারের পি-এ পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৮২তে প্রকাশিত "আনন্দমঠ" উপন্যাসে যদিও "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতটি সন্নিবিষ্ট হয়, তবুও তার অনেক পূর্বেই ১৮৭৬-এ এই মন্ত্রসঙ্গীতটি রচিত হয়। ১৮৭৪ এ একদিন কলকাতার কলকোলাহল হতে কাঁটালপাড়ার শান্ত পরিবেশে যাবার জন্য তিনি যখন যাত্রা করেছেন, তখন পথের দুধারে মৃন্ময়ী মাতৃভূমিকে দেখে আকস্মিকভাবে তাঁর মনের মুকুরে ভেসে উঠলো দেশমাতৃকার চিন্ময়ী রূপ। সেই রূপকেই কথাকোবিদ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অনবদ্য ভাষায় সঙ্গীতে মূর্ত করে তুললেন। আপাত জড়তার অন্তরালে চিন্ময় সত্তাকে দর্শন যাঁরা করেন তাঁরাইতো ঋষি—"ঋষিশ্চ কিল দর্শনাৎ"। আর "দেবী—ভাগবত" পুরাণের ভাষায়—"নাঋষিঃ কুরুতে কাব্যম্"—"সত্যকারের ঋষি ব্যতীত আর কেউ যথার্থ কাব্য রচনা করতে পারেন না। দ্রষ্টা বঙ্কিম তাই এই আর্যদৃষ্টির জন্যই স্রষ্টার আসনে অধিষ্ঠিত। মনীষী ভূদেবের "ডায়েরীতে" দেখা গেছে বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতটি রচনা করে গুরুকল্প ভূদেবকে দেখতে দিয়েছিলেন। তারপর তাঁর কিঞ্চিৎ উপদেশে কিঞ্চিৎ অদল বদলও করেছিলেন। পরিপূর্ণ সঙ্গীতটি হল—

বন্দে মাতরম্ ।
সুজলাং সফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্ ।
শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীং
ফুল্ল-কুসুমিত দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ॥
সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ-করালে
দ্বি-সপ্তকোটিভুজৈধৃত খরকরবালে ।
অবলা কেন মা এত বলে
বহুবল ধারিণীং নমামি তারিণীম্
রিপুদলবারিণীং মাতরম্ ॥
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে ।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী,
কমলা কমল দল-বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাম্ অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্ ।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্ ।
বন্দে মাতরম্ ॥

পূর্বালোচিত পশ্চাদ্ভূমিকে বিশ্লেষণ করলেই এই মন্ত্রসঙ্গীতটির তত্ত্ব আরো গভীর ভাবে উপলব্ধি করা যায়। সঙ্গীতটির প্রথমে "সুজলাং সুফলাং" হতে কিছুটা অংশে রয়েছে স্বদেশপ্রেমের সংগে ভৌম প্রীতি। "সপ্তকোটি কণ্ঠ" হতে কিছুটা অংশে ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবোধ এবং "ত্বংহি দুর্গা" হতে অবশিষ্টাংশে অধ্যাত্মবোধের অপূর্ব উৎসার দেখা যায়। শাশ্বত ভারতের আর্য সাধনার যথার্থ উত্তরাধিকারী বঙ্কিমচন্দ্র ধ্যানদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলেন ধর্ম এবং স্বাদেশিকতা বস্তুতঃ অভিন্ন। তাই তাঁর কাছে দেশমাতৃকা দশ-প্রহরণধারিণী শক্তি-ভক্তি-প্রদায়িনী দুর্গতিহারিণী দেবী দুর্গা। সাধনলব্ধ অনুভূতিতে জড় মৃত্তিকার পরিবর্তে, নিছক ভৌগোলিক রূপরেখার ঊর্ধ্বে মৃন্ময়ীর মধ্যে

চিন্ময়ীকে দর্শনে ধন্য হলেন যথার্থ ভারত সন্তান বঙ্কিমচন্দ্র। ভারতীয় সনাতন প্রজ্ঞারই অনুবর্তনে উদাত্ত কণ্ঠে গাইলেন মহামাতৃকার এই বন্দনা গান।

মাধুর্যের সংগে বীর্যের সমন্বয়ে ভারতের যে ভাগবতী চেতনা এবং সেই সমন্বয়ের আদর্শটি যে ভারতের জাতীয় জীবনে পরিপালনীয় তারও গভীর ব্যঞ্জনা এই সংগীতে। সুহাসিনী সুমধুরভাষিণী মাতাই আবার দশপ্রহরণধারিণী।

বিশ্বের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এই সংগীত রচনা এবং তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব এক অভিনব ঘটনা। জড়বাদী রাজনৈতিক দর্শনের প্রবক্তারা এমন ঐতিহ্যসম্পন্ন, শক্তিসঞ্চারী কথাকে জাতীয় মুক্তিমন্ত্রে রূপ দান করতে পারেন্ নি। "বান্ধব" পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষকে বঙ্কিমচন্দ্র ১৬/১/১৮৮২ তে লিখেছিলেন যে যাঁরা "বন্দে উদরম্ মন্ত্রে" দীক্ষিত সেই স্বার্থপর এবং বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিদের কাছে এই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র উপেক্ষিত হতে পারে। কিন্তু, বিশ ত্রিশ বৎসর পরে এই মন্ত্রে যে বাংলা পাগল হয়ে যাবে সেই কথা তিনি তাঁর কন্যাকে পত্রযোগে জানান। ভারতের বিপ্লব আন্দোলনে 'বন্দে মাতরম্' সংগীত এবং আনন্দমঠ উপন্যাস অপরিসীম প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। ১৭৭২ এর সন্ন্যাসী বিদ্রোহ আনন্দমঠের উপজীব্য হলেও ১৮৫৭ এর সিপাহী বিদ্রোহ যা বঙ্কিমে ১৯ বৎসর বয়সে সংঘটিত হয় এবং ১৮৮০তে মহারাষ্ট্রবীর বিখ্যাত বিপ্লবী বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কের বিপ্লব প্রয়াস তাঁকে অধ্যাত্ম ঐতিহ্য-মণ্ডিত বিপ্লবাত্মক উপন্যাস "আনন্দ মঠ" রচনায় প্রবুদ্ধ করেছিল বলে অনুমান করা চলে। এই বিষয়ে ডাঃ বিমান বিহারী মজুমদারের কথা স্মরণীয়—

"There is a close parallel between the incidents in Anandamath and Phadke's struggle. It is natural that this heroic life should have given inspiration for the writing of Anandamath';

সংস্কৃত ভাষার সুরমাধুর্য এবং ভাবগাম্ভীর্য সংগীতকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছিল। অর্থের সারল্য, শব্দের বিন্যাস, ছন্দের সৌন্দর্য সব মিলে এই সংগীত যে কোন ভারতসন্তানের চিত্তকে লোকোত্তর শক্তিতে সঞ্জীবিত করে। কিছু দিনের মধ্যেই "বন্দে মাতরম্" এই ধ্বনি নিষ্কাম কর্মযোগ এবং দেশ-মাতৃকার মুক্তি যজ্ঞে আত্মাহুতির অগ্নি-মন্ত্রে পরিণতি লাভ করল। 'India's struggle for Freedom গ্রন্থে এই সত্যই ঘোষিত হচ্ছে—

"It is now a known fact that hundreds of young revolutioneries of Bengal were inspired by the message of Vivekananda and cheerfully embraced suffering and death with 'Vande Mataram' on their lips and Vivekananda's teachings in their heart. (page 22)

যোগী ঋষি, বিপ্লবী অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের আদর্শকে জীবনবেদ

রূপে গ্রহণ করলেন। 'ভবানী মন্দির' গ্রন্থে সেই জীবনাদর্শকে তিনি রূপায়িত করার চেষ্টায় হলেন অগ্রণী। আসমুদ্র হিমাচল এই ধ্বনিতে সেদিন প্রকম্পিত হতে লাগলো। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন—

"It was thirty two years ago that Bankim wrote his great song and few listened, but in a sudden moment of awakening from long delusions the people of Bengal looked round for the truth and in a fated moment somebody sang 'Vande Mataram'. The mantra had been given and in a single day a whole people had been converted to the religion of patriotism. The mother had revealed herself, Once that vision has come to a people there can be no rest, no peace, no further slumber till the temple has been made ready, the image installed and the sacrifice offered."

ভগিনী নিবেদিতা নিত্য "বন্দে মাতরম্" সংগীত সমবেত কণ্ঠে গীত করে তাঁর বিদ্যালয়ের পাঠ শুরু করতেন। সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় অগ্নিক্ষরা বাণীতে 'বন্দে মাতরম্'এর স্ফুলিঙ্গ ছড়াতে আরম্ভ করলেন। ১৯০৫ সনে বিপিনচন্দ্র পাল মাত্র ৫০০ টাকা মূলধন নিয়ে 'বন্দে মাতরম্' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে এগিয়ে এলেন। ১৯০৬ এর ৬ই আগষ্ট তার প্রথম সংখ্যা বের হল। ডিসেম্বর হতে এই অগ্নিবর্ষী পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন অগ্নিঋষি অরবিন্দ।

১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্ট কলকাতা টাউন হলে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ঐতিহাসিক সমাবেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অগণিত নরনারী 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি সহকারে সমবেত হয়। সভায় এবং শোভাযাত্রায় সেদিন এই 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি লক্ষ মানুষকে ঐক্যবন্ধ করে। ১৬ই অক্টোবর লর্ড কার্জন বংগভূমিকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করার সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রতিবাদে গর্জে উঠলো বাঙালী, উত্তাল আন্দোলনে সমগ্র ভারত প্রকম্পিত হ'ল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ৭ই আগষ্টের সেই সভায় জনগণকে আহ্বান জানালেন—

"Your innermost feeling should be in perfect harmony with the raga and bhava of Vande Mataram.

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় উদাত্তকণ্ঠে গাইলেন এই অপূর্ব সংগীত, চিহ্নিত করলেন ভারতের চিরন্তন জাতীয় সংগীতরূপে। তারও পূর্বে ১৮৮৬তে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে হেমচন্দ্র ঘোষ 'রাখীবন্ধন' নামক সংগীতটি গাইবার সময় 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের শেষাংশও তাতে জুড়ে দেন। ১৮৯৬এ কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মল্লার রাগে পূর্ণ "বন্দে মাতরম্" সংগীতটি

পরিবেশন করেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সর্বপ্রকার সরকারী আনুকূল্য বিনাই এই সংগীত ভারতের সর্বজনীন জাতীয় সংগীত রূপে আদৃত হয়ে চলেছে। 'The role of honour' গ্রন্থে এই 'বন্দে মাতরম্'কে বলা হচ্ছে—'The reviving mantra which is creating a new India, the mantra Vande Mataram.' (p. 138)

Thodre L. Shoy তাঁর The Legacy of Lokamanya 'গ্রন্থে বলেছেন-

"Swadeshi was a practical application of love of Country. It was an economic, political and spritual weapon. Swadeshi was Vande Mataram in action, (p. 96)

বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা ডঃ আর আর দিবাকর তাঁর Mahayogi গ্রন্থে এই কথাটি বলছেন—"The immortal song Vande Mataram became in the swadeshi days the symbol of nationalism. It spread throughout India and was on the lips of all as the national song. (p. 47)

১৯০৫-এর ১৬ই অক্টোবরকে বংগ বিভাগের দিন রূপে বৃটিশ সরকার ঘোষণা করায়, সেই দিনটিকে জাতীয় শোকদিবস রূপে পালন করার জন্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ আহ্বান জানান। রাখী, বন্ধন, অরন্ধন, গঙ্গাস্নান, শোভাযাত্রা সহকারে বন্দে মাতরম্ সংগীত পরিবেশনাদির দ্বারা সেদিনটিকে অবশ্য করে তোলা হয়। Indian Nationalist Movement and Thought গ্রন্থে দেখি—"The streets of Bengal echoed from early dawn by the cries of Vande Mataram.' (p. 65)

বংগ ভংগের বিরুদ্ধে তিন সহস্রাধিক সভা সেদিন 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি এবং সংগীত সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়। Thodre L. Shoy The Legacy of Lokamanya গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন—"All Indians, the nationalists taught, regardless of their religion, province, sect, language, cast and profession, must become united around love of country. The sentiment and the mystic overtones the nationalists gave it, was perhaps best expressed by the rallying cry of Vande Mataram. Bow down to the mother. From Bengal the cry surged across the entire sub-continent —Vande Mataram ! As her sons bowed down, India arose." (P. 93)

সারা দেশে বিপ্লবী তরুণবৃন্দ এই মহামন্ত্রের মধ্যেই পেলো অতুলনীয় শক্তি। সর্বত্র এই ধ্বনিই তাদের কণ্ঠে। ফাঁসির মঞ্চে এই 'বন্দে মাতরম্" মন্ত্রই উচ্চারণ ক'রে তারা দৃপ্ত ভঙ্গীতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে। ক্ষুদিরাম,

কানাইলাল, প্রফুল্ল চাকী থেকে সূর্য সেন পর্যন্ত সকলেই এই মন্ত্রই মৃত্যু লগ্নেও উচ্চারণ ক'রে গেছেন। বরিশালে কংগ্রেস অধিবেশন নিষিদ্ধ করার পর পুলিশের দল তরুণদের যতই প্রহার করছে, অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত ততই তারা ধ্বনি তুলছে "বন্দে মাতরম্"। সরকার সর্বত্র "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি উচ্চারণ নিষিদ্ধ করে দিলো। সবাই স্কুলে, পথে, প্রান্তরে এই ধ্বনিই সমস্বরে উচ্চারণ করতে লাগলো। সরকারের বেত্রাঘাত এবং নানাবিধ নির্যাতন যতই তীব্র হ'তে লাগলো ততই বেশী করে অসংখ্য ছাত্র জেলায় জেলায় "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিদানে মেতে উঠলো। ফলে, পরে এই সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। ১৩।১০।১৯০৫ তারিখে কলকাতায় "বন্দে মাতরম্" সম্প্রদায় নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হল। মন্মথ নাথ মিত্র সভাপতি এবং সাহিত্যিক সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি সম্পাদক ও রায় বাহাদুর অমৃতলাল মিত্র ছিলেন তার কোষাধ্যক্ষ। প্রতি রবিবারে "বন্দে মাতরম্" গান গাইতে গাইতে প্রধান প্রধান পথে শোভাযাত্রা সহকারে এই সংস্থার সদস্যেরা স্বদেশীর জন্য চাঁদা সংগ্রহ করতেন। বিখ্যাত সাংবাদিক হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের মতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও শোভাযাত্রায় মধ্যে মধ্যে যোগদান করতেন। এই মন্ত্র দেশবাসীকে অভীঃ মন্ত্রে দীক্ষিত করল। ব্রতী সমিতি, আত্মোন্নতি সমিতি এবং এই রকমের আরো নানা প্রতিষ্ঠান দেশের আনাচে কানাচে গড়ে উঠ্‌লো। সদস্যেরা "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য তৈরী হতে লাগলো। এতদিন যারা নিষ্ক্রিয়ভাবে সরকারী পুলিশের মার খেতো, তারা এখন প্রতিরোধের জন্য অস্ত্রবিদ্যা এবং শরীর চর্চা শুরু করল। এই মন্ত্র দেশবাসীকে সক্রিয় প্রতিরোধে করল উদ্বুদ্ধ। ১৭। ৫।১৯০৭ এর Englishman পত্রিকায় কুমিল্লার সংবাদ প্রকাশিত হল—

"There was consideradle evidence to suggest that a large number of gymnasia had come into being to train vrati and Vande Mataram members in the use of arms, particularly the lathi, the dagger and the sword. The gupti is now sold publicly"

১৮। ৫। ১৯০৭ এর The Times of India পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হ'ল—

"National volunteer groups were active in every village of East Bengal and most of West Bengal. They used to wear a peculiar uniforn, and most an yellow turban and a red shirt, and march through the streets, shouting "Vande Mataram" and singing national songs."

ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, প্রফুল্ল চাকী এবং খ্যাত অখ্যাত সকল বিপ্লবী বালক এই মন্ত্রেরই শক্তিতে সুস্থিত থাকায় বৃটিশের শত প্রলোভনে এবং শত নির্যাতনেও

পথচ্যুত হয়নি। লণ্ডনে মদনলাল ধিংরা ফাঁসির মুহূর্তেও উচ্চারণ করছেন "বন্দে মাতরম্"। বারাণসীতে তরুণ সুশীল চন্দ্র লাহিড়ীকে যখন ফাঁসির রজ্জু পরানো হচ্ছে তখনো স্থির ভাবে উচ্চারণ করছেন "বন্দে মাতরম্"। The Roll of Honour গ্রন্থে তার ফাঁসির বিবরণে আছে—"Unto the last he maintained equanimity of mind. He bathed in the morning in water brought from the Ganges, and performed the morning rituals of a devout brahmin. Then, he proceeded unfalteringly and ascended the steps leading to the gallows with dignity and firmness befitting a hero who had staked everything for the independence of his country. **The last words in his mouth were "Vande Mataram, the noose closely tightening against his throst**" (P. 326.)

বরিশালে কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সের সময় বালক চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতাকে জলে ফেলে দিয়েও যখন পুলিশ লাঠিপেটা করছে, তখনও যতক্ষণ জ্ঞান ছিল ততক্ষণ সে উচ্চারণ ক'রে চলেছে "বন্দে মাতরম্"।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, বিয়াল্লিশের আগষ্ট বিপ্লব, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সর্বত্রই সর্বসময় এই "বন্দে মাতরম্"ই ছিল সকলের কণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্র। ভারতের বাইরের ভারত-মুক্তিকামী বিপ্লবীদেরও মন্ত্র ছিল এই "বন্দে মাতরম্"।

এই সঙ্গীত ও মন্ত্র ভারতের সর্বদলের জাতীয় মুক্তিসঙ্গীত ও জপমন্ত্র। এই মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছে মৃন্ময়ী দেশমাতৃকাই চিন্ময়ী মহাশক্তি। তাই, এই মন্ত্রই দেশবাসীর চিত্তে শক্তি এবং ভক্তি সঞ্চারিত করেছে। মাতৃভক্তের নিকটে মায়ের অখণ্ড এবং ঐশ্বর্যশালিনী মূর্তিটি চিরবাঞ্ছিত। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ সন্তানের নিকট মাতৃ-অঙ্গের বিচ্ছেদ দুঃসহ, অচিন্তনীয়। দেশকে মাতা ব'লে বন্দনাকারীর নিকট দেশবাসীমাত্রই ভ্রাতা। স্বামী বিবেকানন্দের বীর বাণী 'বল ভারতবাসী আমার ভাই'—তাঁরই কণ্ঠে উচ্চারিত হতে পারে। জনগণের মধ্যে যথার্থ ঐক্যচেতনা এই মন্ত্রের দ্বারাই জাগ্রত করা যায়। বিশেষ স্বার্থবুদ্ধি এবং মতবাদের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে বিভিন্ন দল গঠন করা যেতে পারে, ঐক্য প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব নয়। মাতৃভক্তই সেখানে ত্যাগবুদ্ধির দ্বারা দেশসেবায় অগ্রসর হতে পারে।

"বন্দে মাতরম্" এর সাধকই মাতৃচরণে নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করতে পারে। ভক্তই হয় ত্যাগী। ভোগী কখনও ভক্ত হতে পারে না। এই মন্ত্রে যাদের হৃদয়-তন্ত্রী অনুরণিত হয়নি, তারাই ক্ষমতা এবং মর্যাদা অর্জনের জন্য দেশহিতৈষণার নামে প্রমত্ত প্রতিযোগিতায় হয় যুযুধান। লোভে এবং মোহে দল এবং মত বদলে কিংবা একান্ত বিরোধী মতাদর্শের সঙ্গেও সহাবস্থানে তারা কুণ্ঠিত নয়।

স্বদেশকে বন্দনা করার অনীহাই বৈদেশিক আপাতরম্য মতবাদে তাদের দীক্ষিত করে। শাস্ত্রে আছে "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ"—দেবতা হয়ে দেবতাকে পূজো করবে। চারিত্রিক বিশুদ্ধি না থাকলে দেবপূজোর অধিকার অর্জিত হয় না। তাই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের সাধককে হতে হয় পূতচরিত্র। দুর্নীতিপূর্ণ, লালসা-পরায়ণ, ক্ষমতাপ্রমত্ত, অনুগ্রহ-নিগ্রহ সাধনেচ্ছু ব্যক্তি কখনো মাতৃভক্ত হ'তে পারে না, তারা হয় মাতৃঘাতী। ভারতের মুক্তিসংগ্রামে দীপ্তচরিত্র অমৃতপুত্রদের যে লোকোত্তর ভূমিকায় আমরা বিস্মিত, তাদের জীবনে ছিল এই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের অধ্যাত্ম সাধনা। সেই মন্ত্রের সাধনা থেকে যারা বিচ্যুত, সেই অধ্যাত্ম জীবনাদর্শ থেকে যারা ভ্রষ্ট, তাদেরই জীবনে দেখা যায় দেশসেবার নামে বীভৎস বিকৃতি। স্বাধীনোত্তর ভারতে আজ যে রাজনৈতিক সংকটকাল চলেছে, তার নিরসনে প্রয়োজন "বন্দে মাতরম্' মন্ত্রেরই পুনরনুধ্যান। জাতীয় জীবনের সঞ্জীবনী হ'ল ঐ মঙ্গল-গীতিকা। রাষ্ট্রজীবনে ঐ মন্ত্রকে কায়-মনো-বাক্যে যদি প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলেই সার্থক হবে কবির বাণী—

> "চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ
> জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ"।
>
> দ্বিজেন্দ্রলাল

বর্তমানের মনীষী সাধক, কবিশেখর পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণের কণ্ঠে দেশমাতৃকার চরণে প্রার্থনা জানাই—

> এবং ত্বাং বহুপুণ্যকীর্তিনিলয়াং সৌন্দর্যরত্নোজ্জ্বলাং
> ভক্ত্যা ভারতমাতৃকে চ ললিতে বন্দে চিরং প্রাঞ্জলিঃ।
> ত্বং মূর্তি হৃদিসংস্থিতা নয়নয়োরানন্দপদ্মোপমা
> ধ্যানে চেষ্টপরাত্মদৈবতময়ী যাচে ত্বদঙ্কাশ্রয়ম্ ॥

মৈত্রী সাধনায় হিন্দু সংস্কৃতি

ভারতীয় সংস্কৃতির অতুলনীয় দানে মানব সভ্যতা সমৃদ্ধ ও সমুন্নত। বিখ্যাত ঐতিহাসিক Will Durant তাঁর History of Civilisation গ্রন্থে তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ ক'রে বলছেন—"India was the motherland of our race and Sanskrit is the mother of Europe's languages. She was the mother of our Philosophy, mother through the Arabs much of our Mathematics, mother through the Buddha of the ideals embodied in Christianity, mother through the village-community of self-government and democracy, Mother India is in many ways mother of us all." এই ভারতবর্ষীয় সভ্যতার বৈদিক কৃষ্টির উদ্ভব সপ্ত সিন্ধুর পবিত্র তীরভূমিতে। "স"-কে 'হ' রূপে উচ্চারণ করার জন্য বিদেশীদের কাছে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা হিন্দু সভ্যতা রূপে চিহ্নিত হয়। সেই বৈচিত্র্যময় সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির বাণীবহ মনীষিমণ্ডলী এবং সেই সংস্কৃতির অনুসরণকারী সাধারণ জনগণও হিন্দুরূপে পরিচিত হন। তাই, আজো স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিশ্বে হিন্দুরূপেই খ্যাত ও গৃহীত এবং তাঁরাও নিজেদের হিন্দু রূপে আত্মপরিচয়ে অকুণ্ঠ। তাঁদের জীবনাদর্শ ও আচরণ, চর্চা ও চর্যা শাশ্বত ভারতীয় জীবন-পরম্পরারই পরিশীলিত রূপ। **তাই, ভারতীয় ও হিন্দু একই অর্থের দ্যোতক এবং বিশেষতঃ, বিদেশীদের কাছে সকল মতের ও পথের ভারতীয়ই হিন্দু অভিধায় চিহ্নিত। তাই, অখণ্ড, বৈচিত্র্যময়, প্রাচীনতম কাল হ'তে অদ্যাবধি প্রবহমান ভারতীয় সংস্কৃতিরই বর্তমান নাম হিন্দু সংস্কৃতি।** সংজ্ঞায় তাই বলা চলে—উত্তরে সিন্ধু নদ হ'তে ভারত সমুদ্র পর্যন্ত বিশাল এই ভূভাগকে যিনি পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমিরূপে মনে করেন, তিনি ব্যক্তিগত জীবনে যে পথেরই পথিক হোন্ না কেন, তিনিই হিন্দু।

"আসিন্ধু-সিন্ধু-পর্যন্তা যস্য ভারতভূমিকা।
পিতৃভূঃ পুণ্যভূশ্চৈব স বৈ হিন্দুরিতি স্মৃতঃ॥"

তাই, বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন—"আমি নিজেকে হিন্দু বলিয়া গৌরব বোধ করি"। চিকাগোর বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে হিন্দুর সার্বভৌম ধর্মেরই প্রতিনিধিত্ব করে হিন্দুর সমুদার সাধনার কথাই তিনি পরিবেশন করেন। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাই বলেন—"হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।" বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশ চন্দ্র "হিন্দু ভারতেই" পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের অভিলাষ ব্যক্ত করেন। "হিন্দু" অসাম্প্রদায়িক সর্বভারতীয় ঐক্য চেতনার বলিষ্ঠ ধারক। মন্ত্রবুদ্ধি মনীষী আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের বিশ্লেষণে অখণ্ড, মৈত্রীবন্ধন সূচক এই "হিন্দু"

শব্দ অখণ্ড ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক। এতে নেই কোনো সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ব্যঞ্জনা।

বিশ্বের ইতিহাসে এই হিন্দু ভারতের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে গিয়ে ক্রান্তদর্শী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে বলছেন—

"মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়-সম্বন্ধ স্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টা ছিল।"

মানুষ হ'তে আরম্ভ ক'রে বিশ্ব ভুবনের শত্রু মিত্র, পশু-পক্ষীর সঙ্গে পর্যন্ত নিত্য আচরণের মাধ্যমে মৈত্রী বন্ধনের সাধনা হিন্দুর দৈনন্দিন জীবন চর্যা। কবিগুরু বলছেন—

"হিন্দুধর্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সমস্ত মনুষ্য ও পশুপক্ষীর সহিত আপনার মঙ্গল-সম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহা যথার্থরূপে পালিত হইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে ও সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া উঠে।…ভারতবর্ষের মধ্যে একটা বাঁধিয়া তুলিবার ধর্ম চিরদিন বিরাজ করিতেছে। নানা প্রতিকূল ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়াও ভারতবর্ষ বরাবর একটা ব্যবস্থা করিয়া তুলিয়াছে, তাই আজও রক্ষা পাইয়াছে। এই ভারতবর্ষের উপর আমি বিশ্বাস স্থাপন করি। …আমরা প্রত্যেকে যেন সজ্ঞানভাবে ইহাতে যোগ দিতে পারি। —জড়ত্বের বশে বা বিদ্রোহের তাড়নায় প্রতিক্ষণে ইহার প্রতিকূলতা না করি। …এই পৃথিবীতে যে চার প্রধান ধর্মকে আশ্রয় করিয়া চার বৃহৎ সমাজ আছে —হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খৃষ্টান—তাহারা সকলেই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিয়াছে। বিধাতা যেন একটা বৃহৎ সামাজিক-সম্মিলনের জন্য ভারতবর্ষেই একটি বড়ো রাসায়নিক কারখানা ঘর খুলিয়াছেন। … ভারতবর্ষ রাজ্য লইয়া মারামারি, বাণিজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করে নাই। …ভারতবর্ষ সৈন্য এবং পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে অস্থিমজ্জায় উদ্বেজিত করিয়া ফিরে নাই। সর্বত্র শান্তি, সান্ত্বনা ও ধর্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি অধিকার করিয়াছে। এইরূপে যে গৌরব সে লাভ করিয়াছে তাহা তপস্যার দ্বারা করিয়াছে এবং সে গৌরব রাজচক্রবর্তিত্বের চেয়ে বড়ো"।

(সংকলন পৃঃ ৫৩-৫৮)

নিজের মুক্তির সঙ্গে জগতের কল্যাণ—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" —হিন্দুর সাধনা। "আর্য" শব্দের অর্থ হচ্ছে কর্তব্যপরায়ণ, সদাচারী, পরিশীলিতচিত্তের সজ্জন।—

"কর্তব্যমাচরন্ কামম্ অকর্তব্যম্ অনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে, যঃ স আর্য ইতি স্মৃতঃ।"

শুধু নিজে নয় সমগ্র বিশ্বকেই এই সৎপথে সমুন্নয়নই বৈদিকী ভাবনা—

"কৃণ্বন্তো বিশ্বম্ আর্যম্"।

"আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়" এই বৈষ্ণব চেতনারও শুরু ভারতে বহু পূর্বেই। এই পুণ্যভূমিতে এমনি পূত চরিত্র মানুষের আবির্ভাব তাঁরা কামনা করতেন যাঁদের দ্বারা বিশ্বের অন্যত্রও মানুষ চারিত্রিক আদর্শে হবে উদ্দীপ্ত।—

"অস্মদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদ্ অগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চারিত্র্যং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ॥"

(মনুসংহিতা)

ভারত মহাসাগরের উত্তরে এবং হিমালয়ের দক্ষিণে প্রসারিত এই বিস্তীর্ণ দেশের নাম হল ভারতবর্ষ এবং তার জনগণ হল ভারতী।

"উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ ৩-২-১)

যারা ভারতীয়, তথা বিদেশীদের চোখে হিন্দু, তাঁদের কাছে সমগ্র ভারতই স্বদেশ। তাই যুগান্তরে হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের বীরবাণীতে শুনি—"ভারতবাসী মাত্রই আমার ভাই"। হিন্দুর অধ্যাত্ম ও সাংস্কৃতিক সাধনা এই মৈত্রী ভাবনারই ফলশ্রুতি। উপাসনা পদ্ধতি কিংবা রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক আদর্শ ভারতে হিন্দুকে বিচ্ছিন্ন করে নি। বিশ্ব সভ্যতায় এই ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ দান বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা। এই যুগ যুগ বাহিত অখণ্ড ভারতীয় সংস্কৃতিই বৈদেশিকদের দৃষ্টিতে হিন্দু সংস্কৃতি-রূপে এই যুগে রূপে চিহ্নিত। বিশ্ব মানবের চিরন্তন মিলনভূমি এই হিন্দুস্থানের পুণ্য তীর্থে দাঁড়িয়ে কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ "ভারততীর্থ" কবিতায় ঐক্য এমং চেতনার জাগরণে জানিয়েছেন উদাত্ত আহ্বান—

"হেথা একদিন বিরাম বিহীন মহা-ওঙ্কার ধ্বনি
হৃদয়-তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার, সে আরাধনার, যজ্ঞশালার খোলো আজি দ্বার—
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে, আনত শিরে।
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥ (গীতাঞ্জলি)

ভারতীয় হিন্দু ঋষি অনুভব করেন—একই পরমদেবতা সকল মানুষের মধ্যে বিরাজমান— "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ"। তাই, নিষ্ঠাবান হিন্দুই একমাত্র পৃথিবীতে সকল মানুষের পার্থক্য এবং বৈশিষ্ট্য মেনে নিয়েই শংকরা-চার্যের ভাষায় বলতে পারে—

"মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্।"

বর্তমানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং কোথাও কোথাও কোনো কোনো ধর্মের নামে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার হিংসায় কলুষিত বিশ্বমানবসভ্যতার সঞ্জীবন মন্ত্র সনাতন ভারতীয় তথা হিন্দু সংস্কৃতির মর্মবাণীতেই রয়েছে বলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আর্ণল্ড্ টয়েনবী তাঁর "A Study of History" গ্রন্থে ঘোষণা করছেন—"Indian religions are not exclusive minded. They are ready to allow that there may be alternative approaches to the mystery. I feel sure that in this they are right and this Catholic minded Indian religious spirit is the way to salvation for human beings of all religions in an age in which we have to learn to live as a single family, if we are not to destroy ourselves."

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কোথাও ইসলামের নামে, কোথাও খৃষ্টের নামে, কোথাও বা গণতন্ত্রের নামে, কোথাও বা সমাজতন্ত্রের নামে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। কিন্তু প্রত্যেকেই স্বকীয় মতবাদে অন্যকে ধর্মান্তরিত করে মৈত্রী-বন্ধনে উন্মুখ। অপরের বৈশিষ্ট্যকে তাঁরা মানতে রাজী নন। শুধু তাই নয়, অন্যমতাবলম্বীরা কোথাও কাফের, কোথাও হিদেন, কোথাও গণশত্রু, কোথাও বা প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীশত্রুরূপে চিহ্নিত এবং ছলে বলে কৌশলে নির্বিচারে নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুরভাবে বধ্য। সেখানে রাষ্ট্রধর্ম সর্বজনীন মানবধর্মের ঊর্ধ্বে। রবীন্দ্রনাথ তাই "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা" প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

"য়ুরোপের এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা ধর্মকে প্রকাশ্য ভাবে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।……রাষ্ট্রতন্ত্রে মিথ্যাচরণ, সত্য ভঙ্গ, প্রবঞ্চনা এখন আর লজ্জাজনক বলিয়া গণ্য হয় না।……ফরাসী, ইংরেজ, জার্মাণ, রুশ ইহারা পরস্পরকে কপট ভন্ড প্রবঞ্চক বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে গালি দিতেছে। ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে য়ুরোপীয় সভ্যতা এতই আত্যন্তিক প্রাধান্য দিতেছে যে, সে ক্রমশই স্পর্ধিত হইয়া ধ্রুব ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে। হিন্দু সভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। সেইজন্য আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, হিন্দু সভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি। বস্তুতঃ প্রত্যেক সভ্যতারই একটি মূল আশ্রয় আছে। সেই আশ্রয়টি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা তাহাই বিচার্য। যদি তাহা ব্যাপক উদার না হয়, যদি তাহা ধর্মকে পীড়িত করিয়া বর্ধিত হয়, তবে তাহার আপাত উন্নতি দেখিয়া আমরা তাহাকেই একমাত্র ঈপ্সিত বলিয়া যেন বরণ না করি। আমাদের হিন্দু সভ্যতার মূলে সমাজ। য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি।…আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ধাঁচে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব।" (কালান্তর, পৃঃ ৩৫)

ভারতের দীর্ঘ ইতিহাস হচ্ছে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনা। কবি অতুল প্রসাদের ভাষায়—

নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।"

—ভারতের পরিচয়। ক্রান্তদর্শী রবীন্দ্রনাথ "ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করেছেন—"ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয় রূপে অন্তরতর রূপে উপলব্ধি করা—বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাদের নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ়তর যোগকে অধিকার করা।...**যদি ধর্মকেই মানব সভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া স্থির করা যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে।** ভারতবর্ষ পুলিন্দ শবর ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে। এই ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলা স্থাপন কেবল সমাজ ব্যবস্থায় নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি। **গীতায় জ্ঞান প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা দেখি তাহা বিশেষ রূপে ভারতবর্ষের।"**

কায়-মনো-বাক্যে ঐক্যই ভারতের বৈশিষ্ট্য। উপলব্ধ এবং ঘোষিত আদর্শকে আচরণে রূপায়িত করা ভারতের ধর্মসাধনা। **চর্চার সঙ্গে চর্যার সম্মেলন হিন্দুর জীবনাদর্শ।** আমাদের ধর্ম আচার নির্ভর, কেবল বাক্য নির্ভর নয়। বলা হয় 'আচারপ্রভবো ধর্মঃ।'

বৈদিক যুগ হ'তে নানাবিধ আচরণে মিলনের প্রয়াস হিন্দুর লক্ষ্য। হিন্দু ধর্মসাধনার উৎস ঋগ্বেদে সকলের মন, হৃদয়, সংকল্পকে ঐক্যবন্ধ করার বাণী ঘোষিত হচ্ছে।—

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥ (ঋগ্বেদ ১০/১৯১)

অধুনাতম স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু স্বাধীনোত্তর ভারতের প্রধান কর্তব্য নির্ধারণ করেছিলেন—ভাবগত সংহতির সম্পাদন।

"One of the primary tasks for us to-day is the real emotional integration of India."

কিন্তু, নানা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা সেই ভাবগত সংহতি তো সাধিত হল না, বরং ত্রিখণ্ডিত ভারতবর্ষ বহুধা খণ্ডিত হবার মুখে। তাই,

যুগ যুগ ধরে ভারতীয় সংহতির সূত্রগুলিকে সামাজিক জীবনে রূপায়িত করা এখন একান্ত প্রয়োজন ॥

প্রথমতঃ, ধর্মবুদ্ধিতে সমগ্র ভারতকে পবিত্র ভূমিরূপে, চিন্ময়ী মহাশক্তি রূপে ভাবনা হিন্দুর চেতনা। বেদে মাতৃভূমিকে বন্দনা করা হচ্ছে—

"যস্যাং সমুদ্র উত সিন্ধুরাপো।
যস্যামন্নং কৃষ্টয়ঃ সম্বভূবুঃ।" (অথর্ব বেদ ১২-৩)
"যস্যাং গায়ন্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্ত্যাব্যেলবাঃ।
যুধ্যন্তে যস্যাক্রন্দো যস্যাং বদতি দুন্দুভিঃ॥" (ঐ ৪১)

মনু বলছেন—"দেবনির্মিত" এই দেশ। বিষ্ণু পুরাণে বলা হচ্ছে দেবতারাও ভারতে জন্মগ্রহণকারীদের ঈর্ষ্যা করছেন।—

"গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ।" (বিষ্ণু পুরাণ ২-৩-২৪)

শ্রীমদ্ভাগবতেও নানাভাবে এই দেশ-মাতৃকার বন্দনায় দেবতারা মুখর—

"অহো বতৈষাং কিমকারি শোভনং
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ॥" (৫-১৫-২০-২৭)

তীর্থযাত্রার মাধ্যমে সর্বভারতে বহু ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন প্রান্তবাসী মানুষের মধ্যে ঐক্য চেতনা জাগ্রত করা হ'ত। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত সাতটি পর্বতকে সপ্ত কুলাচল ব'লে উল্লেখ করে বন্দনা করা হয়।—

"মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমান্ ঋক্ষ পর্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিযাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্বতাঃ॥"

তেমনি মোক্ষদায়ক পুরী সাতটি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত।

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥"

বারোটি শৈবতীর্থ ও দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অবস্থানে পবিত্র হয়ে সমগ্র ভারতেই প্রসারিত।

"সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালমোঙ্কারম্ অমরেশ্বরে॥
কেদারং হিমবৎপৃষ্ঠে ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্।
বারাণস্যাং চ বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌতমীতটে॥
বৈদ্যনাথং চিতাভূমৌ নাগেশং দ্বারকাবনে।
সেতুবন্ধে চ রামেশং ঘুস্মেষঞ্চ শিবালয়ে॥

এতানি জ্যোতির্লিঙ্গানি সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ।
সপ্তজন্ম কৃতং পাপং স্মরণেন বিনশ্যতি ॥"

গরুড় পুরাণে তীর্থ বর্ণনায় বলা হচ্ছে—

"শালগ্রামো দ্বারকা চ নৈমিষং পুষ্করং গয়া।
বারাণসী প্রয়াগশ্চ কুরুক্ষেত্রংচ সূকরং ॥
গঙ্গা চ নর্মদা গোদা চন্দ্রভাগা সরস্বতী।
শ্রীক্ষেত্রশ্চ মহাকালস্তীর্থাণ্যেতানি শঙ্কর ॥
সর্বপাপহরাণ্যেব ভুক্তিমুক্তিপ্রদানি বৈ ॥"

এই পুরাণেরই ৮১তম অধ্যায়ে সমগ্র ভারতে গম্য পবিত্র তীর্থের বর্ণনাকালে বলা হচ্ছে—

"সর্বতীর্থাণি বক্ষ্যামি গঙ্গাতীর্থোত্তমোত্তমা।
সর্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দুর্লভা ॥
হরিদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।"

সকল হিন্দুর দৈবকর্মে এবং পিতৃপূজায় তীর্থ আবাহন করা হয়।

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥
কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ
তীর্থাণ্যেতাণি পুণ্যানি শ্রাদ্ধকালে ভবন্তিহ।"

বিশাল ভারতের নানা প্রান্তেই এই সকল তীর্থ অবস্থিত, সকল ভাষাভাষী, সকল সম্প্রদায়ের, সকল প্রদেশের মানুষের কাছে পবিত্র। দক্ষিণের রামেশ্বর, উত্তরের বদরিকা, পূর্বের শ্রীক্ষেত্র এবং পশ্চিমে দ্বারকা—এই চারধাম প্রতিটি হিন্দুর পবিত্র গম্য তীর্থ। এইভাবেই একান্নটি শক্তিপীঠও নিখিল ভারতে প্রসারিত, যার তালিকা ঐক্যেরই সূচক। "পীঠনির্ণয়" গ্রন্থে শক্তি ও ভৈরবের উল্লেখে দেখি এগুলির অবস্থিতি। আবার এই ভাবেই সমগ্র ভারতের বিভিন্ন অংশে রয়েছে বিষ্ণুতীর্থ। তারও বিশেষ নাম এবং স্থানের উল্লেখ রয়েছে বিষ্ণু পুরাণাদি গ্রন্থে।

বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত তীর্থসমূহের ন্যায় জৈন, বৌদ্ধ ও শিখ তীর্থ সমূহেরও অস্তিত্ব সর্বভারতে দৃশ্যমান। অনেক স্থলে দেখা যায় একই স্থানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তীর্থের নির্বিরোধ অবস্থান। তীর্থ পরিব্রজনের মাধ্যমে এবং তীর্থগুলিতে নানা তিথি উপলক্ষ্যে মেলা ও উৎসবে এই ঐক্য সাধনাই দৃঢ়ীভূত হয় হিন্দু ভারতে। প্রাদেশিকতার বিষবাষ্প দূরীকরণে তীর্থ ও মেলার ভূমিকা অনন্যসাধারণ। আজো কুম্ভমেলায় সর্বসম্প্রদায়ের কোটির অধিক নরনারী দূরদূরান্ত হতে এসে একই মন্ত্র পাঠ করে লোকোত্তর আনন্দে অভিষিক্ত হন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের অধ্যাত্ম দিগ্বিজয় এবং শ্রীচৈতন্য দেবের

প্রেমপ্রচারণে ভারত পরিক্রমা রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমারেখাকে অতিক্রম করে সর্ব ভারতীয় মৈত্রী বন্ধনেরও অভিনব বাস্তব প্রয়াস। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় উল্লিখিত স্থান সমূহের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করা না গেলেও স্থানসমূহের বৈচিত্র্য ও মাহাত্ম্য হিন্দুমাত্রেরই পরিজ্ঞাত।

সারা ভারতে বহু ভাষা ব্যবহৃত হলেও সংস্কৃতই হচ্ছে অধিকাংশ ভারতীয়ের সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় পবিত্র ভাষা। প্রতীচ্য মনীষী স্যার মনিয়ার উইলিয়ম্‌স্‌ এই সত্যটি উল্লেখ করে লিখেছেন **"India, though it has, as we have seen more than five hundred spoken dialects, has only one sacred language and one only sacred literature, accepted and revered by all adherents of Hiduism alike, however diverse in race, dialect, rank and creed"**

(Hinduism—13)

মহামনীষী মহামনা পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয় বৈচিত্র্যময় ভারতের ঐক্য বন্ধনের সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন এই বলে—

"গো-গীর্বাণী-গঙ্গা-গীতা।"

গোমাতা, সংস্কৃতভাষা, গঙ্গা এবং গীতা সকল সম্প্রদায়ের সকল প্রদেশের হিন্দুর কাছে পবিত্র, আরাধ্য। দক্ষিণের আচার্য শংকর, রামানুজ—উত্তরের শ্রীচৈতন্য নিখিল ভারতে সংস্কৃতের মাধ্যমেই করেছেন ভাবান্দোলন, হয়েছেন পূজ্য। হিন্দুর কালীমন্দিরে বিষ্ণু পূজিত হন, বিষ্ণু মন্দিরে শিবের অবস্থান নির্বিরোধে। আমাদের পূজায় একের জন্য বহু দেবতারই পূজা একসঙ্গে হয়। পঞ্চোপাসনা সকল হিন্দুরই করণীয়। সকলের মধ্যেই ইষ্টের সন্ধান, সকলেরই প্রতি শ্রদ্ধা হিন্দুর সাধনা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা, নানা বাধা-বিপত্তি দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। (সংকলন—৪৬)

এই একাত্ম ভাবনায় এই সেদিনও বর্ষীয়ান্‌ সংস্কৃত কবি কবিশেখর বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ দেব চীনের ভারত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে অখণ্ড দেশমাতৃকাকে বন্দনা করেন তাঁর "প্রবুদ্ধহিমাচলম্‌" নাটকে—

"উদ্যৎ-স্বর্ণ-করোজ্জ্বলাদ্রিমুকুটাং নীলাব্ধিনীরাঞ্চলাং
শ্যামাং কাননকুন্তলাং চ ললিতাং পুণ্যপ্রভাশীতলাম্‌।
কাশী বঙ্গ-কলিঙ্গ মদ্রসহিতাং সৌরাষ্ট্ররম্যস্থলাং
বন্দে ভারতমাতৃকাং সুবরদাং গঙ্গাসরিন্মালিনীম্‌॥"

তাই আজ একাত্মতা যজ্ঞের অনুষ্ঠান ভারতের প্রান্তে প্রান্তে পালন করা একান্ত প্রয়োজন। সেই পুণ্যলগ্নে গঙ্গার বারিধারায় ভারতমাতৃকার বন্দনায়

সবারে করি আহ্বান—কবিগুরুরই ভাষায়—

"মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে ॥"

প্রাদেশিকতার বিষবাষ্পে দেশের আকাশ যখন আচ্ছন্ন, ভোগ এবং লোভের রাজনীতিতে সমাজ যখন অশান্ত, হিংস্র কামনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক বিপ্লবে মোহাচ্ছন্ন, যখন বহু ভারত সন্তান, এবং নেতা আত্মসংস্কৃতির বিস্মৃতি, এবং অবমূল্যায়নকে প্রগতির লক্ষণ বলে মনে করে থাকেন তখন বর্তমান ভারতের কবিগুরু, মুক্তচেতা, ক্রান্তদর্শী রবীন্দ্রনাথের কথাই এই একাত্মতা যজ্ঞের পুণ্য লগ্নে স্মরণ করি।

"বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন, ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানেনা, সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এই জন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এই জন্য সকল পন্থাকেই স্বীকার করে। স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়। ঐক্য সাধনাই ভারতবর্ষীয় প্রতিভার প্রধান কাজ। ভারতবর্ষ কাহাকেও ত্যাগ করিবার কাহাকেও দূরে রাখিবার পক্ষে নহে; ভারতবর্ষ সকলকেই স্বীকার করিবার, গ্রহণ করিবার, বিরাট একের মধ্যে সকলকেই স্ব-স্ব প্রধান প্রতিষ্ঠা 'উপলব্ধি' করিবার পন্থা এই বিবাদ নিরত ব্যবধানসংকুল পৃথিবীর সম্মুখে একদিন নির্দেশ করিয়া দিবে।"

"সেই সুমহৎ দিন আসিবার পূর্বে—'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক।' যে মা দেশের প্রত্যেককে কাছে টানিবার, অনৈক্য ঘুচাইবার, রক্ষা করিবার জন্য নিয়ত ব্যাপৃত রহিয়াছেন, যিনি আপন ভাণ্ডারের চিরসঞ্চিত জ্ঞানধর্ম নানা আকারে নানা উপলক্ষ্যে আমাদের প্রত্যেকের অন্তঃকরণের মধ্যে অশ্রান্তভাবে সঞ্চার করিয়া আমাদের চিত্তকে সুদীর্ঘ পরাধীনতার নিশীথ রাত্রে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, দেশের মধ্যস্থলে সন্তান-পরিবৃত যজ্ঞশালায় তাহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করো।...একদিন যাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই সহজ ছিল তাহা কি আজ আমাদের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।—কখনোই নহে। নিরতিশয় দুঃসময়েও ভারতবর্ষের নিঃশব্দ প্রকাণ্ড প্রভাব নিগূঢ় ভাবে আমাদের জয়ী করিয়া তুলিতেছে। আমি নিশ্চয় জানি, ভারতবর্ষের সুগম্ভীর আহ্বান প্রতি মুহূর্তে আমাদের বক্ষঃকুহরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, এবং আমরা নিজের অলক্ষ্যে শনৈঃ শনৈঃ সেই ভারতবর্ষের দিকেই চলিয়াছি। আজ যেখানে পথটি আমাদের মঙ্গল দীপোজ্জ্বল গৃহের

দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেইখানে আমাদের গৃহযাত্রারম্ভের অভিমুখে দাঁড়াইয়া 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক।' (স্বদেশী সমাজ-সংকলন—৫৮)

আসুন, আজ সকল ভারত সন্তান তথা, হিন্দুসন্তান, কবির আহ্বানে ভারত জননীর পদপ্রান্তে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলি—

বন্দে মাতরম্।

সর্বভারতীয় ঐক্যবন্ধনে রবীন্দ্রসাহিত্যের সংস্কৃতানুবাদ

ভারতীয় জ্ঞানসাধনার গোমুখী ঋগ্বেদের ভাষায় একদিন শংকিত ঋষিকণ্ঠে উদ্গীত হ'য়েছিল কবির নিকটে রক্ষার আকুতি—

"পশ্চাৎ পুরস্তাদধরাদুতোত্তরাৎ
কবিঃ কাব্যেন পরিপাহি রাজন্।"

"হে কবি, পশ্চাতে সম্মুখে নীচে এবং উপরে তোমার দিব্য কাব্যের দ্বারা তুমি আমাদের রক্ষা কর।"

ক্রান্তদর্শী কবির বাণী যথোচিত ভাষায় পরিবেশিত হ'লে মহাসংকট অতিক্রম করা যায়—এই বিশ্বাসে ভারতের চিরন্তন প্রত্যয়। কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের জন্মের শতোত্তর বর্ষ পরে আজ ভারতবর্ষ নানা ভাবে সংকটাপন্ন। তাই আজ আবার সেই প্রার্থনাই জাতির কণ্ঠে নীরবে ধ্বনিত হচ্ছে। স্বাধীনোত্তর ভারতের বৃহত্তম সমস্যা হ'চ্ছে সর্বভারতীয় ঐক্যবিধান। দীর্ঘ-দিনের বৃটিশ শাসনে বহু ভাষা এবং নানা ধর্মের অবাধ লীলাভূমি ভারতবর্ষে ভৌগোলিক ঐক্য কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হ'লেও ভাবগত সংহতি একেবারে তিরোহিত হ'য়ে গেছে। তাই, স্বাধীন ভারতে ভাষা-আন্দোলনের রন্ধ্রপথে ভারতের জাতীয় জীবনে প্রবেশ ক'রেছে আত্মবিচ্ছেদের সর্বনাশা শনি। তার নগ্ন এবং আত্মঘাতী প্রকাশ নবীন ভারতের নূতন ইতিহাসকে ক'রেছে কলংকিত। ভারতবাসীর চৈতন্যসম্পাদন এবং নিখিল ভারতে বাঞ্ছিত ঐক্যের প্রতিষ্ঠার জন্য আজ প্রয়োজন কবিগুরুর মহতী বাণী তথা সঞ্জীবন মন্ত্র। তাই, আজ অ-বাঙালী ভারতীয়দের নিকট রবীন্দ্রসাহিত্য যথাযথভাবে পেঁাছে দিতে হবে। কিন্তু, তখনই বাধা এসে দাঁড়াবে ভাষার ব্যবধান। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ক'রলে দেখা যাবে একমাত্র সংস্কৃত হ'চ্ছে এই কার্যের যোগ্যতম ভাষা। কারণ, সংস্কৃতই হচ্ছে ভারতীয় সকল ভাষার সর্ব-জনীন মিলন মঞ্চ। উত্তর ভারতের সকল ভাষারই উৎস সংস্কৃত। দক্ষিণ ভারতের সকল ভাষারই শব্দ সমূহ ও ভাবরাজিরও সর্বাধিক সংগ্রহভূমি এই সংস্কৃত। সংস্কৃতই ভারতের সর্ব-ভাষাভাষীর শ্রেষ্ঠ সংযোগসূত্র।

কবিগুরুর মর্মবাণী বাংলাভাষায় অনভ্যস্ত ভারতীয়দের কাছে পরিবেশন ক'রতে হ'লে প্রয়োজন রবীন্দ্রসাহিত্যের যথাযথ অনুবাদ। প্রতিটি ভাষারই স্বতন্ত্র ভঙ্গী এবং প্রকৃতির অস্তিত্বের জন্য এক ভাষার সাহিত্য অপর ভাষায় যথাযথ অনুবাদ করা সত্যিই দুরূহ কর্ম, প্রায় হয় না বললেই চলে। তবে মূল এবং অনুবাদের ভাষা দুটির মধ্যে যদি প্রকৃতিগত এবং বিষয়গত কিছুটা

সাদৃশ্য থাকে, তাহ'লে শক্তিশালী লেখকের হাতে অনুবাদ অনেকটা সার্থক হ'য়ে ওঠে। এই প্রকারের ভাষায় যদি অনুবাদ করা যায় তাহ'লে এক ভাষার সাহিত্যের মর্মবাণী অপর ভাষায় সহজে সঞ্চারিত করা চলে। নিখিল ভারতে প্রচলিত ভাষাসমূহের অধিকাংশই সংস্কৃত হ'তে সমুৎপন্ন এবং অবশিষ্টগুলি সংস্কৃতের দ্বারা সম্পৃক্ত। তাই, সকল ভারতীয় ভাষার সংগেই সংস্কৃতের যথেষ্ট সংযোগ অনস্বীকার্য। কিন্তু, বাংলাভাষার সংগে সংস্কৃতের সংযোগ সবার চেয়ে ঘনিষ্ঠ। সংস্কৃত হ'তে পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন বাংলা সংস্কৃতের গতিভঙ্গী এবং প্রকৃতি সর্বাধিকভাবে রক্ষা ক'রে চলেছে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থকে স্বীকার করে নিয়ে সংস্কৃত শব্দসম্পদের অবিকৃত এবং বহুল ব্যবহার বাংলার মতো আর কোনো ভাষায় নেই বললেই চলে। সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং অলংকার শাস্ত্র হ'চ্ছে বাংলা ব্যাকরণ এবং অলংকারের সর্বজনস্বীকৃত সুদৃঢ় ভিত্তি-ভূমি। এই সব নিবিড় যোগাযোগ এবং সাদৃশ্যের জন্য সংস্কৃতে অনুবাদেই বাংলাভাষার ভাবধর্ম সর্বাধিক পরিমাণে রক্ষিত হয়। নিম্নলিখিত সাধু বাংলায় রচিত বিখ্যাত কবিতাংশটি একটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত বাক্যও বলা চলে।—

"অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী
অয়ি নির্মল-সূর্যকরোজ্জ্বল-ধরণী
জনক জননী-জননী।
নীলসিন্ধু-জলধৌত-চরণতল
অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল—
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী।"

কেবলমাত্র শব্দশেষের দীর্ঘ ঈকারটিকে সম্বোধনসূচক হ্রস্ব ইতে পরিণত করলেই সংস্কৃতে পরিণত হয় বাক্যটি এবং তাতে উচ্চারণের বিশেষ কোন বৈষম্যও ঘটেনা। এইসব কারণে যে কোন বাংলাসাহিত্যের সংস্কৃতে অনুবাদ অন্য ভাষায় অনুবাদ অপেক্ষা অনেক বেশী সার্থক। আর, রবীন্দ্রসাহিত্যের তো কথাই নেই।

কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার বিকাশে সংস্কৃত সাহিত্যের অবদান অপরিসীম। রবীন্দ্র-সাহিত্যরূপ কল্পতরুর মর্মমূল প্রোথিত হ'য়ে আছে সংস্কৃত সাহিত্যের রসভূমিতে। মহর্ষি পিতার শিক্ষা এবং দীক্ষায় উপনিষদের ভাবাদর্শে যেমন তাঁর কিশোর চিত্ত উদ্বুদ্ধ হ'য়েছিল ; তেমনি অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীর অকুণ্ঠ সংস্কৃত-সাহিত্যপ্রীতি ও অতুলনীয় সংস্কৃতজ্ঞান তাঁর ওপর বিস্তার ক'রেছিল লক্ষণীয় প্রভাব। তাঁর জীবনব্যাপী কর্ম এবং জ্ঞানসাধনায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সংযোগ এবং প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতে গেলে রচিত হবে বিরাট এক-

গবেষণা-গ্রন্থ। তাই, বিদগ্ধ সমালোচক স্বর্গত মনীষী অতুলচন্দ্র গুপ্তের কথাটিই প্রদীপের মতো তুলে ধরি :—

"রবীন্দ্রনাথের কাব্য ভারতবর্ষের কাব্যসৃষ্টিধারায় সংস্কৃত কাব্যের পরম গৌরবের যুগের সংগেই একমাত্র নিজেকে মেলাতে পারে।...রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কবি। কিন্তু, তিনি কালিদাসের কালেই জন্মেছেন।"

(জয়ন্তী উৎসর্গ—পৃ:-২৫)

ভাবাদর্শের দিক দিয়ে তিনি যেমন বৈদিক ঋষিদের সগোত্র, তেমনি রূপকল্পের দিক দিয়ে সংস্কৃত রোম্যান্টিক এবং ক্লাসিক কবিদের সতীর্থ। উপনিষদের অধ্যাত্মসম্পদ, রামায়ণ-মহাভারতের উদার চরিত্রচিত্রণ, অমরু-ভর্তৃহরি প্রভৃতি কবিকুলের সুকুমার শৃংগারসজ্জা, কাদম্বরী-হর্ষচরিতের প্রসন্ন-গম্ভীর রচনাশৈলী—তথা সামগ্রিক সংস্কৃত-সাহিত্যের উদাত্তমহিমা এবং মধুর সৌকুমার্য তাঁকে চিরকালই মুগ্ধ ক'রেছে। আর কালিদাসের সাক্ষাৎ তো তাঁর প্রতিটি গদ্য-পদ্যের প্রায় প্রতিটি ছত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মেলে।

পাশ্চাত্ত্যের অক্ষম অনুকৃতির পরিবর্তে সংস্কৃতাশ্রিত ভারতীয় সংস্কৃতির সুকৃতিকেই রবীন্দ্রনাথ সমুজ্জ্বল-ভাবে চিত্রিত ক'রেছেন তাঁর কাব্যপরিক্রমার সুদীর্ঘ পথে। তাই, বিদেশে সেদিনের উইণ্টারনিজ্, সিলভ্যাঁ লেভী এবং বর্তমানের নর্মান্ ব্রাউন্ প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ মনীষীরাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যবীণায় সংস্কৃতনিষ্ঠ পরিচিত প্রিয় সুরের আলাপনে মুগ্ধ হ'য়ে রবীন্দ্রসাহিত্যের সমাদরে হ'য়েছেন অগ্রণী। তাঁর সপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে পাশ্চাত্ত্য মনীষী Stein Konow-র শ্রদ্ধাঞ্জলিটি প্রসংগতঃ স্মরণীয়।—

"It was an Indian poet who at last opened the eyes of the West. Through William Jones' translation of Kalidasa's Sakuntala Europe came to know something about India's soul, about the ideals, the aims, and the aspirations of the people of India. And this led to a keen interest in India, her history and civilization.

It was, however, chiefly ancient India which attracted the interest of the west. Kalidas was the poet, and the ancient seers and thinkers were the last and noblest product of India's genius.

Even to day when modern Indians come to play a role in the spiritual development of the West, it is chiefly as interpreters of the wisdom of the past that they were greeted and admired.

Then came the day when another Indian poet conquered

the West. This time it was not one of by gone times, but one who lived and sung in modern India, whose tune was that of the Indian landscape, the Indian river, the Indian forest and the Indian village of today.

Again the West listened and marvelled. *It found the same authentic beauty, the same sublime flight of thought as in Kalidasa's immortal works : the old spirit was still alive.*"
(The Golden Book of Tagore. P-130.)

যে সংস্কৃতাশ্রিত সার্বভৌম ভাবাদর্শের তিনি ছিলেন গুণগ্রাহী ভক্ত, সেই ভাবাদর্শ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রত্যক্ষ ক'রে তিনি হ'য়েছেন শ্রদ্ধাপ্লুত।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর বাংলার সংস্কৃত পণ্ডিতমণ্ডলী কলকাতা সরকারী সংস্কৃত কলেজে রবীন্দ্রনাথকে "কবিসার্বভৌম" উপাধিতে সম্বর্ধিত করেন। তিনি নিজেকে "ভারতীয় কবি" রূপেই পরিচয় দিতেন। তাই, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হ'তে শান্তিনিকেতনে "ডি-লিট্" উপাধি গ্রহণকালে "ভারতীয় কবি" রবীন্দ্রনাথ সমাবর্তন-প্রতিভাষণ দিয়েছিলেন সামগ্রিক ভারতীয় সংস্কৃতির চিরন্তনী ধাত্রী সংস্কৃত ভাষায়। বিখ্যাত সংস্কৃত সাহিত্য-স্রষ্টা বাণভট্টের গদ্যরীতিতে সুরচিত তাঁর সংস্কৃত ভাষণ এবং তাঁরই অনূদিত অনবদ্য ইংরেজী প্রতিরূপটি কৌতূহলী পাঠকের জন্যে উদ্ধৃত করা গেল।—

"ভবন্ত উক্ষতীর্থ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিভুবঃ !"

এষোঽস্মি কশ্চিৎ কবির্ভারতবর্ষস্য। তং মাং সম্ভাবয়ন্তী সা কিল ভবতাং প্রজ্ঞা বিদ্যাভূমির্নূনমাত্মনো মানবধর্মাম্নায়মেব মহান্তমাবিষ্কর্তুমীহতে যস্য খল্বর্থঃ, সাম্প্রতমতিতরাং গম্ভীরশ্চ অনতিপাত্যশ্চ সংবৃত্তঃ। গুর্বাত্তানং মে চিত্তং প্রতিপদ্য অস্য বাচিকং প্রতিপত্তিং চৈতাং প্রহিতাং প্রতীকমিব অনশ্বরং মানবধর্মাত্মনঃ। সভাজয়ামি ভবতোঽত্র শান্তিনিকেতনে। যদ্ এতদ্ অনর্ঘমুপায়নম্ আনীতং ভবদ্ভির্মদর্থং মদ্দেশার্থঞ্চ, চিরং তদ্ অবস্থাস্যতে অস্মদ্ হৃদয়েষু, সম্পৎস্যেতে চ তদ্ ভবতাম্ অস্মাকঞ্চ সাধারণ-সংস্কৃতি-সম্পত্তয় ইতি প্রতিযন্তু ভবন্তঃ।

স খল্বয়ং কালঃ প্রবর্ধতে যন্ত্রাঙ্কঃ। তিরোধত্তে গুণঃ ; প্রসরতি অশিষ্টত্বং নিরঙ্কুশম্। প্রবর্ততে চ পশুচিতা স্পৃহা ভোগে সমুপচীয়মানা ভূতবিদ্যয়া।

অস্মিন্ হি ব্যতিকরে কস্যাপি ভুবনব্যাপিনঃ সম্বন্ধস্য বীজসমুদ্গমোক্তির্নাম কদাচিৎ কবিজনোচিতেব প্রতীয়তে। তথাপি তু সংযম্যতে কালস্তজ্জর্য়ম্নপি নিরন্তরম্। কিঞ্চ যে নাম বয়ম্ অতীত্যাপি এনং জীবামঃ প্রতীমশ্চ যদার্যধর্মশ্চরমার্থসম্পত্তয়ে বর্ধেতৈব নিত্যমিতি তৈরস্মাভিঃ সেয়ং প্রতীতিরবশ্যং প্রত্যগ্রীকরণীয়া।

ক্ষেমং বন্দেদং নিমিত্তং কস্যাপি অনাগতস্য সময়স্যেতি প্রতিগৃহ্যতে ময়া এষা প্রতিপত্তির্বিহিতা উক্ষতীর্থ-বিশ্ববিদ্যালয়েন। নূনং ন জীবিষ্যাম্যহম্ অবলোকয়িতুমেনং প্রতিষ্ঠিতম্।

সভাজনীয়স্তু এষ তস্য সপ্রণয়ঃ সংকেতঃ সঙ্গর ইব দিবসানাং প্রশস্যতরাণামিতি শিবম্॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ

শান্তিনিকেতনম্

শকাব্দাঃ ১৮৬১-৪-২২

কবিগুরুকৃত ইংরেজী অনুবাদ —

Delegates from Oxford University,

In honouring me, an Indian poet, your ancient seat of learning has chosen to express its great tradition of humanity This tradition, today, has acquired a deeper and more pressing significance. I feel proud to accept its message, and the recognition it conveys, as a symbol of the undying spirit of Man. I welcome you here at Santiniketan, and I assure you that this friendly gift that you have brought to me and to my country, will remain in our hearts and bid us stand together for the common cause of civilisation.

In an era of mounting anguish and vanishing worth, when disaster is fast overtaking countries and continents with savagery let loose and brutal thirst for possession augmented by Science, it may sound merely poetic to speak of an emerging principle of world-wide relationship. But Time's violence, however immediately threatening, is circumscribed, and we who live beyond it and dwell also in the larger reality of Time, must renew our faith in the perennial growth of civilisation toward an ultimate purpose.

I accept this recognition from Oxford University as a happy augury of an Age to come, and though I shall not live to see it established, let me welcome this friendly gesture as a promise of better days."

সুতরাং, এইভাবে সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্যের ভাব-সম্পদে সুসমৃদ্ধ বাংলার যে রবীন্দ্রসাহিত্য, অনুবাদের মাধ্যমে তাকে পরিবেশন ক'রতে হ'লে সংস্কৃতই তো হওয়া উচিত উপযুক্ত ভাষা। ভাবাদর্শের ঐক্য এবং রূপকল্পের

সাদৃশ্যের জন্য সংস্কৃতেই সর্বাধিকভাবে রক্ষিত হবে মূলের ভাবসম্পদ্। শব্দ এবং অলংকার-নির্বাচনে তিনি সংস্কৃত রচনারীতিকেই অনেকাংশে অনুসরণ ক'রেছেন। তাঁর অসংখ্য অনবদ্য উপমাগুলি কালিদাসের কথাই মনে করিয়ে দেয়। "উপমা রবীন্দ্রনাথস্য"ও সার্থকভাবে বলা চলে।

রবীন্দ্রসাহিত্যের সংস্কৃতানুবাদের আর একটি প্রয়োজন হচ্ছে সর্বভারতীয় ঐক্যবিধান ও ভাবগত সংহতিসাধন। বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই দেবভাষাই হল। সুপ্রাচীন কাল হ'তেই সামগ্রিক ভারতীয় সংস্কৃতির একমাত্র ধাত্রী। ভারতীয় প্রজ্ঞার বিচিত্র প্রকাশ যুগে যুগে এই ভাষাকেই আশ্রয় ক'রে নব নব রূপে লীলায়িত হয়েছে। প্রসংগতঃ মনে পড়ে বিখ্যাত ফরাসী মনীষী ডাঃ লুই রেণোর কথাগুলি।—

"There is no living culture without a living tradition. If India is beloved and cherished among the elite of the West, it is on account of her traditional culture. And this culture is embedded above all in the treasures of Sanskrit. Sanskrit and India are inseparably connected inspite of all the transitory harangues of the politicians. (Dr. Louis Renou – Paris University.)

আর একজন প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ মহামনীষী ম্যাক্সমুলারের বহু উক্তিও এই প্রসঙ্গে স্মরণ না করে পারা যায় না।

এক অখণ্ড সংস্কৃতিতে বিধৃত ভারতের সাংস্কৃতিক ভাষা হ'চ্ছে সংস্কৃত। তাই বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রতিটি ভারতীয়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংস্কৃত-ভাষাশ্রিত। এইভাবে সংস্কৃতভাষার সংগে যে কোন ভারতীয়ের প্রত্যক্ষ সংযোগ অনস্বীকার্য। অন্যান্য প্রচলিত ভারতীয় ভাষাগুলি গোষ্ঠীবিশেষে কিংবা প্রদেশবিশেষে সীমাবদ্ধ ব'লে সর্বভারতীয় আবেদেন তাদের নেই। বরঞ্চ অনেক সময় একের সংগে অপরের চলে এক অশুভ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ফলে গোষ্ঠী-বিশেষের কিংবা প্রদেশবিশেষের ভাষাকে সর্বভারতীয় সরকারী ভাষারূপে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত করায় সেই বিশেষ ভাষা-ব্যতিরিক্ত অন্য ভাষাভাষী জনগণের মনে জেগে ওঠে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বঞ্চনার আশংকা। তাতে শংকিত হয়ে সংবিধান-প্রতিশ্রুত সমানাধিকার রক্ষার প্রয়োজনে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণ ভাষা আন্দোলনে মেতে ওঠেন। বিভিন্ন প্রদেশে তারই নগ্নরূপ বহুভাবে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তার কারণ সংবিধান-স্বীকৃত ভাষা-সমূহের মধ্যে একমাত্র সংস্কৃত ব্যতীত আর কোনো ভাষারই নেই সর্বভারতীয় আবেদন। তাই সংস্কৃত ব্যতিরিক্ত বাংলা, অসমীয়া, তামিলাদি যে কোন গোষ্ঠীগত ভাষাকে সর্বভারতীয় সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ ক'রলে এই সমস্যা কখনোই তিরোহিত হবে না। সুদূর অতীত কাল হ'তেই বহু ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে এবং

মানবগোষ্ঠীতে বিভক্ত সমগ্র ভারত এক এই সংস্কৃত ভাষার দ্বারাই ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল। ভারতে বহু ভাষা, বহু মত, বহু ব্যবধানের মধ্যে সুমহৎ মিলনের কল্যাণ-রাগিণী সংস্কৃত ভাষাই বাজিয়ে এসেছে চিরকাল ধ'রে। এর মূল কারণ হচ্ছে যে একমাত্র সংস্কৃত ভাষারই র'য়েছে সর্বভারতীয় আবেদন। একমাত্র সংস্কৃতাশ্রিত সংস্কৃতির জন্যেই কন্যাকুমারীর অধিবাসীর সংগে কাশ্মীরের অধিবাসীর, পাঞ্জাবের অধিবাসীর সঙ্গে আসামের অধিবাসীর আহারে, পোষাকে, ভাষায় অসংখ্য বৈচিত্র্য সত্ত্বেও রয়েছে একজাতীয়তাবোধ। তাই, প্রাচীনকাল হ'তেই সংস্কৃত ভারতে আন্তঃ-রাজ্যভাষারূপে ব্যবহৃত হ'ত। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে এইটিই ছিল যোগসূত্র। সংস্কৃতের প্রতি কোনো ভারতীয়ের বিদ্বেষ নেই, বরঞ্চ র'য়েছে শ্রদ্ধাবোধ। স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রসংগে ব'লেছেন—

"আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের অবস্থা উন্নত করিবার একমাত্র উপায় সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করা। সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য থাকিলেই ভারতে সম্মানভাজন হওয়া যায়। সংস্কৃতভাষায় জ্ঞান লাভ হইলে কেহই তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহসী হইবে না।" (ভারতে বিবেকান্দ— পৃঃ—৩২২, ৩৩৫)

তাই, সুদূর প্রাচীনকাল হ'তেআজ পর্যন্ত যে সকল মনীষী নিখিল ভারতের সর্বজনের মধ্যে ভাবধারা প্রচারে ব্রতী হ'য়েছিলেন, তাঁরা প্রাদেশিক কিংবা গোষ্ঠিগত ভাষাকে পরিত্যাগ ক'রে গ্রহণ ক'রেছিলেন সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক ভাষা সংস্কৃতকে। কেরলের শংকরাচার্য যখন সমগ্র ভারতে সনাতনধর্মের দিগ্বিজয়ে বহির্গত হ'য়েছিলেন, নিখিল ভারতের সকল প্রান্তেই তাঁর শাণিত যুক্তি এবং বিস্ময়কর বাগ্‌বিভূতি বিস্তার করে নূতন ধর্মাদর্শ প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন, তখন সংস্কৃতই ছিল তাঁর অবলম্বিত ভাষা। গৌড়বংগের প্রাণপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁর উত্তরাপথ এবং দাক্ষিণাত্য পরিক্রমায় ভাবাদর্শ প্রচার ক'রেছিলেন সুরভারতীর স্রোতোধারায়। বাংলার নবজাগরণের নায়ক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্রাদি প্রদেশে সংস্কৃতেই ক'রতেন ব্রাহ্মধর্মের প্রচার। এই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী আর্যসমাজের প্রচারার্থে যখন সারা ভারত পরিক্রমা করেন, তখন সংস্কৃত ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় তিনি ভাষণাদি দিতেন না। আরো স্মরণীয়, বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম স্ব স্ব উদ্ভবস্থানের সীমা অতিক্রম ক'রে যখন সমগ্র ভারতে প্রসারিত হ'ল, তখন পালি এবং প্রাকৃতের পরিবর্তে তার বাহন ছিল সনাতন সংস্কৃতভাষা। ফলে বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শন ও উচ্চতর সাহিত্যের গ্রন্থাদি সংস্কৃতেই রচিত হ'য়েছিল। তার জন্যে তাতে এসেছিল সর্বভারতীয় আবেদন। বর্তমান লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছে, আর্যাবর্ত এবং দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র এখনো আপামর জনসাধারণ সংস্কৃত ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম মোটামুটি বেশ বুঝতে পারে, যা অন্য

কোন ভারতীয় ভাষার পক্ষে সম্ভব নয়। বাংলা ভাষায় রচিত প্রাপ্ত প্রাচীনতম গ্রন্থ "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের" টীকা হ'চ্ছে সংস্কৃত ভাষায় রচিত। "চৈতন্যচরিতামৃতের"ও প্রাচীনতম টীকা সংস্কৃতে রচিত। অধিক প্রচলিত ভাষাতেই টীকা টিপ্পনি রচিত হওয়া স্বাভাবিক। পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলিকে সর্বভারতীয় মনের কাছে সমাদৃত করার জন্যেই তাদের টীকা রচিত হ'য়েছিল সর্বভারতীয় ভাষা সংস্কৃতে।

এইভাবে সকল দিক বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লে হৃদয়ংগম করা যায় যে সংস্কৃত ভাষার আধারে রবীন্দ্রসাহিত্যকে পরিবেশন ক'র্‌লে তা সকল ভাষাভাষী ভারতীয়ের কাছেই সহজে সমাদৃত হবে। সংস্কৃতভাষার মাধ্যমেই সর্ব ভারতীয় মনের দ্বারে রবীন্দ্রসাহিত্যকে সহজে পৌঁছে দেওয়া যাবে।

একদিকে রবীন্দ্রসাহিত্যের সংস্কৃতমূলক ভাবাদর্শ এবং রূপকল্পের জন্য, অন্যদিকে সংস্কৃতভাষার সর্ব-ভারতীয় আবেদনের জন্য রবীন্দ্রসাহিত্যের সার্থক সংস্কৃতানুবাদ নিখিল ভারতের সকল ভাষাভাষী জনচিত্তকেই সন্তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট ক'র্‌বে। আর তাতে ভারতের সকল ভাষাভাষী জনগণ এক সূত্রে প'ড়বে বাঁধা।

এই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ পরীক্ষা নিরীক্ষার অভিজ্ঞতাও প্রসংগক্রমে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মনীষী অতুলচন্দ্র গুপ্তের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বিদগ্ধ রসবেত্তা জননায়ক সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নিগ্ধ উপদেশে বর্তমান লেখক রবীন্দ্রসাহিত্যের সংস্কৃতানুবাদ এবং তার প্রচারে ব্রতী হয়েছিল। ক'ল্‌কাতার নাগরিক সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বহুদিন ব্যাপী বিরাট উৎসবের দুটো দিন নির্দিষ্ট ছিল সংস্কৃতে রবীন্দ্রনাটক এবং সংগীতানুষ্ঠানের জন্যে। তাতে পণ্ডিত কবিশেখর বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ কাব্যতীর্থ অনূদিত রবীন্দ্রসংগীত, ডাঃ বিমলকৃষ্ণ মতিলাল অনূদিত "রথের রশির" সংস্কৃতরূপ "রথরজ্জুঃ" এবং বর্তমান লেখক-অনূদিত "ডাকঘরের" সংস্কৃত রূপ "বার্তাগৃহম্" বাংলার এবং বহির্বংগের অগণিত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে রসাপ্লুত করে। সংস্কৃতে অনূদিত অনবদ্য রবীন্দ্র সংগীতগুলি বাংলার মূল সুরেই গেয়েছিলেন প্রখ্যাত পণ্ডিত এবং সংগীতসাধক ডক্টর শ্রীগোবিন্দ-গোপাল মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর সম্প্রদায়। ভাষান্তরেও রবীন্দ্রসংগীতের মূল সুর সংরক্ষণ এক সংস্কৃত ছাড়া আর কোনো ভাষায় সম্ভব নয়। ক'ল্‌কাতার আকাশ বাণী কেন্দ্র হ'তে যখন এই "বার্তাগৃহম্" 'মুক্তধারা' ও "রথরজ্জুঃ" পুনরভিনীত হয়, তখন সর্বভারতীয় রসিক পণ্ডিতমণ্ডলী সানন্দে এই প্রয়াসকে অভিনন্দিত করেন। ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত "অখিল ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য সম্মেলনের' প্রথম দিনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীবলবন্ত নাগেশ দাতারের সভাপতিত্বে সারা ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলীর উপস্থিতিতে এই "বার্তাগৃহম্" আবার অভিনীত হয়। তাতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমাগত বিভিন্নভাষী পণ্ডিতমণ্ডলী সংস্কৃতের

মাধ্যমে রবীন্দ্রনাটকের রসমাধুরী আস্বাদন ক'রে বিমুগ্ধ হন। আবাঙালী এই বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ অনেকেই হিন্দী, তামিল, অসমিয়া এবং ইংরেজীর মাধ্যমে রবীন্দ্রসাহিত্য আস্বাদন ক'রেছেন। কিন্তু, সংস্কৃতানুবাদই তাঁদের কাছে সর্বাধিকভাবে সমাদৃত হ'য়েছে। তার কারণ পূর্বেই বিশদভাবে উল্লিখিত হ'য়েছে। তখনকার ইংরেজী, বাংলা এবং সংস্কৃত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এই নাটকের অনুবাদে ব্যবহৃত সংস্কৃতভাষার অজস্র প্রশংসা প্রকাশিত হ'য়েছিল। এই "বাতায়নগৃহম্" এবং "মুক্তধারা" নাটক দুটি ভারত সরকার সাহিত্য আকাদেমী হ'তে Sanskrit Tagore Memorial Volume এর অংশরূপে প্রকাশ ক'রেছেন।

মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য এবং ডক্টর গোপিকামোহন ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় "কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা" এবং মহাচার্য ডক্টর ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "মঞ্জুষা" নামক বাংলার বিখ্যাত সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা দুটি রবীন্দ্রনাথের বহু গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, গান এবং নাটকের সার্থক সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ ক'রে রবীন্দ্রসাহিত্য প্রচারে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। অধ্যক্ষ ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী এবং অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর সক্রিয় সহযোগিতায় প্রকাশিত "সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকার" বিশেষ "রবীন্দ্রসংখ্যাটি" রবীন্দ্ররচনার সংস্কৃতানুবাদের এক অমূল্য সংকলন। বর্তমান লেখকের সংস্কৃতে অনূদিত "মুক্তধারা" নাটকটি এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে গ্রন্থাকারে রাষ্ট্রপতি আচার্য ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ভূমিকা সম্বলিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ভারতে ও ভারতের বাইরে সহস্রাধিক রজনী অভিনীত হয়ে বিরাট সাড়া জাগিয়েছিল। রবীন্দ্র-রচনার সংস্কৃতানুবাদে প্রথম কাজ করেন স্বয়ং কবিগুরুর তত্ত্বাবধানে পণ্ডিত অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ "গীতাঞ্জলির" সংস্কৃতানুবাদের মাধ্যমে। পরবর্তী কালে এই কাজে মঃ মঃ কালীপদ তর্কাচার্য, ডঃ ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অশোকনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিতরাজ ডঃ শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, পণ্ডিতপ্রবর বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, ফটিকলাল দাশগুপ্ত, ডঃ সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, ডঃ কালীকুমার দত্ত, ইন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, ডঃ দীপক ঘোষ এবং বর্তমান লেখক প্রভৃতি বাঙালীরা যেমন লেখনী ধারণ ক'রেছেন, তেমনি ডঃ বেঙ্কটেশ রাঘবন্, ডঃ চিন্তামন দ্বারকানাথ দেশমুখ প্রভৃতি অবাঙালী মনীষীরাও এই বিষয়ে অগ্রণী হ'য়েছিলেন। আজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই নিয়ে যথেষ্ট কাজ আরম্ভ হ'য়ে গেছে এবং সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত ভারতের বিভিন্ন সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকায় রবীন্দ্ররচনার বহু সংস্কৃতানুবাদ প্রকাশিত হ'য়ে চলেছে। সাহিত্য আকাদেমীর সংস্কৃত-মুখপত্র "সংস্কৃত প্রতিভার" প্রয়াসও এই বিষয়ে অভিনন্দনীয়। রসিক সহৃদয়দের জন্যে কিছু কিছু মূল ও সংস্কৃতানুবাদ উদ্ধৃত করা গেল।

(ক) "আমার মাথা নত ক'রে দাও হে"

অবনময় তে চরণজাসি মম মস্তকম্
নয়নসলিলচয়ৈর্মজ্জয় গর্ব্বম্ ।
বিধাতুমাত্ম-গৌরবদানম্
করোমি চাত্মনোঽপমানম্
যাচে তে চরমশান্তিম্
প্রাণেষু তব পরমকান্তিম্
আবৃত্য মাম্ অধিতিষ্ঠ চিত্তকমলম্ ॥
(পণ্ডিত ৺বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ)

(খ) "অয়ি ভুবনমোহিনী"

অয়ি ভুবন-মনোমোহিনি
অয়ি নির্মল সূর্য করোজ্জ্বল-ধরণি
জনক-জননী-জননি ।
প্রথম-প্রভাতোদয়স্তব গগনে
প্রথম-সামরবস্তব তপোবনে
প্রথম-প্রচারিতা তব বনভবনে
জ্ঞান ধর্ম-চারু-কাহিনী ॥
চির-কল্যাণময়ি ত্বং হি ধন্যা
দেশ বিদেশান্নদান পুণ্যা
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনি ॥" (ঐ)

(গ) "সামান্য ক্ষতি—বহে মাঘ মাসে শীতের বাতাস
স্বচ্ছ সলিলা বরুণা ।
পুরী হ'তে দূরে গ্রামে নির্জনে
শিলাময় ঘাট চম্পক বনে
স্নানে চলেছেন শত সখীসনে
কাশীর মহিষী করুণা ।"

শীতেঽনিলে বহতি মাঘদিনে কদাচিৎ
কাশীনৃপস্য মহিষী করুণাভিধানা ।
প্রাপ্তা সখীশতবৃতা বরুণামুষায়াং
স্নানায় পুণ্যসলিলাং কৃতচারুতীর্থাম্ ॥
('অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ')

(ঘ) মুক্তধারা—

"বিভূতি—অভিশাপ ! দেখো, উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন রাজার আদেশে চণ্ডপত্তনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো বছরের উপর বয়সের

ছেলেকে আমরা আনিয়ে নিয়েছি। তারাতো অনেকেই ফেরেনি। সেখানকার কত মায়ের অভিশাপের উপর আমার যন্ত্র জয়ী হয়েছে। দৈবশক্তির সংগে যার লড়াই, মানুষের অভিশাপকে সে গ্রাহ্য করে?

দূত - যুবরাজ বলছেন, কীর্তি গড়ে তোলবার গৌরব তো লাভ হয়েছেই, এখন কীর্তি নিজে ভাঙবার যে আরো বড়ো গৌরব তাই লাভ করো।

অনুবাদ—

বিভূতি— অভিশাপঃ? শৃণু তাবৎ, উত্তরকূটে যদা শ্রমিকাণাম্ অভাবঃ সঞ্জাতস্তদা রাজাদেশেন চণ্ডপত্তনস্য প্রতিগৃহাদেব অষ্টাদশোর্ধ্ব-বয়স্কা-স্তরুণাঃ সমানীতাঃ। তেষাং তু বহব এব ন প্রত্যাগতাঃ। তত্রত্যানাং কতি কতি মাতৃণামভিশাপং ব্যর্থীকৃত্য যন্ত্রং মে বিজয়তে। দৈবশক্ত্যা যো যুধ্যতে, মনুষ্যাভিশাপাৎ কিং স বিভেতি,

দূতঃ—যুবরাজেনোক্তম্—কীর্তিপ্রতিষ্ঠায়াঃ গৌরবন্তু সংলব্ধমেব। অধুনা আত্মনঃ কীর্তিভঙ্গস্য যদধিকতরং গৌরবং তদেব অধিকুরুষ্ব।

(বর্তমান লেখক)

এইভাবে তথ্য এবং তত্ত্বের দিক দিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে সর্বভারতীয় ঐক্যের জন্যে রবীন্দ্ররচনার সংস্কৃতে অনুবাদ একান্ত প্রয়োজন বলে মনে হয়। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি সকল ভারতীয়ের মনেই রয়েছে যথেষ্ট আগ্রহ। সংস্কৃতের মাধ্যমে এই সাহিত্য সকলের নিকট সহজগ্রাহ্য হবে। ফলে, রবীন্দ্রসাহিত্যের সমন্বয় এবং সংস্কৃত ভাষার ঐক্যবিধায়িনী শক্তির সম্মিলিত প্রভাবে ভারতের সকল অধিবাসীর হৃদয়তন্ত্রী একই সুরে অনুরণিত হবে। ভারতের নিজস্ব জাতীয়তার ভিত্তিতে সর্বভারতীয় ঐক্যবোধ জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। ক্রান্তদর্শী মহাকবির অমোঘ আহ্বান গণমানসে সার্থক হ'য়ে উঠ্‌বে।

"হেথা একদিন বিরাম বিহীন মহা ওঙ্কার ধ্বনি
হৃদয়-তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোলো আজি দ্বার—
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।"

ভারতপথিক ম্যাক্সমূলার

লোকোত্তর প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী ফ্রীড্রিখ ম্যাক্সমূল্যারের (Friedrich Maxmuller) পঞ্চাশদুত্তর-শততম জন্মজয়ন্তী প্রতিটি আত্মসচেতন ভারতীয়ের অবশ্য পালনীয় ছিল। সুদূরে অতীতে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর অতীতের প্রাশিয়া বর্তমানের পূর্ব জার্মানীর দেশাউ শহরে জন্মগ্রহণ ক'রে, ভৌগোলিক ভারতে না এসেও, তিনি মানসলোকে চিরন্তন ভারতপথিক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৃটিশ শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ, হৃতাদর এবং হৃতমান ভারতের সাংস্কৃতিক ভাষা সংস্কৃতকে শিরোধারণ ক'রে তার পঠন, পাঠন এবং প্রচারণে জীবন উৎসর্গ ক'রেছিলেন বলদৃপ্ত পশ্চিমের এই মনস্বী জ্ঞানব্রতী। তাঁর যৌবনের ভাষাপ্রেম কালক্রমে সংস্কৃতপ্রেমে, সংস্কৃতপ্রেম ভারতপ্রেমে এবং ভারতপ্রেম সার্বভৌম সনাতন ধর্মপ্রেমে রূপান্তরিত হ'য়ে এক অভিনব পরিণতি লাভ করে। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক পরাধীনতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে সাংস্কৃতিক পরাধীনতার (Cultural slavery) দুর্বলতায় হীনম্মন্য ভারত-সন্তানগণকে আত্মচেতনায় এবং বিশ্ববাসীকে আন্তর্জাতিক মৈত্রীভাবনায় উদ্বুদ্ধ করার সাধনায় তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রপথিক। আত্ম-বিস্মৃত জাতির নবজাগরণে এই বিদেশী মনীষীর অতুলনীয় এবং অপরিমিত অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

ম্যাক্সমূল্যারের জন্ম অভিজাত সংস্কৃতিশীলিত পরিবারে। পিতামহ ছিলেন মহাকবি গ্যেটের বিশিষ্ট বন্ধু এবং প্রখ্যাত শিক্ষাসংস্কারক। পিতা উইলহেল্ম্ ছিলেন পেশায় গ্রন্থাগারিক এবং নেশায় কবি। মাতা ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর কন্যা। মাত্র চার বৎসর বয়সে ম্যাক্সমূল্যার পিতাকে হারিয়ে আদর্শনিষ্ঠা ব্যক্তিত্বসম্পন্না বিধবা মাতার তত্ত্বাবধানে মানুষ হ'তে থাকেন। আনহাল্টের যে ডিউকের গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁরই প্রদত্ত সামান্য বৃত্তির উপর নির্ভর ক'রে দুঃখে কষ্টে মাতা এবং পুত্রের জীবন নির্বাহ হ'তে থাকে। অকালে পিতাকে হারিয়ে ম্যাক্সমূল্যার তাঁর ধন কিছুই পেলেন না বটে, কিন্তু পেলেন পিতার মনটি। কালিদাসের ভাষায় 'প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ'-এর সার্থকতা দেখি তাঁর জীবনে। পিতার সারস্বত-প্রীতি পুত্রের জীবনে মহতী সাধনায় পরিণতি লাভ ক'রে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো। কৈশোরেই সুকণ্ঠ গায়করূপে খ্যাতিলাভ করায় তিনি ভাবছিলেন ভবিষ্যতে সঙ্গীতজ্ঞের বৃত্তিকেই জীবিকারূপে গ্রহণ করবেন। এদিকে অধ্যয়নেও ছিল তাঁর যথেষ্ট মেধা। এক হিতৈষী সংগীতজ্ঞ তাঁকে সংগীতের পথ থেকে নিবৃত্ত ক'রে জীবনের মহত্তর পরিণতির জন্য জ্ঞানের পথে পরিচালিত করেন। তখন স্থানীয় বিদ্যালয়ে তিনি মনোযোগের সহিত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হলেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে

লাইপজিগ্ হতে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লাইপজিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি আবার উচ্চতর শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হলেন। শৈশবেই বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা বিষয়ে তাঁর বিশেষ প্রবণতা ছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন প্রতীচ্য ভাষা সমূহের শিক্ষায় অগ্রসর হলেন। জার্মান জাতির জ্ঞানস্পৃহার জন্য সে যুগেই লাইপজিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল। সেই সুদূর অতীতেই সংস্কৃত শিক্ষাও প্রবর্তিত হয়েছিল এই সারস্বত কেন্দ্রে। স্মরণ করা প্রয়োজন ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে সদ্যঃপ্রবর্তিত বৃটিশ শাসনের যুগে ভারতে বিদেশী শাসক এবং শাসিত ভারতীয় উভয়েরই ভারতের সাংস্কৃতিক ভাষা সংস্কৃতের প্রতি কী নিদারুণ অনীহা। উইলসন্, জোন্স্ প্রভৃতি সাধু জ্ঞানতপস্বীর কথা স্বতন্ত্র। মেকলে প্রমুখই ছিলেন শাসকশক্তির প্রতিভূ। অথচ গুণী জার্মান জাতি দূরের পরাধীন দেশের এই সংস্কৃত ভাষার প্রতি কী অপরিসীম শ্রদ্ধা পোষণ ক'রে চলেছে, যার ফলে সেই দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন প্রবর্তিত হয়েছে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা। যা হোক্, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক হারমান্ ব্রজ্ হাউস্ অন্যান্য ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতও বিশেষভাবে শেখার জন্য ম্যাক্স্‌মুল্যারকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করলেন। ফলে এই তরুণ বিদ্যার্থী সংস্কৃত শিক্ষায় আত্মনিয়োগ ক'রে অভূতপূর্ব তৃপ্তিলাভ করলেন। সার্থক হ'ল ইংরেজ মনীষী স্যার্ হোরেস্ হেম্যান্ উইলসন্ কর্তৃক (১৭৮৬-১৮৬০) সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালংকারকে পত্রাক্ষরে লেখা শ্লোকটি—

> 'অমৃতং মধুরং সম্যক্ সংস্কৃতং হি ততোধিকম্।
> দেবভোগ্যমিদং যস্মাদ্ দেবভাষেতি কথ্যতে ॥ ১
> ন জানে বিদ্যতে কিং তন্মাধুর্যমত্র সংস্কৃতে।
> সর্বদৈব সমুন্মত্তা যেন বৈদেশিকা বয়ম্ ॥২
> যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাদ্ যাবদ্ বিন্ধ্য-হিমাচলৌ।
> যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্ ॥৩

কালক্রমে জার্মান তরুণ ডুবে গেলেন সংস্কৃতের অধ্যয়নে। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি 'ডক্টরেট্' ডিগ্রিলাভ করলেন ম্যাক্স্‌মুল্যার। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে লাইপ্‌জিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ্. ডি. ডিগ্রি লাভ করার পরে ১৮৪৪-এই তিনি 'হিতোপদেশের' জার্মান ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেন। জ্ঞান সাধনার প্রবল অভিলাষ অনেকের 'ডক্টরেট্' উপাধি প্রাপ্তিতেই নির্বাণ লাভ করে। 'জ্ঞান-পণ্য-বণিক্' এই মূলধন নিয়েই সারা জীবন সন্তৃপ্ত থাক্‌তে পারেন। কিন্তু যথার্থ জ্ঞান-সাধক এতে কখনো নিবৃত্ত হন্ না। তিনি যে করেন 'চরৈবেতির' সাধনা। তাই, মধুলুব্ধ ভ্রমর যেমন পুষ্প থেকে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করে, তেমনি সংস্কৃতলুব্ধ এই তরুণও গুরুর পর গুরুর অন্বেষণে করলেন আত্মনিয়োগ। সরস্বতীর সরস্তীর্থের তিনি যে নৈষ্ঠিক পরিব্রাজক॥

আরো ভালো ক'রে সংস্কৃত শিক্ষার অসীম আকাঙ্ক্ষায় ১৮৪৪-এ তিনি চলে এলেন বার্লিনে। সেখানে মনীষী ফ্রানৎস বোপ্ (Franz Bopp, ১৭৯১-১৮৬৭)-এর কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব নিয়ে গভীর অধ্যয়নে হলেন নিমগ্ন। সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত দার্শনিক শিলিং (F. W. Schelling, ১৭৭৫-১৮৫৪)-এর কাছে দর্শনের পাঠও নিতে থাকেন। পরবর্তী জীবনে বিদ্যাচর্চার যে দুটি বিশেষ ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের তিনি যে দিশারী আচার্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তার ভিত্তি তৈরি হয়েছিল এই সময়ে। এক বৎসর পরে তিনি প্যারিসে এসে মহাপ্রাজ্ঞ ইউজীন্ বুর্ণুফ্ (১৮০১-১৮৫২)-এর কাছে সংস্কৃতের আরো বিভিন্ন দিক, বিশেষতঃ বেদ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। বুর্ণুফ্ ছিলেন সে যুগে সমগ্র প্রতীচ্যখণ্ডে বেদের কুলপতিকল্প আচার্য। বুর্ণুফের চরিত্রমাধুর্যে এবং অধ্যাপনা-নৈপুণ্যে তিনি বিশেষ প্রভাবিত হন। উপযুক্ত আধার বিবেচনায় বেদবিদ্যা-ভূয়িষ্ঠ বুর্ণুফ এই 'ছায়েবানুগত' অক্লান্তকর্মা অন্তেবাসীকে বেদ-প্রচারে উদ্বুদ্ধ করেন। বুর্ণুফের আবেগোজ্জ্বল অধ্যাপনায় এই তরুণ বিদ্যার্থীর সম্মুখে বৈদিক সাহিত্যের স্বর্ণদ্বার অনর্গলিত হ'ল। দীপ থেকে দীপান্তরের ন্যায় বৈদিক ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান শিষ্য ম্যাক্স্‌মুল্যারের মধ্যে সঞ্চারিত হ'ল।

ভারতবর্ষ হতে বহু শ্রমে এবং অর্থে তিনি অনেক সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। সেই সব পুঁথি জ্ঞানভিক্ষু এই শিষ্যকে তিনি সমর্পণ করেন। ভারতীয় দর্শন ও স্মৃতিশাস্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন, আর সায়ণভাষ্যসহ ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি প্রচার করার জন্য শিষ্য ম্যাক্স্‌মুল্যারকে অনুরোধও করলেন তিনি। গুরুনিষ্ঠ শিষ্য প্যারিস এবং বার্লিনে ঋগ্বেদ ও সায়ণভাষ্যের যত পুঁথি পেয়েছিলেন সবগুলি নকল করতে আরম্ভ করলেন। প্রথমতঃ এই সব পুঁথি প্রতীচ্যে খুবই দুর্লভ এবং যাও পাওয়া যায় সেগুলি ক্রয় করার মতো আর্থিক সামর্থ্যও তাঁর নেই। তাই এইভাবে স্বহস্তে প্রতিলিপি করা ছাড়া উপায় নেই। অন্যান্য পণ্ডিতদের জন্যও পুঁথি নকল করে দিয়ে বিনিময়ে যে যৎসামান্য অর্থ উপার্জন করতেন তার দ্বারাই কায়ক্লেশে তাঁর গ্রাসাচ্ছাদন হত। ওখানকার কাজ শেষ করে তিনি লণ্ডনে চলে এলেন 'ইণ্ডিয়া অফিসের' গ্রন্থাগারের বিপুল পুঁথি-ভাণ্ডার ব্যবহার করতে। লণ্ডন, বার্লিন, প্যারিসস্থ ও স্বসংগৃহীত সকল পুঁথি মিলিয়ে সায়ণভাষ্যসহ ঋগ্বেদের পাণ্ডুলিপি তিনি তৈরি করলেন। কিন্তু প্রকাশের অর্থ কোথায় ধনরিক্ত বিদ্যাব্যসনীর? সংস্কৃত লৌকিক প্রবাদে বলে—'নিরাশ্রয়াঃ ন তিষ্ঠন্তি পণ্ডিতাঃ বণিতাঃ লতাঃ।' আশ্রয়ের আশায় দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন তিনি। এই সময়ে ইংলণ্ডে প্রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ছিলেন ব্যারণ বুন্সেন্ (Baron Bunsen)। তিনি ছিলেন প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগী এবং পণ্ডিতদের গুণগ্রাহী। স্বদেশীয় তরুণ ম্যাক্স্‌মুল্যারের অদম্য জ্ঞান-

স্পৃহায় তিনি মুগ্ধ হলেন, সাহায্যে এগিয়ে এলেন। এদিকে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ মনীষী স্যার হোরেস্ হেম্যান্ উইলসন্ তখন ভারত হতে ফিরে লণ্ডনে বাস করছেন। বয়সে ৩৭ বৎসরের ছোট এই বিদেশী তরুণ সারস্বতের অক্লান্ত গবেষণা তাঁকে আকৃষ্ট করল। ঋগ্বেদের প্রকাশে তিনিও উৎসাহী হয়ে উঠলেন। বুনসেন এবং উইলসনের চেষ্টায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ঋগ্বেদ প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণে রাজী হ'ল। এই ব্যবসায়ী কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল এই গ্রন্থপ্রকাশের দ্বারাও তাঁরা বেশ মুনাফা করবেন এবং খৃষ্টধর্ম প্রচারেও করবেন সহায়তা। সেই উদ্দেশ্য সফলও হয়েছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঋগ্বেদের প্রথম সংস্করণের পাঁচশত কপি বিক্রয় করেই পঁচাত্তর হাজার টাকা লাভ করেন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ধর্মীয় আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদ মুদ্রিত হলে তার ত্রুটিগুলি দেখিয়ে ভারতে খৃীষ্টধর্ম প্রচারের সুবিধা হবে। তবে, ম্যাক্সমুল্যার, উইলসন্ প্রমুখ মনীষীর মনের কোণে এই উভয় উদ্দেশ্যের কোনোটিই ছিল না। নিছক সারস্বতপ্রীতি এবং সত্যপ্রচারই তাঁদের এইপথে প্রবৃদ্ধ করে। এই বিরাট গ্রন্থের জন্য মুদ্রণালয়ের সন্ধানে তখন তাঁরা তৎপর হলেন। একমাত্র অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণশালাকেই দেখা গেল এই কার্যের যোগ্য। তাই ১৮৪৮-এর মে মাসে ম্যাক্সমুল্যার অক্সফোর্ডে চলে এলেন তারই ব্যবস্থাপনার জন্য। তাঁর জীবনরঙ্গমঞ্চে এলো এবার খ্যাতি এবং সাফল্যের সমারোহ। এদিকে চলতে লাগলো ঋগ্বেদের মুদ্রণ। অন্যদিকে এতদিন ধরে বেকার এই জ্ঞান-তপস্বীর জীবনে এসে গেলো কর্মপ্রাপ্তির শুভলগ্ন। ১৮৫০-এ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েই আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাবিভাগে সহকারী অধ্যাপকের তথা Deputy Taylorian Professor of Modern Languages পদে তিনি নিযুক্ত হলেন। কালিদাসের ভাষায় 'ন খলু কশ্চিদ্ অবিষয়ো নাম ধীমতাম্'-এর সার্থকতা দেখা গেল সংস্কৃত পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের আধুনিক ইউরোপীয় ভাষার অধ্যাপক পদ প্রাপ্তিতে। সংস্কৃতের জ্ঞানকে ভিত্তি রূপে গ্রহণ করলে অন্য সকল ভাষায় সহজেই ব্যুৎপত্তিলাভ করা যে যায়, তার মূর্তিমান সাক্ষী ম্যাক্সমুল্যার। ১৮৫৬-তে এই বিভাগেই তিনি প্রধান অধ্যাপকরূপে Professor-এর পদে উন্নীত হলেন। এতদিনে স্থায়ী কর্মজীবনে প্রবেশ করে তাঁর গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের সময় হল। বিদ্যাব্রতী তরুণ ম্যাক্সমুল্যার অক্ষরে অক্ষরে ব্রহ্মচর্য আশ্রমের রীতি প্রতিপালন করেছেন দীর্ঘদিন ধরে। জ্ঞান-সাধনার সময়ে সকল প্রলোভন এবং চাঞ্চল্যকে দমন করে স্থিতধী তরুণ স্মরণে রেখে ছিলেন সংস্কৃত সদুক্তি—

'অসমাপ্তজিগীষস্য স্ত্রীচিন্তা কা মনস্বিনঃ।
অনাক্রম্য জগৎ কৃৎস্নং ন সন্ধ্যাং ভজতে রবিঃ॥'

১৮৫৯-এ জর্জিনা এ্যাডিলাড্ নাম্নী অভিজাতকুলোৎপন্না সুশীলা এক ইংরেজদুহিতার পাণিগ্রহণ করে চার্লস্ কিংসলি প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ইংরেজের

সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে তিনি আবদ্ধ হলেন। এই সাধুদম্পতী ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহীর জীবনই আজীবন পালন করে গেছেন। অনুসরণ করেছেন ঋষিনির্দেশ—

'ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।।'

কালক্রমে একটি পুত্র ও তিনটি কন্যা তাঁরা লাভ করেন। ম্যাক্স্মুল্যারের দেহান্তের পরও তাঁর পতিব্রতা পত্নী তাঁর অপ্রকাশিত রচনাবলী প্রকাশ করেন। ১৮৫৬-তে তিনি বডলিয়ান লাইব্রেরীর কিউরেটার পদেও বৃত হন। ১৮৬০-এ প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ মনীষী স্যার হোরেস্ হেম্যান্ উইলসনের মৃত্যুতে অক্সফোর্ডের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক Boden Professor of Sanskrit পদটি শূন্য হয়। ম্যাক্স্মুল্যারের ছিল সংস্কৃত-অধ্যাপনার জীবনব্যাপী বাসনা। তাই, এই পদের জন্য তিনি প্রার্থী হলেন। আকৈশোর সংস্কৃত-সেবক এবং এমন প্রাজ্ঞ সংস্কৃতজ্ঞ ম্যাক্স্মুল্যার ঐ পদ হতে বঞ্চিত হলেন। সত্যদর্শী এই মনস্বীর ভারতপ্রেম, ধর্মসম্বন্ধে উদার মনোভাব এবং জার্মান বংশে জন্ম ইংরাজ ধর্মযাজকগণের চোখে অমার্জনীয় অপরাধ। তাই, তাঁদের দলবদ্ধ প্রতিকূলতায় এই অদ্বিতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সংস্কৃতের অধ্যাপক পদ হতে বঞ্চিত হলেন। এই ঘটনায় তিনি খুবই মানসিক আঘাত লাভ করেন। ১৮৬৮ তে তিনি ঐখানেই তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক পদ লাভ করেন। ঐ সূত্রে কথঞ্চিৎ সংস্কৃত পড়াবার সুযোগ পেয়ে তাঁর সংস্কৃত অধ্যাপনার আজীবন-সঞ্চিত বুভুক্ষা কিছুটা নিবৃত্ত হল। এতদিন ধরে জার্মান এবং ফরাসী অধ্যাপনার পর সংস্কৃত অধ্যাপনার সুযোগে তিনি এবার কিছুটা শান্তি পেলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

যে ঋগ্বেদের প্রকাশের জন্য তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করে দেশে দেশে ঘুরেছেন, সেই ঋগ্বেদের প্রথম খণ্ড সায়ণভাষ্য-সহ ১৮৪৯-এ তিনি প্রকাশ করলেন অক্স্ফোর্ড্ হতে। ১৮৪৯ হতে ১৮৭৩ পর্যন্ত ২৪ বৎসর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমে সমগ্র ঋগ্বেদ তিনি মোট ৬ খণ্ডে প্রকাশ করতে সমর্থ হলেন। সেই দেশে অজ্ঞাত দেবনাগরী টাইপটি পর্যন্ত তিনি স্বহস্তে কাঠ দিয়ে তৈরি ক'রে দিয়েছেন। প্রতিখণ্ডের শেষে সংস্কৃত পদ্ধতিতে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

'শর্মণ্যদেশজাতেন শ্রীগোতীর্থনিবাসিনা।
মোক্ষমূলরভট্টেন ভাষ্যমিদং বিশোধিতম্।।'

'শর্মণ্য' হ'ল জার্মেনী, শ্রীগোতীর্থ হ'ল Oxford এবং স্বয়ং ম্যাক্স্মুল্যার হলেন মোক্ষমূলর ভট্ট। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই গ্রন্থ বিক্রয় করে ৭৫ হাজার টাকা লাভ ক'রলেও মনীষী সম্পাদক ম্যাক্স্মুল্যারকে

দিয়েছিলেন তারই ভাষায় 'ইণ্ডিয়া অফিসের নিম্নতম করণিকেরও অনুপযুক্ত পারিশ্রমিক।' যা হোক, পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ এই ঋগ্বেদের প্রকাশ বিশ্বের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। হৃতসর্বস্ব ভারতের অতীত গৌরবের স্বর্ণদ্বার বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজে উদ্ঘাটিত হ'ল। যখন পৃথিবীর অন্যত্র সভ্যতার অরুণোদয়ও হয় নি তখন ভারতে হয়েছে জ্ঞান-সূর্যের ভাস্বর প্রকাশ। তারই রশ্মিমালা ঋগ্বেদে বিধৃত হয়ে আছে, যা বহু যুগের পরে আজকের মানুষেরও চক্ষুকে প্রতিহত করে। সমগ্র সভ্য জগৎ বিস্মিত, চমকিত, বিমুগ্ধ। মনীষী ম্যাক্সমুলার ঋগ্বেদের ভূমিকায় লিখলেন—

After the latest researches into the History and Chronology of the books of The Old Testament we may now safely call the Rigveda the oldest book, not only of the Aryan humanity, but of the whole World, and may hope that—

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্ ঋগ্বেদমহিমা লোকেষু প্রচারিষ্যতি॥"

অতীতের পুঁথিজাল হতে ঋগ্বেদের পাবনী ধারাকে কঠোর তপস্যায় বর্তমান যুগের প্রান্তরে প্রবাহিত করার নবভগীরথরূপে ম্যাক্সমুল্যার আমাদের বন্দনীয়। ইউরোপের বিভিন্নস্থানে প্রাপ্ত সকল বৈদিক পুঁথি এবং ভারত হতে তাঁর নিজের সংগৃহীত ৮০টি বৈদিক পুঁথির প্রত্যেকটি তন্ন তন্ন করে পাঠ ক'রে বিভিন্ন পাঠের মধ্যে মূল এবং বিশুদ্ধটি স্থির ক'রে, বৈদিক ব্যাকরণের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি ঋগ্বেদ প্রকাশে অগ্রসর হন। সায়ণভাষ্য নিয়েও তিনি ঠিক এই ভাবেই পরিশ্রম করেন। সামান্য সময়ের মধ্যেই এই সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়। সারা পৃথিবী হতে এই গ্রন্থের জন্য প্রার্থনা আসতে লাগলো। গ্রন্থাভাবে কারো প্রার্থনাই পূরণ করা গেল না। তখন ভারতের বিজয়নগরের অধিপতি মহারাজা স্যার পশুপতি আনন্দ গজপতিরাজ এই ঋগ্বেদের পুনঃপ্রকাশের জন্য অর্থসাহায্যে এগিয়ে এলেন। তাঁর প্রদত্ত ষাট হাজার টাকার অর্থানুকূল্যে ১৮৯০-৯২-এর মধ্যে চার খণ্ডে ঋগ্বেদের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করলেন ম্যাক্সমুল্যার। তখন তাঁর বয়স সত্তর। পরবর্তীকালের বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ জার্মান মনীষী ডঃ উইনটারনিৎস্ তাঁকে এই কাজে সহায়তা ক'রে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্রাচীনতম বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য এক কালে এই বিজয়নগর রাজ্যেরই সেনাপতি ছিলেন। এইভাবে ম্যাক্সমুল্যার নবযুগে বেদপ্রচারে হলেন পথিকৃৎ।

তাঁর জ্ঞানের গভীরতা যেমন ছিল অগাধ, তেমনি প্রসারও ছিল বিস্তৃত। ঋগ্বেদের সঙ্গে সঙ্গেই আরো বিবিধ বিষয়ে ছিল তাঁর অবাধ সঞ্চরণ। ১৮৫৯-এ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের ওপর 'History of Ancient Sanskrit Literature' তিনি প্রকাশ করেন। বৈদিক সাহিত্যের তথ্যানিষ্ঠ

সুবিস্তৃত ইতিহাস এইটিই প্রথম। বৈদিক সাহিত্যের অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী নিয়েও এই গ্রন্থে যথেষ্ট আলোচনা তিনি করেছেন। আলোচিত গ্রন্থাবলীর পৌর্বাপর্য নির্ণয়েও তিনি পথিকৃৎ। ইংলণ্ডে ইংরেজি ভাষায় তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞানের প্রবর্তক সংস্কৃতজ্ঞ এই জার্মান মনীষী। বহু গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ এই বিষয়ে তিনি লিখেছেন। তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি হ'ল—(১) On The Stratification of Language (London, 1868), (২) The Science of Language—2Vols. (Lond. 1861, 1863), (৩) On the Science of Language (Strasburg, 1872, জার্মান ভাষায় রচিত). (৪) Easays on Language and Literature (1899), (৫) Biographies of Word and the Home of Aryas (Lond 1898).

আধুনিক ইউরোপীয় তথা কেল্টিক ভাষাগুলির সঙ্গে সংস্কৃতের জ্ঞাতিত্বের আবিষ্কার তিনিই প্রথম করেন। ভারতে না এসেও মুণ্ডা ও দ্রাবিড় ভাষা নিয়ে তিনি মৌলিক তথ্য পরিবেশন করেন।

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনায়ও তিনি পথিকৃৎ। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের পরিচয়ও গভীরভাবে তিনি লাভ করেন। তুলনামূলক ধর্ম ও তুলনামূলক পুরাণকথা তথা Comparative Religion এবং Comparative Mythology ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। এই বিষয়ে বহু ভাষণমালা প্রদানে তাঁর কৃতিত্ব স্মরণীয়। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে—(১) On Mission, 1893, (২) Introduction to the Science of Religion, Lond. 1893, (৩) The Origin and Growth of Religion as Illustrated in the Natural Religion, Lond. 1889, (৪) Anthropological Religion, Lond. 1898, (৫) Theosophy of Psychological Religion, Lond. 1893, তুলনামূলক পুরাণ কথার ওপর তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ হ'ল—(১) Essay on Comparative Mythology, 1856. (2) Essays on Mythology of Folk-lore, 1900, (৩) Contribution to the Science of Mythology—2 Vols. Lond. 1897.।

প্রতীচ্য এবং প্রাচ্য দর্শনের ওপর তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি তাঁর দার্শনিক প্রজ্ঞারই পরিচয় আজো বহন ক'রে চলেছে। তার বিশেষ কয়েকটি হ'ল—(১) Kant's Critique of Pure Reason, Lond. 1881, (২) The Science of Thoughts, Lond 1987. (৩) Three Lectures on Vedanta Philosophy, Lond, 1894, (৪) The Six Systems of Hindu Philosophy, Lond, 1890.

এ ছাড়া বিশুদ্ধ সংস্কৃতের ওপর তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থাবলী তো রয়েইছে যার কয়েকটি হ'ল—(১) মেঘদূত—জার্মান অনুবাদ, Komisburg,

1847, (২) Rigveda Samhita (Sacred hymns of the Brahmanas translated and explained), Lond. 1869. (৩) Vedic Hymns (Sacred Books of the East) Vol 32, Oxford, 1891, (৪) Rigveda with Sayanas Commentary, 6 Vols, 1849—73, (৫) Hitopadesha (Text with translation in 2 parts), Lond. 1864—65. (৬) Rigveda—Pratisakya, Text with German translation, Leipzig, 1859—69, (৭) Vajrachedika (Anecdota Oxoniensia) 1881, (৮) The Upanishads (Sacred Book of the East) Vol. 1 to 15, 1879 (৯) The large and smaller Prajna Paramita Hridaya Sutra (Sacred Books of the East, Vol. 49). 1894, (১০) A Sanskrit Grammar—Lond. 1866, (১১) Apastamba Sutras (Sacred Books of the East), (১২) Dhammapad (Sacred Books of the East Vol, X, 1898).

এ ছাড়া আরো নানা বিষয়ে তাঁর বহু গ্রন্থ রয়েছে যার কয়েকটি হ'ল—

(১) Biographical Essays—Lond. 1884, (২) Anld Lang Syne, Lond, 1898, (৩) My Indian Friends, Lond 1899, (৪) My Autobiography (Incomplete) 1901 (৫) The German Classics from the Fourth to Nineteenth Century, Lond. 1858 (৬) Deutsche Liebe (in German) Leipzig, 1868, (৭) Scheller's Correspondence (Edited) Leipzig, 1875, (৮) Scherer's History of German Literature (Eed). Oxford, 1885, (৯) Chips from a German Workshop (Collected Essays) 4 Vols (1867—75) (১০) Last Essays, 1901.

যে সকল সিভিলিয়ান ভারতে এসে শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করবেন, তাঁদের ভারত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচিত করাবার জন্য কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ভাষণমালার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৮৩তে ম্যাক্সমূল্যার ঐ উপলক্ষ্যে যে ভাষণ দান করেন সেটিই 'India, what it can teach us' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সেদিন সংক্ষেপে ভারতীয় সংস্কৃতির যে সত্য পরিচয় তিনি উদ্ঘাটন করেন, বিশ্বসভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সভ্যতার যে মূল্যায়ন তিনি করেন, তাতে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এই গ্রন্থের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন—

'If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty of nature can bestow, in some parts a very paradise on earth should point out to India. If I were to ask under what sky the human mind has fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the

greatest problems of life, and has found solutions of some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant—I should point to India. And if I were to ask myself from what literature, we here in Europe, we who have been nurtured almost exclusively at the thoughts of Greeks and Romans, and of one Semite race —the Jewish, may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universal, in fact more truly human, a life, not for this life only, but a transfigured and eternal life again I should point to India.

এই গ্রন্থেরই ১৫ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন—

Whatever sphere of the human mind you may select for your special study, whether it be language, or religion, or mythology or philosophy, whether it be laws or customs, primitive art or primitive science, every where, you have to go to India, whether you like it or no, because some of the most valuable and most instructive materials in the history of man are treasured up in India, and in India only.'

তাঁর মতে পৃথিবীতে শান্তি, শক্তি, ভক্তি ও নিসর্গসৌন্দর্যের যদি কোনো দেশ থাকে, সেটি ভারতবর্ষ। প্লেটো কান্টের শিষ্যবর্গকে সত্যদর্শনের জন্য, নিখিল বিশ্বমানবকে শাশ্বত, সুন্দর এবং মহিমময় জীবনের জন্য এই ভারতের কাছেই দীক্ষা নিতে হবে।

এমন ভারতপ্রেম ভারতের সকল আশীর্বাদে পুষ্ট কয় জন ভারত-সন্তানেরই আছে, চিন্তার বিষয়।

এই ভারতপ্রেম তাঁর চিত্তকে এক সমুদার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তারই ফলে 'Sacred Books of The East' নামে গ্রন্থমালা প্রকাশের সংকল্প তিনি গ্রহণ করেন। তাঁকে নিয়ে বিশ জন বিশেষজ্ঞ মনীষী প্রাচ্যদেশের সকল ধর্মের বিশেষ গ্রন্থগুলি অনুবাদ করেন এবং সেগুলি এই গ্রন্থমালার এক একটি খণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়। তাঁর জীবনকালেই ৪৮টি গ্রন্থ এবং দেহান্তের পর অবশিষ্ট একটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। এতে একুশটি ছিল বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের, দশটি বৌদ্ধ, দুইটি জৈন এবং অন্যগুলি পারসিক, ইসলাম ও প্রাচীন চৈনিক ধর্মের ওপর বিরচিত। এইভাবে তিনি তুলনামূলক ধর্ম বিজ্ঞানের পথটি প্রশস্ত করে দেন।

এই ক্রান্তদর্শী মনীষী তাঁর দূরদৃষ্টিতে দেখেছিলেন যে আন্তর্জাতিক মৈত্রীভাবনার দ্বারা বিশ্বমানবকে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে

ভবিষ্যতে সভ্যতার সংকট ঘনিয়ে আসবে। নাস্তিকতার দ্বারা বিশ্বমৈত্রী কখনো সম্ভব নয়। আর মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধর্মচেতনাকে কখনো নির্মূল করাও যাবে না। অথচ সংকীর্ণ ধর্ম-সংস্কারের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত ধর্মই সর্বজনের একমাত্র পরিপালনীয় বোধে অন্য ধর্মের অস্বীকৃতির দ্বারা বিশ্বমৈত্রীকে তিরস্কৃত করা হয়। নাস্তিক্যবাদ-নির্ভর উগ্র রাজনীতি এবং আস্তিক্যবাদ-নির্ভর সংকীর্ণ ধর্ম বুদ্ধি উভয়ই বিশ্বমৈত্রী এবং বিশ্বকল্যাণের পরিপন্থী। সংস্কৃত ভাষায় নিষ্ণাত ম্যাক্সমুল্যার উপলব্ধি করলেন ভারতের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বাণীর প্রয়োজনীয়তা।

'ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলং নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥'

বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত সকল নদীর যেমন সমুদ্রই পরমা গতি, তেমনি নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্যানুসারে বিভিন্ন সাধনমার্গের অনুসরণ করলেও সকল মানুষই পরিণামে পরমেশ্বরকে লাভ করেন- পুষ্পদন্তের এই স্তোত্রগীতিতে তিনি উদ্বুদ্ধ। তাই সকল ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থিতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মৈত্রীসাধনার ভূমিকারূপে তাঁর 'Sacred Books of The East' —গ্রন্থমালার সঙ্কলন ও সম্পাদন। সমুদয় ধর্মের ঐক্যসূত্রে গ্রথিত, সম্মিলিত এবং সমুন্নত এক-বিশ্বমানবগোষ্ঠীর উদ্গাতা রূপে তিনি আজকের হিংসা-দ্বন্দ্ব-জর্জরিত জগতে বিশেষ করে স্মরণীয়।

তাই 'যত মত তত পথ সবশেষে এক সৎ'—মন্ত্রের নবযুগের উদ্গাতা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর একান্ত অনুরক্তি। তাঁর আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'Ramakrishna, His life and sayings'—যাতে ভারতীয় সাধনার ধারা এবং সমসাময়িক ধর্মপ্রবক্তাদের জীবনাদর্শ সংক্ষেপে আলোচনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের দিব্যজীবন এবং কথামৃত তিনি পরিবেশন করেন। ১৮৯৮-তে এই গ্রন্থের ভূমিকায় মুক্তবুদ্ধি এই মনীষী লিখেছেন—

'We need not fear that the Sannyasins of India will ever find followers or imitators in Europe, nor would it be at all desirable that they should, not even for the sake of psychic research, or for experiments in physic. psychological laboratories. But apart from that, a better knowledge of the teachings of one of them seems certainly desirable, whether for the statesmen who have to deal with the various classes of Indian society, or for the missionaries who are

anxious to understand and to influence the inhabitans of that country, or lastly for the students of philosophy and religion who ought to know how the most ancient philosophy of the world, the Vedanta, is taught at the present day by the Bhaktas, that is 'thet friends and devoted lovers of God' and continues to exercise its powerful influence, not only on a few philosophers, but on the large masses of what has always been called a country of philosophers. A country permeated by such thoughts as were uttered by Ramakrishna can not possibly be looked upon as a country of ignorant idolaters to be converted, by the same methods which are applicable to the races of central Africa.'

যে ভারতে বনের বেদান্ত ঘরের মানুষের মনেও প্রতিষ্ঠিত, সেই দেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন্ নি। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি বেদান্তের প্রমূর্ত বিগ্রহ ব'লে মনে করতেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখের পত্র এবং রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র জীবন এবং মহতী সাধনার পরিচয় পেয়ে ভারতে না এসেও বহু তথ্য এবং বচন সংগ্রহ ক'রে এই গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। ১৮৯৬তে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে অক্স্ফোর্ডে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এই তরুণ সন্ন্যাসীর দৃপ্ত মূর্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য, পবিত্র জীবন এবং সনাতনী সাধনায় তিনি বিমুগ্ধ হন। রাত্রে প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বয়সে চল্লিশ বৎসরের কনিষ্ঠ বিবেকানন্দকে ষ্টেশনে এই প্রবীণ জ্ঞানতপস্বী বিদায় জানাতে এলে বিস্মিত বিবেকানন্দ মৃদু অনুযোগ করায় তিনি বলেন 'শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যকে তো অক্স্ফোর্ডে নিত্য পাওয়া যায় না। তাই এই কষ্টটুকু তিনি সানন্দে বরণ করেছেন।' স্বামীজী ম্যাক্স্মুল্যারের ভারত বিদ্যায় গভীর জ্ঞান এবং অতুলনীয় শ্রদ্ধার কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে লিখেছেন—

'ম্যাক্স্মুল্যার ভারতবর্ষকে যে পরিমাণ ভালবাসেন আমি আমার মাতৃভূমিকে তাহার শতাংশ ভালবাসিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিতাম।'

ভারততত্ত্ববিদ্ আরো বহু স্বদেশী এবং বিদেশী মনীষী ছিলেন ও আছেন। তাঁদের বেশির ভাগই ভারততত্ত্বের কৌতূহলী শব-ব্যবচ্ছেদক। শ্রদ্ধা এবং প্রেমের অভাবে তাঁদের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতির সত্যস্বরূপ সর্বদা অনর্গলিত হয় না। কিন্তু ম্যাক্স্মুল্যার যথার্থই ছিলেন ভারতবিদ্যা-প্রেমিক এবং ভারতবিদ্যারসিক। তাই শ্রদ্ধাবান্ এই পণ্ডিতের দ্বারা ভারতবিদ্যার মর্মোদ্ধার অনেকটাই সম্ভব হয়েছে।

শুধু প্রাচীন ভারতেই নয়, তার অনুবর্তী বর্তমান ভারতও ছিল তাঁর অতি প্রিয়। ১৮৮৩র ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টলে অনুষ্ঠিত মহাত্মা রাজা রামমোহনের পঞ্চাশত্তম মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রদত্ত অনবদ্য ভাষণে তিনি নিজেকে বিশ্বপথিক রামমোহনের অনুগামী বলে চিহ্নিত করেন। প্রিন্স দ্বারকানাথের সঙ্গে ১৮৪৫এ তিনি প্যারিসে পরিচিত হন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিল তাঁর পত্র-সৌহৃদ্য। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে লণ্ডনে তাঁর পরিচয় হয়। শৈশবে অজান্তে বারাণসীর স্নানের ঘাট এবং মন্দির সংবলিত চিত্র তাঁকে কিভাবে আকৃষ্ট করতো, তার বর্ণনা তিনি সত্যেন্দ্রনাথের কাছে করেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, দয়ানন্দ সরস্বতী, নীলকণ্ঠ গোরে, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি সমসাময়িক বিশিষ্ট ভারতীয়ের সঙ্গে ছিল তাঁর বিশেষ সৌহৃদ্য। ভারতীয় জাতীয়তার অগ্নিপুরুষ লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলককে তিনি অপরিসীম শ্রদ্ধা করতেন। লোকমান্যের তীব্র দেশ প্রেম, অনমনীয় ঋজু চরিত্র এবং অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। লোকমান্যের বেদালোচনা বেদজ্ঞ ম্যাক্স্মুল্যারকে মুগ্ধ করেছিল। ১৮৯৮তে লোকমান্য তিলক রাজদ্রোহের অপরাধে কারারুদ্ধ হলে ইংলণ্ডে তাঁর কারামুক্তির আন্দোলনে ম্যাক্স্মুল্যার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই নিয়ে লেখনী ধারণেও তিনি ইতস্ততঃ করেন নি। কারাগারে তিলকের কাছে তিনি স্বপ্রকাশিত ঋগ্বেদ উপহাররূপে প্রেরণ করেন। ভারতে শ্বেতকায় অপরাধীদের বিচারও ভারতীয় বিচারকরা যাতে করতে পারেন, তার জন্য লর্ড রিপন্ 'ইল্বার্ট্ বিল' আনয়ন করেন। তাতে ভারতে ও ইংলণ্ডে শ্বেতকায়দের মধ্যে তুমুল বিক্ষোভ দেখা দেয়। সেই সময়েও ভারতীয়দের দ্বারা ইংরেজের বিচারের পক্ষে ম্যাক্স্মুল্যার লণ্ডনের 'Times' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি ছিলেন সর্বদাই ন্যায় এবং সত্যের পক্ষে। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর বাল্মীকি-রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদ ম্যাক্স্মুল্যারকে উৎসর্গ করেন। ভারতের সনাতনী সমাজ এবং সংস্কৃত পণ্ডিতগণ ম্যাক্স্মুল্যারকে একান্ত আত্মজনরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গদেশের সনাতনী নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব ম্যাক্স্মুল্যারকে কলির বেদব্যাস আখ্যায় ভূষিত করেন। ১৮৮৩ তে লাইপ্জিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পি, এইচ্, ডি প্রাপ্তির সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে ভারতের পণ্ডিত মণ্ডলী স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর ক'রে তাঁর কাছে অভিনন্দন-পত্র প্রেরণ করেন। ভারতে অনেকেই শ্রাদ্ধাদিতে প্রদেয় পণ্ডিত-বিদায় 'ধুতি চাদর তৈজসাদি' অক্সফোর্ডে ম্যাক্স্-মুল্যারের কাছেও পাঠিয়ে দিয়ে কৃতার্থ হতেন। অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং গর্বের সঙ্গে এই পণ্ডিত-বিদায় গ্রহণ ক'রে তিনি আনন্দ প্রকাশ করতেন। ১৯০০ তে তিনি গুরুতর পীড়িত হওয়ায় রক্ষণশীলদের দুর্গ মাদ্রাজের মন্দিরে তাঁর রোগমুক্তির কামনায় বিশেষ পূজা এবং স্বস্ত্যয়নাদি অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তাতে রোগমুক্তও হন।

তাঁর স্বপ্নের ভারতে তিনি কখনো আসার সুযোগলাভ করেন নি। ১৮৮৫তে প্রিন্স্ অফ্ ওয়েল্সের সঙ্গে তাঁর আসার কথা হলে রাজনৈতিক কারণে সেটি পরিত্যক্ত হয়। তাঁর ভারতপ্রেম ব্রিটিশ-শাসকের বিদ্বেষের বিষয়। কিন্তু এই স্থিতপ্রজ্ঞ তপস্বী তাতে বিচলিত হন নি। সংস্কৃত গ্রন্থাবলীতে পরিপূর্ণ তাঁর অধ্যয়ন কক্ষকে তিনি বারাণসী বলে আনন্দ পেতেন। ভারতীয় ছাত্রদের তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আত্মীয়বৎসল ও মাতৃভক্ত ছিলেন। কর্মসূত্রে তিনি ইংলণ্ডে থাক্তেন। কিন্তু সময় করে প্রায়ই স্বদেশে মাতৃ-সন্নিধানে গমন করতেন। ১৮৮৬তে মাতৃবিয়োগে তিনি অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে পড়েন। ভারতের মাতৃভক্তি ভারতপ্রেমিক ম্যাক্স্‌মূল্যারের জীবনেও বিশেষ ভাবে সংক্রমিত হ'য়েছিল। সহকর্মীদের সঙ্গে ছিল তাঁর সহ-মর্মিতা। তাঁদের সর্বপ্রকারসাহায্যে তিনি সদাইউন্মুখ থাকতেন। সকল ছাত্রকেই তিনি সংস্কৃত শিক্ষায় উৎসাহিত করতেন। যদিও তিনি ছিলেন ভাষাবিজ্ঞানের আচার্য, তবুও সংস্কৃতপ্রচারই ছিল তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। তিন জন জাপানি ছাত্রকে তিনি সংস্কৃতপাঠে দীক্ষিত করে তাঁদের দিয়ে অনেক কাজ করিয়েছেন। তাঁরই প্রেরণায় বুণিও নানজিও (Bunyo Nanjio) চৈনিক ভাষায় লিখিত কয়েকশত সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থের তালিকা তৈরি করেন। কেনজু কাশাহারা (Kenju Kasahara) সংস্কৃতে লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহের পরিভাষা সংকলন করেন। তাকাকাসু (Taka kusu) চৈনিক পর্যটক ইৎসিং এর ভারতভ্রমণ বৃত্তান্ত ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী অক্লান্তকর্মা এই জ্ঞানব্রতী পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নানা ভাবে সম্মানিত হন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁকে 'প্রিভি কাউন্সিলার' নিযুক্ত করে সম্মানিত করেন। প্রাশিয়া এবং ইটালীর সরকার তাঁকে 'নাইট্' উপাধিতে ভূষিত করেন। সুইডেন, রুমানিয়া এবং তুরস্কের রাজা তাঁকে সম্বর্ধিত করেন। ১৮৯২তে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের (International Congress of Orientalists) নবম অধিবেশনে তিনি মূল সভাপতিপদে বৃত হন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তাঁর কর্মতীর্থ অক্সফোর্ডেই তিনি লোকান্তরে যাত্রা করেন। বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজ এবং বিশেষতঃ ভারতবর্ষ এই প্রাজ্ঞ মনীষীর বিচ্ছেদে সেদিন অপরিসীম শোকে নিমগ্ন হয়েছিল। ভৌগোলিক ভারতে তিনি আসতে পারেন নি। কিন্তু ভারতের মানসলোকের তিনি ছিলেন চিরন্তন পথিক। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতের নবজাগরণে, আত্মবিস্মৃত ভারতীয়ের আত্মসমীক্ষায় এই বিদেশী মনীষীর জীবন ও সারস্বত সাধনার অনন্য ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় যে প্রতীচ্য বিদ্যার হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে নব্য ইংরেজিশিক্ষিতেরা বহির্মুখ পতঙ্গের ন্যায় আত্মবিস্মৃতির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক আত্মহত্যার পথে ছুটে চলেছিলেন, তাঁদের আত্মচৈতন্যে প্রবুদ্ধ করার জন্য এই মনীষীই যেন

মন্ত্রোচ্চারণ করলেন—'আত্মানং বিদ্ধি'। বিশ্বকেও আহ্বান করলেন ভারতের সমুদার মানসলোকে জ্ঞানভিক্ষু বিদ্যার্থীরূপে দীক্ষাগ্রহণের জন্য। ভারতে না এসেও চিরন্তন ভারতপথিক রূপে তিনি আজ বন্দনীয়। তাই বর্তমান ভারতের প্রাজ্ঞ সংস্কৃতজ্ঞ কবিশেখর বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণের রচিত প্রতীচ্য সংস্কৃতবেত্তা ম্যাক্সমুল্যারের উদ্দেশ্যে সংস্কৃত-বন্দনাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।—

'যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাদ্ পৃথ্বী চ রত্নমালিনী।
মোক্ষমূলারসংকীর্তিঃ ভাসয়িষ্যতি ভূতলম্ ॥
সুকীর্তিশালী গুণবান্ সুপণ্ডিতঃ
মহর্ষিকল্পঃ সংস্কৃতপদ্মভৃঙ্গঃ।
পুণ্যাশয়ো ভারতচিন্তচারী
জীয়াচ্চিরং মোক্ষমূলারসংজ্ঞঃ ॥'

বাংলার নবজাগরণে সংস্কৃত চর্চা

উনবিংশ শতাব্দী বাংলার জাতীয় ইতিহাসে এক পরম শুভলগ্ন। দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক পরাধীনতার প্রভাবে সাংস্কৃতিক পরাধীনতার (Cultural Slavery) মোহনিদ্রায় জাতি ছিল আচ্ছন্ন। তামসিক নিষ্ক্রিয়তা এবং অশুভ পরানুচিকীর্ষা তখন অনেকের স্বধর্মে পরিণত হয়েছে। জাতীয় জীবনে চিন্তশক্তি বন্ধ্যা এবং সৃষ্টিশক্তি পঙ্গু হয়ে গেছে। ইতিহাসের ধারাপথে একদল প্রতিভাধর মনস্বীর সমবেত আবির্ভাবে এই উনবিংশ শতকে আমাদের জাতীয় জীবনের মরা গাঙে নতুন জোয়ার এসেছিল। তাঁদের বিচিত্র কর্মকোলাহলে জাতির সুপ্তিভংগ হল। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরম্ভ হল নব নব কর্মান্দোলন। নবীন চিন্তা এবং অদম্য কর্মৈষণার দ্বারা ঘোষিত হল প্রসুপ্ত জাতির নবজাগরণের বার্তা। তাই, এই শতক আমাদের ইতিহাসের মাহেন্দ্রক্ষণরূপে চিহ্নিত।

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে ঘটে গেছে শিল্প-বিপ্লব। ফলে, প্রতীচ্য জগতে চিন্তায় ও কর্মে সংঘটিত হয়েছে এক বিরাট রূপান্তর। প্রতীচ্যের নবোত্থিত জীবন-জিজ্ঞাসা এবং নবলব্ধ আত্মপ্রত্যয়ের তরংগাঘাতেই উনিশ শতকে প্রাচীন প্রাচ্যের সুপ্তিভংগ হল, নব-জীবনের অরুণোদয় হল প্রাচীর চিত্তাকাশে। এই নব জাগৃতির অব্যবহিত-পূর্ব সময়ে বহির্বিশ্বের সম্বন্ধে আমরা যেমন অন্ধ ছিলাম, তেমনি ভুলে গিয়েছিলাম আমাদেরো নিজেদের গৌরবময় প্রাচীন অতীতকে। তাই, নবজাগরণের যুগে বাংলার মনীষিমণ্ডলী অন্তরের দ্বার খুলে প্রতীচ্যকে যেমন স্বাগত জানিয়েছেন, তেমনি স্বীয় অতীত সংস্কৃতির মণিকোঠায়ও করেছেন আত্মানুসন্ধান। কালান্তরে বর্তমানে উনিশ শতকের জীবনধারা বিশ্লেষণে প্রতীচ্যের আবাহনকে অসামান্য স্থান দান করলেও প্রাচ্যের অতীতচারণা তথা আত্মানুসন্ধানকে সামান্য স্থান দানেও অনেকে কুণ্ঠিত। এই সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণার অবকাশ রয়েছে মনে করেই বর্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে দিগ্‌দর্শনের প্রয়াস।

- ঐতিহাসিক-মূর্ধন্য টয়েনবীর মতে আত্মবিসর্জন নয়, নিজের গৌরবময় হারানো অতীতকে নবজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নতুনভাবে গ্রহণ করাই হল জাতীয় জীবনে রেনেসাঁ বা নবজাগরণ। অর্থগত তাৎপর্যের দিক দিয়েও আত্মবিস্মরণ এবং নবজাগরণ অনেকটা পরস্পরবিরোধী। বরঞ্চ, আত্মসমীক্ষাই হচ্ছে নবজাগরণের পরিণতি। এই প্রসংগে আবার মনে রাখা প্রয়োজন যে, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন ব্যতীত ভারতাত্মার যথার্থ পরিচয় কখনো লাভ করা যেতে পারে না। ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত ভাষার নিবিড় সম্বন্ধের কথা বিশ্লেষণ করে বিখ্যাত ফরাসী মনীষী ডঃ লুই রেনো বলছেন—

"There is no living culture without a living tradition.

If India is beloved and cherished among the elite of the West—it is on account of her traditional culture. And this culture is embedded above all in the treasures of Sanskrit. Sanskrit and India are inseparably connected inspite of all the transitory harangues of the politicians."

তাই, উনিশ শতকে বংগ-ভারতের নবজাগরণ তথা রেনেসাঁর মূলে আত্মসমীক্ষার ধারাপথে সংস্কৃতের পুনরুদ্ধারকে গৌণ করা চলে না।

ভারতীয় সামগ্রিক সংস্কৃতির চিরন্তনী ধাত্রী বিশ্বনন্দিতা সংস্কৃত ভাষা। বাংলার সরস মননভূমিতে এই দেবভাষার অধিষ্ঠান স্মরণাতীতকাল হতেই বলা চলে। বাংলা দেশে বাংলা ভাষার উদ্ভবের পূর্বেও সংস্কৃতই ছিল সাংস্কৃতিক ভাষা। এই দেশে যুগ-যুগান্তরব্যাপী সারস্বতসাধনার ধারাপথে সংস্কৃতচর্চার মন্দাকিনী কখনো বিশুষ্ক হয় নি। তাই, উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় জীবনেও বাংলা দেশে সংস্কৃতচর্চা বিলুপ্ত হয় নি, বরঞ্চ স্বাধীনোত্তর ভারতের চেয়ে অধিকতরভাবে প্রতিষ্ঠিতা ছিল। দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রশক্তির প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সেদিন সমাজের অধিকাংশ নরনারীর সশ্রদ্ধ আকর্ষণ ছিল এই সংস্কৃত ভাষার প্রচার এবং প্রসারের দিকে। বিশেষতঃ বিদগ্ধ গোষ্ঠীর অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় ছিল তখনো পর্যন্ত সংস্কৃত। এই সেদিনও আধুনিক মনীষার মহান্ প্রবক্তা প্রমথ চৌধুরী বলেছেন—

'পণ্ডিত নয়, কেবল Cultured হতে হলেও একটা Classics জানা চাই। আর আমাদের পক্ষে একমাত্র Classical ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত। রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাসের কাব্য, ভাসের নাটক, বাণভট্টের কাদম্বরী, ভর্তৃহরির শতক—ভারতীয় সাহিত্যে এ সবের কি তুলনা আছে?'

(প্রমথ চৌধুরী—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরণজিৎকুমার সেন সম্পাদিত, পৃ:১৪।

উনবিংশ শতাব্দী আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণ। এই সময়ে কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন প্রাচীন এবং নবীনের সংঘর্ষ দেখা গিয়েছিল, তেমনি সমন্বয়ের মন্ত্রও বহু ক্ষেত্রে হয়েছিল উদ্‌গীত। আজকের মতো হঠাৎ আমদানী করা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্লাবনে অনেকের মতে প্রতিক্রিয়াশীল অথচ আমাদের মতে আত্মোপলব্ধিসহায়ক সংস্কৃত চর্চাকে সেদিন ভাসিয়ে দেওয়া হয় নি। তাই, সনাতন ভাবধারার ধাত্রী সংস্কৃত ভাষার পঠন-পাঠনে অনাদর, অবহেলা ও উৎসাদনের আজকের মতো সর্বনাশা রূপ সেদিন প্রকটিত হয়ে ওঠে নি। যে সকল চতুষ্পাঠীকে অবলম্বন করে আবহমানকাল ধরে সংস্কৃত শিক্ষার রথচক্র আবর্তিত হচ্ছিল, সেই চতুষ্পাঠীগুলি সেদিন বিলুপ্ত হয় নি এবং তার ছাত্রসংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য ছিল না।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে স্যার্ উইলিয়াম্ এ্যাডামের রিপোর্টে বাংলা ও বিহারে

সেদিন একলক্ষ চতুষ্পাঠীর অস্তিত্ব মেলে। কোন কোন চতুষ্পাঠীতে শতাধিক ছাত্রকে বিদ্যা ও অন্নদান করা হ'ত। বস্তুতঃ গণ-শিক্ষারও সেদিন মুখ্য অবলম্বন ছিল এই আবাসিক এবং অবৈতনিক সংস্কৃত বিদ্যায়তনগুলি। ধনিক শ্রেণী এবং জমিদারগোষ্ঠী এই চতুষ্পাঠীগুলিকে সংরক্ষণের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে করতেন যথেষ্ট অর্থানুকূল্য। টোলের পণ্ডিত এবং ছাত্রদের জন্য নানাবিধ বৃত্তি, ব্রহ্মোত্তর, সাময়িক দান প্রভৃতির দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে তাঁরা একদিকে যেমন সমাজে সম্মানের অধিকারী হতেন, তেমনি অন্যদিকে নিজেরাও লাভ করতেন পরম আত্মপ্রসাদ। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সকল নরনারীরই পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল এই টোলের পণ্ডিতমণ্ডলী এবং তাঁদের অন্তেবাসীদের প্রতি। সংস্কৃত শিক্ষার স্বাভাবিক মহিমা এবং প্রয়োজন সম্বন্ধে সেদিন সকলেই ছিল অবহিত। তখনো সংস্কৃতই ছিল এই দেশে সর্বজনীন উচ্চ-শিক্ষার প্রধান বাহন। তাই, ঊনবিংশ শতকে বাংলা দেশে নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সূত্রপাতে একমাত্র সংস্কৃত ও ইংরেজীরই শিক্ষার বাহনরূপে যোগ্যতা স্বীকৃত হয়েছিল। কাকে গ্রহণ করা হবে এই নিয়ে তাই দ্বন্দ্বটিও সেদিন সীমিত ছিল এই দুটি সমৃদ্ধ ভাষার মধ্যেই। মেকলে যেমন ছিলেন ইংরেজীর পক্ষে সেনাপতি, তেমনি উইলসনের মতো মহামনা মনীষী ছিলেন সংস্কৃতের পক্ষে নায়ক। রাজনৈতিক পরাধীনতাকে চিরস্থায়ী করার জন্য প্রয়োজন ভারতবাসীর মনে সাংস্কৃতিক পরাধীনতার (Cultural Slayery) বীজ বপন। আর ভারতে সংস্কৃতের বিস্মৃতিই হচ্ছে তার প্রধান উপায়। সংস্কৃত ভুলে গেলে ভারতের অতীত গৌরবময় ঐতিহ্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞান আর ভারতীয়দের থাকবে না। দূরপ্রসারী রাজনৈতিক বুদ্ধিতে পরিচালিত হয়ে সেদিনের শাসকগোষ্ঠী সংস্কৃতের পরিবর্তে ইংরেজীকে সেদিন তাই শিক্ষার বাহনরূপে স্থির করেন। লর্ড মেকলের ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত 'Minute'-এ সে জন্য এমন মানুষই তৈরী করার নির্দেশ রয়েছে, যারা হবে—

"A class of pe sons, Indian in blood and colour ; but English in taste, in c pinions, in morals and in intellect."

তাই, লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে সরকারী **'Communique'**-এ এই কথাই বলা হয়েছে—

"The great object of the British Government ought to be the promotion of European Literature and Science among the natives cf India and all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone."

পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা নয়, **English education alone** কথাটি এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই নিতান্ত বিজাতীয় একপেশে শিক্ষার মাশুলে দেশব্যাপী

অনৈক্য এবং চরম আত্মবিস্মৃতির মাধ্যমে আজ আমাদের বিশেষভাবে দিয়ে যেতে হচ্ছে। সুফল যা পেয়েছি, সেটা অনেকটা তার by product বা উপজাতের মতো এবং তা শিক্ষা-নিয়ন্তাদের ছিল সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত।

আমাদের পরম সৌভাগ্য এই যে ঊনবিংশ শতকে যাঁরা ছিলেন আমাদের নবজাগৃতির নায়ক, তাঁদের অনেকেই ইংরেজী শিক্ষার সংগে সংগেই সংস্কৃতও অধ্যয়ন করেছিলেন গভীরভাবে। তাই, তাঁরা নোঙরহীন নৌকার মতো দেশের সাংস্কৃতিক তটভূমি হতে নতুন চিন্তার ঝড়ে দূরে ভেসে যান্ নি। বরঞ্চ, প্রতীচ্যাগত নূতন জ্ঞানের আলোকে আমাদের সনাতন সংস্কৃতির নব মূল্যায়ন ও অনুশীলনে তাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই সত্যটি আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। তাই, তাঁদের প্রধান কয়েকজনের সংস্কৃত-সাধনার কথা অতি সংক্ষেপে এখানে আলোচিত হচ্ছে।

প্রাচ্য জগতে রেনেসাঁর অগ্রদূতরূপে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সর্বজন-বন্দিত এবং স্বীকৃত। প্রথমে তিনি সংস্কৃত বিদ্যাতেই ছিলেন যথেষ্ট অধিগতবিদ্য। পরে অন্যান্য ভাষায় হন সুনিষ্ণাত। সংস্কৃত ভাষণ ও রচনায় ছিল তাঁর অপূর্ব নৈপুণ্য। উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ এবং সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সংগে তাঁর ধর্মবিচার সংস্কৃতেই নির্বাহিত হয়ে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়।

"গায়ত্র্যাঃ পরমোপাসনাবিধানম্" এবং "আত্মনাত্মবিবেক" তাঁরই রচিত দুটি সংস্কৃত গ্রন্থ। এ ছাড়া বেদান্ত এবং উপনিষৎ নিয়ে তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। যথা—বেদান্ত গ্রন্থ, বেদান্তসার, তলবকারোপনিষৎ, ঈশোপনিষৎ, ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, কঠোপনিষৎ, মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, বজ্রসূচী, গীতার পদ্যানুবাদ প্রভৃতি তিনি রচনা করেন। ব্রাহ্মসমাজে বিশিষ্ট বেদজ্ঞ পণ্ডিতদের দিয়ে বিশুদ্ধভাবে বেদপাঠের ব্যবস্থা তিনি করিয়েছিলেন। সংস্কৃত তন্ত্রশাস্ত্রেও ছিল তাঁর গভীর প্রবেশ।

সেদিনের আর একজন মনীষী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কৃতে ছিলেন বিশেষভাবে নিষ্ণাত। "বেদের" প্রচারে ছিল তাঁর অসীম আগ্রহ। সংস্কৃতের বহু অধ্যাপক তাঁর দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন এবং তাঁর অর্থানুকূল্যে বিদ্যাচর্চা করেছেন। তিনি বৃত্তি দিয়ে কয়েকজন বাঙালী পণ্ডিতকে বারাণসী পাঠিয়েছিলেন বেদ অধ্যয়নের জন্য, যাতে পরে তাঁরা বাংলা দেশে বেদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। ধনীর দুলাল সংস্কৃতজ্ঞ দেবেন্দ্রনাথ বিলাসের জীবন ত্যাগ করে আর্য জীবনচর্যা গ্রহণ করেছিলেন ঈশোপনিষদের একটি ছিন্নপত্রের নাটকীয় প্রভাবে। সংস্কৃত জানতেন বলেই ঐ ছিন্নপত্রের শ্লোক তাঁর মনের গতি পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। "ব্রাহ্মধর্ম" গ্রন্থে উপনিষদের প্রিয় শ্লোকগুলিকে তিনি পরম আগ্রহভরে সংগ্রহ করে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করেন। তাঁর জীবন-বোধ এবং অধ্যাত্মচেতনা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে ঐ সংস্কৃত শ্লোকরাজিতে। সন্তানদের সংস্কৃত শেখাবার জন্য তাঁর ছিল অসীম

আগ্রহ। সংস্কৃতে বিদুষী গৌরী বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীকে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন বাড়ীর অন্তঃপুরিকাদের নিয়মিতভাবে সংস্কৃত পড়ানোর জন্য—এই কথা বলেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী। সে-যুগে বাড়ীর কন্যা ও বধূদেরো সংস্কৃত শেখাবার এমন সক্রিয় আগ্রহ আর কারো ছিল কি না জানি না। শৈশবেই পুত্রদের ভালো করে সংস্কৃত শেখাবার জন্য তিনি হেরম্ব তত্ত্বরত্ন, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য, শিবধন বিদ্যার্ণব প্রমুখ পণ্ডিতকে একের পর এক নিযুক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথের "জীবন স্মৃতি"তে তাঁদের সংস্কৃত শেখাবার জন্য মহর্ষিদেবের বহুবিধ প্রয়াসের কথা উল্লিখিত হয়েছে। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ, উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ রীতিতে আবৃত্তি তাঁদের অবশ্যকরণীয় ছিল। একটি "গীতা" গ্রন্থে মহর্ষিদেব মনের মত শ্লোকগুলি চিহ্নিত করে বাংলা অনুবাদসহ সেইগুলির প্রতিলিপির জন্য রবীন্দ্রনাথকে আদেশ দিয়ে সুকৌশলে পুত্রকে গীতায় অভ্যস্ত করিয়ে নেন। কিছুটা মুগ্ধবোধ পড়িয়ে তারপর ঋজুপাঠ ২য় ভাগ এবং তারপর উপক্রমণিকার শব্দরূপ মুখস্থ করতে মহর্ষি পুত্রকে আদেশ দেন। সংস্কৃত ভাষায় রচনা লেখার জন্য তখন থেকে পিতা পুত্রকে উৎসাহিত করতেন। পিতার সংগে হিমালয়ে অবস্থানের সময় বারো বছরের বালক রবীন্দ্রনাথকে রাত্রের অন্ধকার ফিকে হওয়ার পূর্বেই উপক্রমণিকার শব্দরূপ নিয়ে বসতে হত এবং তারপর সূর্যোদয়ে পিতার সংগে দাঁড়িয়ে উপনিষদের মন্ত্রপাঠ করতে হত। বলা বাহুল্য, ঠাকুরবাড়ীর সন্তানেরা প্রথমেই সংস্কৃতে হতেন নিষ্ণাত। ফলে বাংলা ভাষায় তাঁদের অধিকার জন্মেছিল বিস্ময়কর। মহর্ষিদেবের সকল পুত্রেরই সংস্কৃতজ্ঞান ও প্রীতি দেখে বলা চলে—"প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ"।

দ্বিজেন্দ্রনাথ অতি তরুণ বয়সেই করেন "মেঘদূতের" অপূর্ব পদ্যানুবাদ। তিনি গীতার ওপর রচনা করেন অনবদ্য গ্রন্থ "গীতাপাঠ"। ভারতীয় দর্শনে ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান্ হয়েও সত্যেন্দ্রনাথ করেন গীতা এবং মেঘদূতের পদ্যানুবাদ। বৌদ্ধসংস্কৃতে তিনি ছিলেন প্রগাঢ় পণ্ডিত। সংস্কৃত ভাষায় সংলাপেও তিনি ছিলেন অতিশয় দক্ষ। সতেরোটি বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের রসমধুর মূলানুগ অনুবাদের মাধ্যমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রদর্শন করেছেন সংস্কৃত জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা।

আর, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সংস্কৃতজ্ঞান এবং সবাইকে সংস্কৃতের পুণ্য-স্পর্শে সঞ্জীবিত করার অকুণ্ঠ প্রয়াসের কথা তো সর্বজনবিদিত। তিনি নিজেকে সংস্কৃতেরই সৃষ্টি বলে কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করতেন। সারা জীবন ধরে সংস্কৃতের চর্চা করেছেন তিনি। পুত্র-কন্যা-পত্নী এবং অনুগামীদের সংস্কৃত শেখাবার জন্য তিনি কত বিচিত্র প্রয়াসই না করেছিলেন। উপনিষদ্, মনুসংহিতা, সংস্কৃত মূল রামায়ণ-মহাভারত, কালিদাস, ভবভূতি ও বাণভট্টের

কাব্যাবলী তিনি গভীরভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সংস্কৃত ভাষা এবং তদাশ্রিত সংস্কৃতি তাঁকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলো সেই প্রসংগে "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ" গ্রন্থে তিনি বলেছেন—

"ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য আমার মনে দৃঢ় ছিল। ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা জানতে পারি, সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে। সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে, তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিত্তকে মর্যাদা দিয়ে থাকে। যে শিক্ষাতত্ত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি, তার ভূমিকা হ'ল এইখানে।"

শান্তিনিকেতনে বাংলা ভাষার অধ্যাপক নির্বাচনে তাঁদের সংস্কৃতজ্ঞানের ভিত্তি তিনি যাচাই করে নিতেন। ডঃ প্রমথনাথ বিশী "রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আশ্রমের সকল অধ্যাপক এবং উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের আবশ্যিকভাবে "পাণিনি" পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন কবি। পণ্ডিত কপিলেশ্বর মিশ্র অধ্যাপনা করতেন। টোলের অনাড়ম্বর শিক্ষাপদ্ধতি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। শান্তিনিকেতনের প্রাত্যহিক সমবেত উপাসনা এবং উৎসবাদির প্রারম্ভে বেদ ও উপনিষদের মন্ত্র গান করার প্রথা তিনি প্রবর্তন করেন। ১৯৪০ খৃস্টাব্দের ৭ই আগস্ট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে সম্মানাত্মক "ডি-লিট্" উপাধিপ্রাপ্তিকালে তিনি প্রতিভাষণ দিয়েছিলেন অনবদ্য সংস্কৃতে।—

"ভবন্ত উক্ষতীর্থ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিভুবঃ।

এযোঽস্মি কশ্চিৎ কবির্ভারতবর্ষস্য।

তং মাং সম্ভাবয়ন্তী সা কিল ভবতাং প্রজ্ঞা বিদ্যাভূমির্নূনমাত্মনো মানবধর্মাম্নায়মেব মহান্তমাবিষ্কর্তুম্ ঈহতে যস্য খলর্থঃ সাম্প্রতম্ অতিতরাং গম্ভীরশ্চ অনতিপাত্যশ্চ সংবৃত্তঃ। গর্বোত্তানং মে চিত্তং প্রতিপদ্য অস্য বাচিকং প্রতিপত্তিং চৈতাং প্রহিতাং প্রতীকমিব অনশ্বরং মানবধর্মাত্মনঃ। সভাজয়ামি ভবতোত্র শান্তিনিকেতনে। যদ্ এতদ্ অনর্ঘম্ উপায়নম্ আনীতং ভবদ্ভির্মদর্থং মদ্দেশার্থঞ্চ, চিরং তদ্ অবস্থাস্যতে অস্মদ্ হৃদয়েষু, সম্পৎস্যতে চ তদ্ ভবতাম্ অস্মাকঞ্চ সাধারণ সংস্কৃতিসম্পত্তয় ইতি প্রতিযন্তু ভবন্তঃ।

স খল্বয়ং কালঃ প্রবর্ধতে যন্ত্রাঙ্কঃ, তিরোধত্তে গুণঃ। প্রসরতি অশিষ্টত্বং নিরংকুশম্। প্রবর্ততে চ পশুচিতা স্পৃহা ভোগে সমুপচীয়মানা ভূতবিদ্যয়া।

অস্মিন্ হি ব্যতিকরে কস্যাপি ভুবনব্যাপিনঃ সম্বন্ধস্য বীজসমুদ্গমোক্তির্নাম কদাচিৎ কবিজনোচিতেব প্রতীয়তে। তথাপি তু সংযম্যতে কালস্তর্জয়ন্নপি

নিরন্তরম্। কিন্তু যে নাম বয়ং অতীত্যাপি এনং জীবামঃ প্রতীমশ্চ যদার্থ-ধর্মশ্চরমার্থসম্পত্তয়ে বর্ধেতৈব নিত্যমিতি তৈরস্মাভিঃ সেয়ং প্রতীতিরবশ্যং প্রত্যগ্রীকরণীয়া।

ক্ষেমং বতেদং নিমিত্তং কস্যাপি অনাগতস্য সময়স্যেতি প্রতিগৃহ্যতে ময়া এষা প্রতিপত্তির্বিহিতা উৎকতীর্থবিশ্ববিদ্যালয়েন। নূনং ন জীবিস্যামি অহম্ অবলোকয়িতুম্ এনং প্রতিষ্ঠিতম্।

সভাজনীয়স্তু এষ তস্য সপ্রণয়ঃ সংকেতঃ সঙ্গর ইব দিবসানাং প্রশস্যতরাণামিতি শিবম্॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ"

শান্তিনিকেতনম্

শকাব্দা ১৮৬১।৪।২২

তাঁর সংস্কৃতপ্রীতি ও জ্ঞানের কথা জেনে ইটালীর বিদগ্ধমণ্ডলী ১৯২৬ খৃস্টাব্দে জুন মাসে সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে কবিকে সেখানে স্বাগত ও বিদায়-সম্ভাষণ জানান। সংস্কৃত শেখাবার জন্য তিনি নিজে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন "সংস্কৃতপাঠঃ"। বিশ্বভারতীর মর্মাদর্শ সংস্কৃত ভাষাতেই কবি প্রকাশ করেছেন—"অথেয়ং বিশ্বভারতী, যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্" ···ইত্যাদি। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর কলকাতা সংস্কৃত কলেজে বাংলার সংস্কৃত পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁকে "কবি সার্বভৌম" উপাধিতে ভূষিত করলে তিনি তাঁর প্রতিভাষণে সংস্কৃত ভাষারই অমৃত উৎস থেকে বাংলা ভাষার শক্তিলাভের কথা ঘোষণা করেন। ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়ে সংস্কৃত মহাভারতের আখ্যানাংশকে "কুরুপাণ্ডব" নামে সংকলিত করিয়ে তার ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন—

"আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তিকাল হইতেই সংস্কৃত ভাষার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, একথা বলা বাহুল্য। এই কারণে যে-বাংলা-রচনারীতি বিশেষভাবে সংস্কৃত ভাষার প্রভাবান্বিত, তাহাকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে বাংলা ভাষায় ছাত্রদের অধিকার সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না, ইহাতে সন্দেহ নেই।"

এইভাবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতানুশীলনের গুরুত্বের কথা সর্বদাই স্বীকার করে গেছেন। ফলে, তাঁর কাব্যসাধনায় ভারতীয় সভ্যতার শাশ্বত রসধ্বনিই মর্মরিত হয়ে উঠেছে। তাই, প্রতীচ্য জগৎ সংস্কৃতাশ্রিত ভারতীয়-সাধনার প্রমূর্ত বিগ্রহ রূপেই রবীন্দ্রনাথকে বন্দনা করেছে। তাঁর সপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মনীষী Stein Konow-র শ্রদ্ধাঞ্জলিটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

"It was an Indian poet who at last opened the eyes of the West. Through William Jones' translation of Kalidasa's

Sakuntala Europe came to know something about India's soul, about the ideals, the aims, and the aspirations of the people of India. And this led to a keen interest in India, her history and civilization.

It was, however, chiefly ancient India which attracted the interests of the West. Kalidas was the poet, and the ancient seers and thinkers were the last and noblest product of India' genius.

Even to day when modern Indians come to play a role in the spiritual development of the West, it was chiefly as interpreters of the wisdom of the past that they were greeted and admired.

Then came the day when another Indian poet conquered the West. This time it was not one of by gone times, but one who lived and sung in modern India, whose tune was that of the Indian landscape, the Indian river, the Indian forest and the Indian village of to-day.

Again the West lisienend and marvelled. It found the same authentie beauty, the same sublime flight of thought as in Kalidasa's immortal works : the old spirit was still alive"

(The Golden Book of Tagore P. 130)

সে যুগের অপর মনীষী স্বামী বিবেকানন্দেরো ছিল "বেদ" প্রচারে এবং "সংস্কৃত" শিক্ষায় গভীর আগ্রহ। শৈশবে মুগ্ধবোধের শ্লোক কণ্ঠস্থ করে তিনি শয্যাগ্রহণ করতেন। মৃত্যুর দিনও সকালে অসুস্থ অবস্থায় তিনি গুরুভাইদের পড়িয়েছেন পাণিনি। সংস্কৃত ভাষণে এবং রচনায় তিনি ছিলেন সুদক্ষ। সর্বজনীন শিক্ষায় সংস্কৃতকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেবার জন্য তিনি বহুবার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গেছেন। চিঠিপত্রও অনেক সময় তিনি সংস্কৃতেই লিখতেন। স্বরচিত স্তোত্রাবলী এবং পত্ররাজিতে তাঁর সংস্কৃত ভাষায় মৌলিক রচনা শক্তির দুর্লভ সাক্ষ্য বিদ্যমান। এই সম্বন্ধে স্বামীজীর রচনার দু-একটি নিদর্শন উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। অনবদ্য শ্লোকে তিনি পরমহংসদেবকে বন্দনা করছেন—

"আচণ্ডাল-প্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহো
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমো জানকীপ্রাণবন্ধো।
ভক্ত্যা জ্ঞানং কৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ ॥ ১

স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতম্বাহবোত্থং মহান্তং।
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোহয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্॥"

সুন্দর সংস্কৃতে তিনি শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে পত্র লিখছেন—

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

শুভমস্তু। আশীর্বাদপ্রেমালিঙ্গন-পূর্বকমিদং ভবতু তব প্রীতয়ে। পাঞ্চভৌতিকং মে পিঞ্জরমধুনা কিঞ্চিৎ সুস্থতরম্। অচলগুরোর্হিমনিমণ্ডিত-শিখরাণি পুনরুজ্জীবয়ন্তি মৃতপ্রায়ানপি জনান্ ইতি মন্যে। শ্রমবাধাহপি কথঞ্চিৎ দূরীভূতা ইত্যনুভবামি।⋯⋯ভব চিরাধিষ্ঠিত ওর্জাস। বীরাণামেব করতলগতা মুক্তির্নৈব কাপুরুষাণাম্। হে বীরাঃ, বদ্ধপরিকরাঃ ভবত। সম্মুখে শত্রবো মহামোহরূপাঃ। অগ্রগাঃ ভবন্তু অগ্রগাঃ, হে বীরাঃ, মোচয়িতুং পাশং বদ্ধানাং, শ্লথয়িতুং ক্লেশভারং দীনানাং, দ্যোতয়িতুম্ হৃদয়ান্ধকূপম্ অজ্ঞানাম্ অভীরভীতি ঘোষয়তি বেদান্তডিণ্ডিমঃ। ভূয়াৎ স ভেদায় হৃদয়গ্রন্থীনাং সর্বেষাং জগন্নিবাসিনামিতি।

—তবৈকান্ত-শুভভাবুকঃ বিবেকানন্দঃ
(পত্রাবলী ২ - ১০০)

স্থিতধী ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন সে যুগে বংকিমচন্দ্র—হেমচন্দ্র প্রমুখ মনীষীর গুরুস্থানীয় যূথপতি। ইংরেজী বিদ্যায় নিষ্ণাত এবং ইংরেজী শিক্ষা-ব্যবস্থার তৎকালীন নিয়ামক এই মনীষী (প্রথম ভারতীয় ডি-পি-আই) তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ উৎসর্গ করে যান শুধু সংস্কৃত শিক্ষার জন্য। বিশ্বনাথ ট্রাস্ট্ ফাণ্ড্, বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী তাঁরই দানে এখনো পরিচালিত হচ্ছে। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয় বিদ্যায় তিনি ছিলেন সুনিষ্ণাত। সমাজ-শাস্ত্রী ভূদেবের "সামাজিক প্রবন্ধের" সমালোচনা করে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ১৮৯৩ সনের বার্ষিক অধিবেশনে তৎকালীন লেফ্ট্যানেণ্ট গবর্নর Sir Charles Elliot বলেছিলেন—

'Not a single volume in India contains so much wisdom and none shows such extensive reading. It is the result of the life-long study of a brahmin of the old class in the formation of whose mind the Eastern and Western philosophy have had an equal share.

অজ্ঞতাবশতঃ আজকাল ভূদেবকে কেউ কেউ প্রগতিবিমুখ মনে করলেও বিনয়কুমার সরকারের মতো খাঁটি প্রগতিবাদী মনীষীর ভূদেব সম্বন্ধে অভিমত প্রণিধানযোগ্য—

"ভূদেবের সঙ্গে আমার প্রাণে প্রাণে মিল আছে। তাঁকে আমি খাঁটি

স্বদেশসেবক, স্বাধীনতার পূজারী, স্বরাজসাধক বিবেচনা করি। ভূদেব চিরকাল আমার প্রণম্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে কোন বাঙালীর পক্ষে যতদূর চরমপন্থী হওয়া সম্ভব ভূদেব প্রায় ততদূর গিয়েছিলেন। বিবেকানন্দকেও আমি ভূদেবের কোঠায় ফেলি। সেই যুগের কোন বঙ্গসন্তানকে এই দুজনের চেয়ে বড় বিবেচনা করা আজও আমার পক্ষে অসম্ভব। এই দুজনই আমার সমানভাবে পূজাস্থান।

—বিনয় সরকারের বৈঠকে—২য়-৬৮।

এমন প্রগতিবাদী দূরদর্শী ভূদেবের সংস্কৃত জ্ঞান এবং সংস্কৃত প্রসারের আগ্রহ চিরস্মরণীয়। তিনি প্রায়ই সংস্কৃতেই পুত্রদের সঙ্গে পত্রালাপ করতেন। জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে "অধিভারতী" নামে অন্নদানরতা মাতৃরূপে তিনি বন্দনা করেছেন সংস্কৃতে।

"মাতর্নমামি ভবতীং সতীদেহরূপাং
মাতর্নমামি বসুধাতলপুণ্যতীর্থাম্।
মাতর্নমামি পদযুগ্মধৃতসমুদ্রাং
মাতর্নমামি হিমগৌরকিরীটভূষাম্॥

—হিন্দুকণ্ঠহার।

হেমাভা হরিদম্বরা পদতলে
নীলাম্বুলীলাঞ্চিতা
স্নিগ্ধা স্নিগ্ধতরংগিণী সুরধুনী
পীযূষনিঃষ্যন্দিনী।
সূর্যেন্দুপ্রতিবিম্বিতাম্বরলসৎ
প্রালেয়-মৌলিজ্বলা
সৌম্যা স্যাদ "ধিভারতী" ভয়হরা
নিত্যান্নদা শান্তয়ে॥"

—পুষ্পাঞ্জলি

বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতের বীজ এই স্তোত্রেই রয়েছে নিহিত। বঙ্কিমচন্দ্রেরও সংস্কৃতজ্ঞানের পরিচয় তাঁর "কৃষ্ণচরিত্র", "অনুশীলন" এবং সর্বোপরি "গীতার" অনুবাদে প্রকটিত। শেষজীবনে তো তিনি সংস্কৃত শাস্ত্র মন্থনেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

"Society for Higher Training of Young men"-এ ১৮৯৪ সনে তিনি "বেদের" ওপর দান করেন গবেষণাত্মক এক দীর্ঘ ভাষণ।

আই-সি-এস্ রমেশচন্দ্র দত্ত অনলস পরিশ্রমে সংস্কৃত শিখে অনুবাদ করেন সংস্কৃতের আদি প্রাপ্ত গ্রন্থ "ঋগেবদ", নয় খণ্ডে সম্পাদনা করেন "হিন্দুশাস্ত্র"। অপরিমেয় সংস্কৃত জ্ঞান এবং অসীম প্রীতি ভিন্ন এইসব দুরূহ কর্ম কখনো সম্ভব নয়। পদার্থবিজ্ঞানী আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বৈদিক সাহিত্য

সংগ্রহন করে রচনা করেন অনবদ্য গ্রন্থ "যজ্ঞকথা", অনুবাদ করেন "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ"।

সেকালের হিন্দুসমাজের বিখ্যাত নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব ছিলেন সংস্কৃতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক ও সংরক্ষক। বহু চতুষ্পাঠী স্থাপন করে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিপুল অর্থ ব্যয় করে চল্লিশ বৎসর ধরে অনলস অধ্যবসায়ে তিনি সম্পাদন করেন "শব্দকল্পদ্রুম" নামক বিশাল সংস্কৃত অভিধান। এই মহৎ সারস্বত কর্মের জন্য মহামনস্বী মোক্ষমূলার তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন।

"সারদামঙ্গলের" কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ছিলেন সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মতে "বিহারীলাল খুব ভাল সংস্কৃতজ্ঞ"। "পলাশীর যুদ্ধের" কবি নবীনচন্দ্র সেন "মার্কণ্ডেয় চণ্ডী" এবং "গীতার" পদ্যানুবাদ করেন। সংস্কৃত মহাভারতের অনুসরণে "রৈবতক" "কুরুক্ষেত্র" "প্রভাস" মহাকাব্যত্রয় তিনি রচনা করেন। সংস্কৃতজ্ঞ, সেকালের একমাত্র তিব্বতবিশেষজ্ঞ শরৎচন্দ্র দাসের ভ্রাতা নবীনচন্দ্র দাস সংস্কৃত মহাকাব্যাবলীর বাংলা পদ্যে অনুবাদ করে "চট্টলধর্মমণ্ডলী"র দ্বারা "বিদ্যাপতি" উপাধিতে ভূষিত হন। সেকালের শিক্ষানেতা এবং সমাজ-সংস্কারক রাজনারায়ণ বসুরও সংস্কৃতজ্ঞান লক্ষণীয়। সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা সুবিদিত।

পুরাতাত্ত্বিক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন সংস্কৃতে প্রগাঢ় পণ্ডিত। চৈতন্যচন্দ্রোদয়, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, অগ্নিপুরাণ, গোপথ ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য, ললিতবিস্তর, বায়ুপুরাণ, নীতিসার, বৃহদ্দেবতা প্রভৃতি দুরূহ সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেন। সংস্কৃতজ্ঞ এই মনীষী ছিলেন বাংলা দেশে প্রাচ্যতত্ত্বগবেষণার অন্যতম পুরোধা।

আর এক তরুণ মনীষী রাজা কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর "বিদ্যোৎসাহিনী" রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয় করান সংস্কৃত নাটক "বেণীসংহারের" অনুবাদ। স্বয়ং অনুবাদ করেন গীতা, বিক্রমোর্বশীয়ম্ এবং মালতীমাধবম্। সংস্কৃত মূল মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদ করিয়ে তিনি অতুলনীয় কীর্তি স্থাপন করে গেছেন।

যে-সকল ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী মনীষী সে যুগে আমাদের দেশে নব-জাগরণের নায়ক ছিলেন তাঁদের কয়েকজনের সংস্কৃত জ্ঞান ও প্রীতির কথা উল্লিখিত হ'ল। এছাড়া ইংরেজীবিদ্যায় অপ্রবিষ্ট, সনাতন ধারায় শিক্ষিত সংস্কৃত পণ্ডিতমণ্ডলীর এক বিরাট গোষ্ঠী সেদিন আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ সমুন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের ক্ষুরধার মনীষা এবং অনন্য-সাধারণ অবদানের কথা আমরা প্রায় বিস্মৃত হয়ে গেছি। বিশেষতঃ, সেদিন বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন

ফোর্ট উইলিয়াম এবং সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক। এই পণ্ডিত-মণ্ডলীর সাধনার কথা বিস্মৃত হ'লে অকৃতজ্ঞতাজনিত অপরাধ হবে।

যুগন্ধর মনস্বী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেশের বহুবিধ কল্যাণকর্মের প্রবর্তক হ'লেও মূলতঃ ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত। সংস্কৃত কলেজের টোলে প্রথমে শিক্ষাগ্রহণ এবং পরে অধ্যক্ষের ও বিভাগীয় বিদ্যালয়-পরিদর্শকের গুরুভার সম্পাদনে তাঁর প্রতিভার অনন্যসাধারণ বিকাশ। সংস্কৃত শিক্ষার পুনর্বিন্যাসের দ্বারা সংস্কৃত কলেজে তিনি যুগান্তর সৃষ্টি করেন। আপামর জনসাধারণের কাছে সংস্কৃতকে সহজ করে তোলার জন্য তিনি রচনা করেন উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ-কৌমুদী। ইংরেজীশিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে সংস্কৃতশিক্ষার এই সহজ উপায় আবিষ্কার করে তিনি দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। আজ পর্যন্ত বাংলা দেশে ঐ ব্যাকরণ কৌমুদীর সাহায্যেই অল্প সময়ে স্কুল-কলেজে সর্বজনীনভাবে সংস্কৃতশিক্ষা দান করা হচ্ছে। সংস্কৃত-শিক্ষাকে সরল করার এ তাঁর অতুলনীয় কীর্তি। সংস্কৃত সাহিত্যকে অবলম্বন করে তিনি সম্পাদনা ও রচনা করেন যথাক্রমে ১২টি ও ৩৭টি বিখ্যাত গ্রন্থ। সংস্কৃতে রচনাশক্তি শৈশব হতেই তাঁর অনন্যসাধারণ। এমন কি ভূগোলের ওপরও তিনি সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনা করেন—'ভূগোল-খগোল-বর্ণনম্'।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খৃষ্টধর্ম অবলম্বন ক'রেও সংস্কৃত-চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। বহু সংস্কৃতগ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেন। খৃষ্টান, প্রথম বাঙালী মহিলা কবি, তরু দত্ত, যিনি ইংরেজী ভাষায় কবিতা রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তিনিও সংস্কৃতে ছিলেন সুশিক্ষিতা। ভাগবতের বহু কাহিনী অবলম্বন করে তিনি রচনা করেন সুন্দর সুন্দর ইংরেজী কবিতা।

অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকে বঙ্গদেশে বহু সহস্র সংস্কৃত বিদ্যালয় বিদ্যমান থাকলেও কতগুলি বিশেষ বিশেষ স্থান সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্রতীর্থে পরিণত হয়েছিল। সেই সব বিদ্যাপীঠে ভারতের নানা প্রান্ত হ'তে জ্ঞানভিক্ষু বিদ্যার্থীর দল সমবেত হ'ত। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য নিয়ে সেই সব স্থানে এক একটি বিখ্যাত বিদ্যাসমাজ গড়ে উঠেছিল। নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, ভট্টপল্লী, চট্টল, কোটালীপাড়া, ত্রিবেণী, হরিণাভি, হালিশহর প্রভৃতি স্থানে পরম্পরা-ক্রমে পণ্ডিতমণ্ডলী অধ্যাপনায় মগ্ন থাকতেন। বিদেশাগত শত শত বিদ্যার্থীর পাঠ-ধ্বনিতে মুখরিত থাক্‌তো সেখানকার আকাশ-বাতাস। বাঙালী মনীষার শ্রেষ্ঠ দান নব্যন্যায়ের চর্চায় বাংলার পণ্ডিতমণ্ডলী সেদিনো ছিলেন জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দর্শন, স্মৃতি, অলঙ্কার এবং কাব্যের অসংখ্য নূতন নূতন টীকা এবং মৌলিক গ্রন্থ সেদিন রচিত হয়েছিল। অতি আধুনিক বিষয় ক্যাল্‌কুলাসের ওপর সেদিন সংস্কৃতে রচিত হয়েছিল "চলনকলনম্" নামে গ্রন্থ, স্ট্যাটিস্টিক্স্‌-এর ওপর "স্থিতি-বিজ্ঞানম্", ডিনামিক্স-এর ওপর "গতি-বিজ্ঞানম্"

পরে এ্যানাটমির ওপর "প্রত্যঙ্গশারীরম্" সংস্কৃতেই রচিত হয়েছিল। সংস্কৃত-ভাষায় সৃষ্টির অব্যাহত ধারা সেদিন যথেষ্ট বেগবতী ছিল।

বিগত তিন শতাব্দীতে ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মতো সুদীর্ঘজীবী পণ্ডিত-প্রকাণ্ড আর জন্মগ্রহণ করেন্‌নি। বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। নব্বুই বৎসর ধরে নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাপনা করে ১১৩ বৎসর বয়সে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। জগতের সারস্বত ইতিহাসে এতো দীর্ঘকাল ধরে অধ্যাপনার বিস্ময়কর ব্যাপার আর কারও জীবনে ঘটেনি। যৌবনে রচনা করেন "রামচরিতম্" নাটক। জীবন-সায়াহ্নে ৯৮ বৎসর বয়সে স্যার্ উইলিয়াম্ জোন্সের অনুরোধে ভারতীয় ব্যবহারশাস্ত্র নিয়ে রচনা করেন "বিবাদভঙ্গার্ণব' নামক সুবিশাল গ্রন্থ। এই গ্রন্থের সিদ্ধান্ত অনুসারেই বৃটিশ ভারতে হিন্দু-আইন ঘটিত বিচার নিষ্পন্ন হ'ত। বাঙালীর সংস্কৃত প্রতিভার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই মহাগ্রন্থ। ৯৮ বৎসরের পরিপক্ক বার্ধক্যে দুরূহ বিষয় নিয়ে নূতন গবেষণা-গ্রন্থ রচনার মানসিক উৎসাহ ও সামর্থ্য পৃথিবীর আর কারো কখনো হয়েছিল কি না জানি না। রাজা রামমোহন, লর্ড কর্নওয়ালিশ, স্যার্ উইলিয়াম্ জোন্স্, রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ মনস্বিবর্গ এই মনীষীকে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে ঘোষণা করে গেছেন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় সরকারী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হ'ল সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশে। গোলদীঘির তীরে হিন্দু কলেজ এবং সংস্কৃত কলেজ—এই দুইটি সারস্বত কেন্দ্রই ছিল সেকালে বাংলার নবীন মনীষার উৎসতীর্থ। সংস্কৃত কলেজে বাংলার দিক্‌পাল পণ্ডিতগণ অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হ'তেন। আর, তাঁদের হাতে গড়া ছাত্রেরা কালক্রমে কীর্তিমান পণ্ডিতে পরিণত হ'য়ে দেশোন্নতির সৈনাপত্য গ্রহণ করেন। এই সংস্কৃত কলেজের ছাত্র এবং অধ্যাপকদের মনীষায় বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর সারস্বত জীবন ভাস্বর হয়ে আছে। নব-জাগরণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন অগ্রনায়কের ভূমিকা। মৌলিক সংস্কৃত সাহিত্য সৃষ্টিতে, সমাজ সংস্কারে, বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তনে এবং সংবাদপত্র পরিচালনায় এই সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা অনেকেই ছিলেন অগ্রণী। বিহারীলাল চক্রবর্তী, শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রামগতি ন্যায়রত্ন, মদনমোহন তর্কালংকার, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামকমল ভট্টাচার্য, মধুসূদন গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, লালমোহন বিদ্যানিধি, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সংস্কৃত কলেজেরই বরেণ্য বিদ্যার্থী আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেখে গেছেন তাঁদের অবিনশ্বর স্বাক্ষর।

প্রথমে কোলব্রুক ও পাদরী কেরীর পণ্ডিত, পরে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালংকার ছিলেন সে যুগের অন্যতম বরেণ্য পুরুষ। বাংলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় লেখনী চালনায় তিনি ছিলেন

সব্যসাচী। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে-জে সি-মার্শম্যানের নেতৃত্বে "সমাচার দর্পণ" পত্রিকা প্রকাশিত হ'লে, সেই পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের প্রধান ছিলেন এই সংস্কৃত পণ্ডিত।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য "পুরাতন প্রসঙ্গে" তাঁর সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছেন। বাংলার সত্যিকারের গণসাহিত্য কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের তিনিই সংস্কারসাধন করেছিলেন। আশু শ্লোক রচনায়ও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। মেকলে-প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সংস্কৃত কলেজ তুলে দেবার চেষ্টা করায় কলেজের পরম হিতৈষী হোরেস্ হেম্যান্ উইল্সন্কে তিনি ইংলণ্ডে পত্রযোগে কলেজরক্ষার জন্য সচেষ্ট হ'তে অনুরোধ জানান। পত্রটি রচিত হয়েছিল সুমধুর সংস্কৃত শ্লোকে —

"অস্মিন্ সংস্কৃতপাঠ-পদম্-সরসি
ত্বংস্থাপিতা যে সুধী—
হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতাঃ
দূরংগতে তে ত্বয়ি।
তত্তীরে নিবসন্তি সংপ্রতি
পুনর্ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে
তেভ্যস্তান্ যদি পাসি পালক
তদা কীর্তিশ্চিরং স্থাস্যতি॥"

"এই সংস্কৃত বিদ্যায়তনটি যেন একটি সরোবর। তাতে আপনি যে অধ্যাপকদের নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁরা যেন সব হংস। আপনি দূরে চলে যাওয়ায় তাঁরা আজ নিরাশ্রয়। এখন সেই সরোবরের তীরে কয়েকজন ব্যাধ এসে বাসা বেঁধেছে। তারা সেই হংসগুলিকে ধ্বংস করতে উদ্যত। আপনি যদি তাদের রক্ষা করেন, তাহলে আপনার কীর্তি অবিনশ্বর হয়ে থাকবে।"

এই সংস্কৃত কলেজেরই আর এক মহাপণ্ডিত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ। দর্শন এবং সাহিত্যে ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, সুললিত শ্লোক রচনায় ছিল অসাধারণ নৈপুণ্য। বাংলা সাহিত্যের চর্চায়ও তিনি ছিলেন অগ্রণী পুরুষ। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব। গুপ্তকবি ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী "সংবাদপ্রভাকর" সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এই "সংবাদপ্রভাকরের" শিরোদেশে যে দুটি সুন্দর শ্লোক শোভা পেতো, সে দুটি প্রেমচন্দ্রই রচনা করে দিয়েছিলেন—

"সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ
সদৈব সর্বেষু সমপ্রভাকরঃ।
উদেতি ভাস্বৎ-সকলা-প্রভাকরঃ
সদর্থ-সংবাদ-নবপ্রভাকরঃ ॥১

নষ্টং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু ক্বচিদ্
ভ্রামং ভ্রামমতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ।
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর-করপ্রোদ্ভিন্ন-পদ্মোদরে
স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরাঃ স্বান্তদ্বিরেফা রসম্ ॥

"সংবাদ প্রভাকরে" তাঁর রচিত বহু বাংলা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। গৌরী-শঙ্কর তর্কবাগীশ সম্পাদিত "সংবাদভাস্কর" পত্রেরও কণ্ঠদেশে এই প্রেমচন্দ্রেরই রচিত আর একটি শ্লোক মুদ্রিত হ'ত—

"ভ্রাতর্বোধসরোজ কিং চিরয়সে মৌনস্য নায়ং ক্ষণো
দোষধ্বান্তদিগন্তরং ব্রজ ন তেঽবস্থানমত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরাদ্—
গৌরীশঙ্করপূর্বপর্বতমুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ ॥"

"কলিকাতা বার্তাবহ" সংবাদপত্রেরও শিরোভাগে "কিং চান্দ্রী বিশদপ্রভা কিমথবা প্রাভাকরী চাতুরী—" দিয়ে যে শ্লোকটি শোভা পেতো, সেটিও প্রেমচন্দ্রের রচনা। মেকলে-প্রমুখের সংস্কৃত কলেজ তুলে দেবার প্রয়াসে প্রেমচন্দ্রও জয়গোপাল তর্কালংকারের মতো বিলাতে উইলসনকে শ্লোকে পত্র লেখেন—

"গোলশ্রীদীর্ঘিকায়াঃ বহুবিটপিতটে
কোলিকাতানগর্য্যাং
নিঃসংগো বর্ততে সংস্কৃতপঠনগৃহাখ্যঃ
কুরংগঃ কৃশাংগঃ।
হন্তুং তং ভীতচিত্তং বিধৃতখরশরো
মেকলে ব্যাধরাজঃ
সাশ্রু ব্রূতে স ভো ভো উইলসন্-মহাভাগ
মাং রক্ষ রক্ষ ॥"

"কলকাতা শহরে তরুচ্ছায়া সমাকীর্ণ গোলদীঘির তীরে সংস্কৃত কলেজ নামে কৃশ হরিণটি নিঃসংগ হয়ে আছে। সম্প্রতি, মেকলে নামক ব্যাধরাজ তীক্ষ্ম বাণের দ্বারা ভীত সেই হরিণটিকে বিদ্ধ করতে চাইছেন। ফলে হরিণটি অশ্রুপূর্ণ নয়নে আকুতি জানাচ্ছে— হে মহাভাগ উইলসন্ আমায় আপনি রক্ষা করুন, বাঁচান।"

মহামনা উইলসন্ও শ্লোকেই যে উত্তরটি দিয়েছিলেন, সেটিও বেশ প্রণিধানযোগ্য—

"নিষ্পিষ্টাঽপি পরং পদাহতিশতৈঃ শশ্বদ্ বহুপ্রাণিনাং
সন্তপ্তাঽপি করৈঃ সহস্রকিরণেনানিগ্রস্ফুলিংগোপমৈঃ।
ছাগাদ্যৈশ্চ বিচর্বিতাপি সততং মৃষ্টাপি কুদ্দালকৈঃ।
দূর্বা ন ম্রিয়তে কৃশাপি নিতরাং ধাতুর্দয়া দুর্বলে ॥"

"সর্বদাই বহু প্রাণীর পদাঘাতে নিষ্পিষ্ট, সূর্যের অগ্নিস্ফুলিংগের মতো তপ্তকিরণে সন্তপ্ত ; ছাগলের দ্বারা চর্বিত এবং কোদালের দ্বারা আহত হয়েও দূর্বা কখনো মরে না। দুর্বলের প্রতি রয়েছে বিধাতার অসীম করুণা।"

প্রেমচন্দ্রের সম্পাদিত এবং রচিত গ্রন্থাবলী হচ্ছে রঘুবংশের টীকা, নৈষধ চরিত, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, রাঘবপাণ্ডবীয়ম্, সপ্তশতীসার, মুকুন্দমুক্তাবলী, চাটুপুষ্পাঞ্জলি, অনর্ঘরাঘবম্, উত্তররামচরিতম্, কুমারসম্ভবম্, কাব্যাদর্শ এবং সমস্যাকল্পলতা।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি সে যুগে বহুমুখী প্রতিভার এক অনন্যসাধারণ অধিকারী। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য "পুরাতন প্রসঙ্গে" তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন…"তারানাথ তর্কবাচস্পতি একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন। সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী এরূপ আর কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ।"

বহুশাস্ত্রজ্ঞ, বহু গ্রন্থের রচয়িতা, সংস্কৃত কলেজের কীর্তিমান অধ্যাপক তারানাথ ছিলেন ক্ষুরধার মেধা ও অদম্য কর্মশক্তির প্রমূর্ত বিগ্রহ। লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়েরই আরাধনায় তিনি আপ্তকাম। শাস্ত্রবিচারে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, দানে ছিলেন মুক্তহস্ত, অধ্যাপনায় ছিলেন অসাধারণ দক্ষ। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার পর স্বগৃহেও Free Sanskrit College প্রতিষ্ঠা ক'রে শত শত বিদ্যার্থীকে তিনি অকাতরে অন্নদান ও বিদ্যাদান করতেন। বহু প্রয়োজনীয় গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন, রচনা করেন অনেক মৌলিক গ্রন্থ। শব্দার্থরত্ন, গয়ামাহাত্ম্য, তুলাদানপদ্ধতি প্রভৃতি তাঁরই রচনা। শব্দস্তোমমহানিধি এবং বাচস্পত্যাভিধান নামক বিখ্যাত অভিধান দুটি তাঁরই অনন্যসাধারণ কীর্তি। আবার চাউল, ঘৃত এবং কাশ্মীরী শালের বিরাট ব্যবসায় তাঁর ছিল। পরিণত বয়সে গুদামে তাঁর এক লক্ষ টাকার কাশ্মীরী শাল উইপোকায় কেটে নষ্ট করায় তিনি আর্থিক সংকটে পড়েন। সেই অর্থসংকট কাটানোর জন্য তিনি রচনা করেন "বাচস্পত্যাভিধান"। এই গ্রন্থের আয়ে তাঁর অর্থসংকট কেটে যায়। পথে হাঁটিতে হাঁটতে তিনি অভিধানের প্রুফ্ দেখতেন এবং অনুসরণকারী ছাত্রদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেন। বাণিজ্যবিমুখ অলস বাঙালীর মধ্যে কর্মনিষ্ঠার ও জ্ঞান-সাধনার এ এক জ্বলন্ত নিদর্শন।

অসাধারণ নৈয়ায়িক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ছিলেন সংস্কৃত কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ছিলেন তাঁর অতি প্রিয় ছাত্র। শিশুর মত সরল, নিরভিমান, প্রশান্তচিত্ত অথচ এমন পণ্ডিত-প্রকাণ্ড সর্বযুগেই বিরল। মুক্ত বুদ্ধিতে পাশ্চাত্ত্য দর্শনেরও গ্রহণযোগ্য মতবাদগুলি গ্রহণ করতে তাঁর কোন কুণ্ঠা ছিল না। "শঙ্কর-বিজয়" এবং "পদার্থ-তত্ত্বসার" তাঁর রচিত দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ। প্রথমটিতে তাঁর প্রিয় ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন এবং দ্বিতীয়টিতে সংক্ষেপে তাঁর আত্মজীবনীও দিয়েছেন। এছাড়া আত্মতত্ত্ববিবেক,

কণাদসূত্রবিবৃতিঃ, সর্বদর্শনসংগ্রহঃ, ন্যায়দর্শনম্, নীরাজন-প্রকাশঃ, সুরসংক্রম-দীপিকা, ভৈরবপঞ্চাশিকা, তারকেশস্তবঃ, বচঃপুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ তাঁরই লেখনী-প্রসূত।

সে যুগের বিখ্যাত স্মার্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি প্রথমে "ল" পরীক্ষা কমিটির পণ্ডিত, পরে সারণ ও বর্ধমানের জজপণ্ডিত এবং পরিশেষে সংস্কৃত কলেজে স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। অত্যন্ত কৌতুকপ্রিয় অথচ অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন তিনি। দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা, বিষ্ণ্বাদিশতক, দত্তকচন্দ্রিকা, মনুসংহিতা, দত্তকশিরোমণি, স্মৃতিচন্দ্রিকা, চতুর্বর্গচিন্তামণি, এতদ্দেশীয় শুদ্ধিতত্ত্বাদি স্মৃতিসম্মত অশৌচ ব্যবস্থা প্রভৃতি তাঁরই রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ। হাইকোর্টের বিচারকগণ তাঁর অভিমত অনুসারেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা মহামনীষী স্যার উইলিয়াম্ জোন্স্ এঁর কাছে অনেকদিন সংস্কৃতের দুরূহ গ্রন্থাবলী নিয়মপূর্বক পাঠ করেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিখ্যাত মনীষী ই বি কাউল পূর্বোক্ত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি এবং তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে সংস্কৃত কলেজের চারটি স্তম্ভরূপে বর্ণনা করে একটি সুন্দর শ্লোক রচনা করেন—

"শ্রীতর্কবাগীশস্তর্কপঞ্চাননশিরোমণিঃ।
তর্কবাচস্পতিঃ শ্রীমানিতি স্তম্ভচতুষ্টয়ম্॥

সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ "সোমপ্রকাশ" পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। এই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমূর্ধন্য সংবাদপত্রকে রাজনীতির ও সমাজ-সংস্কারনীতির নির্ভরযোগ্য বাহনে পরিণত করেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে জনসাধারণের চেতনা নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে তিনি উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। সুকবি প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদনা করেছিলেন "সমাচার-চন্দ্রিকা" পত্রিকা। কুসুমরহস্য, ধর্মসভাবিলাস চম্পূকাব্য, শ্রীশ্রীশিবশতকস্তোত্ররত্ন, শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাশতকম্ তাঁর রচিত গ্রন্থ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর উপর একবার রুষ্ট হ'লে তিনি তাঁকে এই শ্লোকটি লিখে পাঠান, যাতে বিদ্যাসাগর না হেসে থাকতে পারেন নি—

"মদ্বিধ-বহুবিধ-দুর্বিধদৈন্যে
জ্বলদনলস্তবং তৃণ ইব মন্যে।
কত ইহ শত শত যত নত এষা
ভবতি ভবতি লিপিরথ সবিশেষা॥
অহং তবৈবাস্মি নিদেশকারী
তথা তবৈবাস্মি মতানুসারী।

অন্যান্যতে কিন্তু বিপত্তিভারি
যথা তথাস্তাং ভরসা তোমারি ॥"

— সাহিত্য সংহিতা, জ্যৈষ্ঠ-১৩২৩।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সংস্কৃত কলেজেরই অধ্যাপক। বাংলাভাষায় তিনিই প্রথম অভিধান রচনা করেন। বিদ্যাসাগরের পূর্বেই তিনি বিধবাবিবাহের সমর্থক, আবার সহমরণেরও তিনি সমর্থনকারী।

সংস্কৃত পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ১৮৫৮ সনে সংস্কৃত কলেজে ছাত্র হিসেবে প্রবেশ করে ১৮৭২ সনে ঐ কলেজ থেকেই এম-এ পাস করে বের হন। কিছুদিন সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনাও করেন। "আর্যদর্শন" পত্রিকার সম্পাদক এবং ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনীকাররূপে বাংলা সাহিত্যে তিনি সুপরিচিত। বাংলার বিপ্লব-আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন এই দেশপ্রেমিক তেজস্বী ব্রাহ্মণ। স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাড়ীর সদর ঘরে ইঁটের ওপর লিখে দেন—১৯২৫ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। পরবর্তী কালে বিপ্লবীদের কাছে এই লেখাটির জন্যও বাড়ীটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল।

প্রথম বাঙালী শব-ব্যবচ্ছেদক মধুসূদন গুপ্ত সংস্কৃত কলেজেরই ছাত্র। তিনি হুপারের Anatomists Vade Mecum-এর সংস্কৃত অনুবাদ করে এক সহস্র মুদ্রা পুরস্কার লাভ করেন। তিনি বাংলা ভাষায় রচনা করেন "লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া" এবং "এনাটোমী অর্থাৎ শারীরবিদ্যা।" বিদ্যাসাগরের সহপাঠী সুকবি মদনমোহন তর্কালংকার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, ক্রমে জজ পণ্ডিত ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষায় অন্যতম অগ্রণী পুরুষ ছিলেন তিনি। রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা দেশে যে কয়জন কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, "বাসবদত্তার' কবি মদনমোহনের স্থান তাঁহাদের প্রায় পুরোভাগে ছিল।"

সংস্কৃত কলেজেরই ছাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম বিধবা বিবাহকারী এবং সমাজসংস্কারে অকুতোভয় পুরুষ। আদর্শনিষ্ঠ শিবনাথ শাস্ত্রী সংস্কৃত কলেজেরই ছাত্র, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষানেতা এবং সুলেখকরূপে সর্বজনবিদিত। "বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবের" রচয়িতা রামগতি ন্যায়রত্ন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। "সম্বন্ধনির্ণয়" এবং অলংকার শাস্ত্রের ওপর কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা লালমোহন বিদ্যানিধিও সংস্কৃত কলেজেরই অন্তেবাসী। "কাদম্বরীর" রচয়িতা তারাশঙ্কর তর্করত্ন সংস্কৃত কলেজেরই ছাত্র, পরে গ্রন্থাধ্যক্ষ। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান সর্বজনস্বীকৃত। উইলিয়াম কেরীর শিক্ষা-দাতা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার সংস্কৃতব্যাকরণ রচনা ও হিতোপদেশ প্রকাশ করেন। কেরীর বাংলা ভাষাবিষয়ক কার্যাবলীর তিনিই ছিলেন প্রধান সহায়ক।

বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক নাটক 'কুলীন-কুলসর্বস্বের' রচয়িতা রামনারায়ণ তর্করত্ন সংস্কৃত কলেজেরই ছাত্র ও পরে অধ্যাপক। সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষাতেই রচনায় তিনি সব্যসাচী। তাঁর মৃত্যুর পর "সোমপ্রকাশ" পত্রে প্রকাশিত হয়—

"বর্তমান সময়ে তাঁহার ন্যায় সংস্কৃত কবি আর কেহ ছিল না। তাঁহার প্রণীত "আর্যাশতক" ও "দক্ষযজ্ঞ" সর্বত্র বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। "দক্ষযজ্ঞ" প্রণয়ন করাতে ইংলণ্ডীয় মহাত্মা ই বি কাউয়েল ইঁহাকে "কবিকেশরী" উপাধি পাঠাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, সংস্কৃতভাষায় তাঁহার কবিত্বশক্তি এতদূর মধুর এবং গাঢ় ছিল যে তাঁহার নাম না থাকিলে কেহ তাঁহার প্রণীত কাব্যগুলি আধুনিক কবির রচিত বলিয়া অনুমান করিতে পারেন না। তাঁহার সংস্কৃত রচনা এতদূরে প্রাঞ্জল এবং অলংকারপূর্ণ যে তাঁহার আর্যাশতক এবং দক্ষযজ্ঞ সহসা কবিচূড়ামণি কালিদাসের রচিত বলিয়া ভ্রম হয়।"

—সোমপ্রকাশ, ১৯শে জানুয়ারী, ১৮৮৬ খৃঃ।

"জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকা প্রকাশ করেন সংস্কৃত পণ্ডিত গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। বিখ্যাত সাংবাদিক গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য নামেও তিনি ছিলেন পরিচিত। এই পত্রিকার শিরোভূষণ শ্লোকটি রচনা করেন রামনারায়ণ তর্করত্ন—

"এহি জ্ঞানমনুষ্যাণামজ্ঞানতিমিরং হর।
দয়া সত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপিসংহর॥"

সে যুগের প্রায় সকল পত্রিকারই শিরোভূষণ সংস্কৃতে থাকায় সাংবাদিকবর্গের সংস্কৃত জ্ঞান এবং প্রীতির কথা অনুমান করা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "সংবাদ সাধুরঞ্জন" পত্রেরও শিরোভূষণ ছিল সংস্কৃতে—

"প্রচণ্ড-পাষণ্ডতরুপ্রভঞ্জনঃ
সমস্ত-সল্লোক-মনোহনুরঞ্জনঃ।
সদাসদালোচনলোচনাঞ্জনঃ
প্রকাশতে সংপ্রতি সাধুরঞ্জনঃ॥"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত সংগীতের মাসিকপত্রিকা "বীণাবাদিনী"র শিরোভাগে থাকত—

"সাহিত্যসংগীতকলাবিহীনঃ
সাক্ষাৎপশুঃপুচ্ছবিষাণহীনঃ" আর—
"বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ রাগবিদ্যাবিশারদঃ
মূর্ছনাশ্রুতিসম্পন্নঃ মোক্ষমার্গঞ্চ গচ্ছতি।"

সংস্কৃত কলেজের প্রথম গ্রন্থাধ্যক্ষ লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালংকার ছিলেন বিরাট স্মার্ত। তিনি পরে জেলা আদালতে জজপণ্ডিতরূপে মুনসেফী, সদর আমিনী ও পাণ্ডিত্য তিন কাজই করতেন। ১৮৩০ সনে 'শাস্ত্রপ্রকাশ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র তিনি প্রকাশ করেন। তিনি রচনা ও সম্পাদনা করেন—(১)

দায়াধিকারিক্রম দত্তকৌমুদী (শ্লোক ও পর্যায়ে বঙ্গানুবাদ সহ) (২) মিতাক্ষরা দর্পণ, (৩) দায়ক্রম সংগ্রহ দায়তত্ত্ব ও ব্যবহারতত্ত্ব, (৩) দায়ভাগ, (৫) মিতাক্ষরা, (৬ হিতোপদেশ (বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদসহ), (৭) ব্যবস্থারত্নমালা, (৮) কবিকল্পদ্রুম, (৯) কবিরহস্যম্ এবং (১০) ব্যবহারবিচার শব্দাভিধান। শেষের গ্রন্থটি ব্যবহার বিচারোপযোগী পারস্য শব্দের সাধু গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদ।

কমলাকান্ত বিদ্যালংকার বিভিন্ন সময়ে সংস্কৃত কলেজে অলংকার, বেদান্ত এবং পুরাবৃত্তের অধ্যাপক ছিলেন। লিপিতত্ত্ববিশারদ জেম্স্ প্রিন্সেপের তিনি ছিলেন দক্ষিণহস্ত। এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রাচীন লিপির উদ্ধারকার্যে তিনি বহুদিন নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে এশিয়াটিক সোসাইটির ১৮৪৩ সনের ১৩ই নভেম্বরের **Proceedings**-এ লিখিত হয়েছে…

…**With him expired the accurate knowledge of the ancient Pali and Sanskrit forms of writing :…"**

পরবর্তী কালের ভারততত্ত্ব গবেষণার উপাদান সংগ্রহে তাঁর অসামান্য অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

চট্টলের যুগন্ধর পণ্ডিত, জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমন্বয় বিগ্রহ রজনীকান্ত সাহিত্যাচার্য কবি নবীনচন্দ্র সেন এবং তিব্বত-বিশেষজ্ঞ শরৎচন্দ্র দাসের সঙ্গে মিলিত হয়ে সংস্কৃত প্রচারে বহু কাজ করেন। বিদ্যাশতকম্, বিবুধবিনোদম্, চট্টলাবিলাপম্ (কবি নবীন সেনের মৃত্যুতে), মংগলোৎসবঃ, শিশুকণ্ঠহারঃ এবং আরো বহু গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। বাংলা ভাষায় প্রাণস্পর্শী সংগীত রচনায়ও তিনি ছিলেন সুদক্ষ। তিনি অক্লান্ত প্রয়াসে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন 'সংস্কৃত কলেজ' এবং 'ধর্মমণ্ডলী সভা।'

প্রথম মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন দীর্ঘকাল সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। মনীষা এবং কর্মশক্তির প্রোজ্জ্বল মূর্তি এই সংস্কৃত পণ্ডিত বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী। সংস্কৃত কলেজের বিবিধ সমুন্নয়ন, সংস্কৃত শিক্ষার নবরূপায়ণ, দর্শন, অলংকার এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের ওপর বহু গ্রন্থ প্রণয়ন, হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভায় অংশগ্রহণ, ন্যাশনাল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সংস্কৃতকে প্রবিষ্ট করানো, পঞ্জিকা সংস্কার প্রভৃতি বিবিধ কল্যাণকর্মে তাঁর অক্লান্ত প্রয়াস স্মরণীয় হয়ে আছে। কাউয়েল তাঁকে নিজের শিক্ষা-গুরুরূপে শ্রদ্ধা করতেন।

হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, বলদেব পালিত, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী বহু গ্রন্থের রচনা এবং সমাজের হিতসাধনে ছিলেন সদাই তৎপর।

এইভাবে দেখা যায় বাংলার নবজাগৃতির যুগে সংস্কৃত শিক্ষার স্রোতোধারা যথেষ্ট বেগবতী ছিল।

(ক) প্রথমতঃ, সমাজের মূর্ধন্য ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই ছিলেন সংস্কৃতে অধিগতবিদ্য।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী বাংলা ভাষার সমৃদ্ধিসাধনে, সমাজ সংস্কারে, সংবাদপত্র সম্পাদনে এবং স্বীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আত্মানুসন্ধানে জাতিকে বহুভাবে তখন প্রসংনীয় নেতৃত্ব দান করেছেন।

(গ) তৃতীয়তঃ এই শতকে বহু পাশ্চাত্ত্য মনীষী কর্মসূত্রে বাংলায় এসে সংস্কৃত ভাষার আশ্চর্য ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে সংস্কৃত পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে নিয়মপূর্বক সংস্কৃত শিখতে সুরু করেন। তাঁরাই বিশ্বে প্রাচ্যবিদ্যা এবং ভাষাতত্ত্ব অনুশীলনের পুরোধারূপে আজ বন্দিত। অনলস অধ্যয়নে এবং বিনম্র শ্রদ্ধায় তাঁরা যেভাবে সংস্কৃতের অনুশীলন করেছেন তারই ফলশ্রুতিতে আজ জগতের সর্বত্র সংস্কৃতের জয়যাত্রা।

বিশ্বের আর কোথায়ও কখনো বিজয়ী শাসকবর্গ বিজিতের সংস্কৃতির প্রতি এতো শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেনি। সংস্কৃতের আশ্চর্য আকর্ষণীয় শক্তিতেই এই ঐতিহাসিক অঘটন ঘটেছিল। জেম্‌স্ প্রিন্‌সেপ্, কোল্‌ব্রুক্, চার্ল্‌স্ উইল্‌কিন্‌স্ প্রমুখ মনীষীর যুগান্তকারী সারস্বতকীর্তি বিশ্ববন্দিত। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ই বি কাউয়েল বাংলা, বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষণে ও রচনায় ছিলেন সুদক্ষ। এই জ্ঞানতপস্বী, নিষ্ঠাবান খৃস্টান ভারতে এবং বিলাতে সংস্কৃত অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকতেন, সংস্কৃত পণ্ডিতমণ্ডলীকে সর্বদা শ্রদ্ধাপ্রদর্শনে থাকতেন উন্মুখ হয়ে। ১৮৯২ খৃস্টাব্দে লণ্ডনে "বিশ্ব প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে" তিনি ভাষণ দানকালে সংস্কৃতে শ্লোক রচনা ক'রে বলেন—

"পুরা প্রশান্তা ঋষয়ঃ সমাগমন্
বনেষু শান্তেষু ইতি কীর্ত্যতে স্মৃতিঃ।
ভবন্ত এবং ত্বধুনা সমাগতা
অদৃষ্টদোষান্ নগরে সমাকুলে ॥
—ইত্যাদি।

জীবনসায়াহ্নেও প্রাক্তন ছাত্র রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়কে বিলাত হ'তে তিনি শ্লোকে লিখিত পত্রে সংস্কৃত কলেজের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভুল্‌ছেন্ না—

"বিদ্যালয়ো নির্জরযৌবনঃ ক্ব
কাব্যং চ নিত্যামৃতভোগবর্ষি।
ক্বাহং চ জীর্ণো বলধীবিহীনো
নিঃসারতাং দেহভৃতাং ধিগেব।"
—৫ই এপ্রিল, ১৮৯২ খৃঃ।

সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি, এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, বহু ভাষাবিদ্, অসাধারণ মনস্বী স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্ সংস্কৃত চর্চার মাধ্যমে

বিশ্বে ভারততত্ত্বানুশীলনের ভগীরথ। মুক্তকণ্ঠে সেদিন তিনি ঘোষণা করে গেছেন—

'Sanskrit, it is of wonderful structure, re perfectmo than Greek, more copious than Latin and exquisitely refined than either.'

এঁদের প্রত্যেকের সংস্কৃত সাধনা নিয়ে এক একটি বিশাল গ্রন্থ রচিত হতে পারে। সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ, ঊনবিংশ শতকে বাংলায় সংস্কৃত শিক্ষার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা স্যার হোরেস্ হেমান্ উইলসন অনবদ্য সংস্কৃত শ্লোকে বলে গেছেন যে,—

"জানি না, সংস্কৃতের এমন কী মাধুর্য র'য়েছে। যাতে আমরা বিদেশীরাও সম্যগ্‌রূপে পাগল হ'য়ে যাচ্ছি। যতদিন ভারতবর্ষ থাকবে, যতদিন বিন্ধ্য এবং হিমালয় পর্বত থাকবে এবং যতদিন গংগা গোদাবরী প্রবাহিত হবে, ততদিন পর্যন্ত নিঃসন্দেহেই সংস্কৃত বেঁচে থাকবে"—

"ন জানে বিদ্যতে কিং তন্মাধুর্যমত্র সংস্কৃতে
সর্বদেব সমুন্মত্তো যেন বৈদেশিকা বয়ম্ ॥
যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাদ্ যাবদ্
বিন্ধ্য-হিমাচলৌ।
যাবদ্ গংগা চ গোদা চ
তাবদেব হি সংস্কৃতম্ ॥"

রাষ্ট্রভাষারূপে সংস্কৃত

জাতির এবং ব্যক্তির সর্বাংগীণ বিকাশের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বৈদেশিক শাসক সুশাসক হলেও জীবনের কতগুলি দিক পংগু থেকে যাবেই। তাই, পূর্ণ স্বাধীনতা এবং তার মাধ্যমে অনুকূল রাষ্ট্রশক্তির আকাংক্ষা করে থাকে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ। স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার স্বীকৃত হয়েছে আমাদের শাস্ত্রে এবং পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন শাস্ত্রকার। পরাধীন দেশে অনুষ্ঠিত ধর্মকর্মাদি নিষ্ফল হবে বলে বলা হ'য়েছে এবং দেশের বিপদে সংগ্রামী ক্ষত্রিয়দের সংগে মিলিত হ'য়ে যুদ্ধ করার জন্য তপস্বী ব্রাহ্মণদেরও নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছে। ধর্মসূত্রে বলা হ'চ্ছে—

"দেশভংগে প্রবাসে চ ব্যাধিষু ব্যসনেষু চ
রক্ষেদেব স্বদেশাদি পশ্চাদ্ধর্মং সমাচরেৎ ॥"

(আপস্তম্ব ধর্মসূত্র)

কেবলমাত্র স্বকীয় রাষ্ট্রের অধীনতাই স্বাধীনতা নয়। সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক,-স্বাধীনতার দুটো দিক। বর্তমানে আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা যদিও এসেছে, তবু সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এখনো আসেনি। সংস্কৃতি মানুষের সমষ্টিগত জীবনকে ধরে রাখে এবং বিভিন্নভাবে করে তার বৈচিত্র্যময় বিকাশ ও প্রকাশ। অন্তর-জীবন নিয়েই সংস্কৃতির কাজ। জাতির অন্তরংগ জীবনকে সংস্কার ক'রে সুন্দর করে তোলাই হ'ল সংস্কৃতির লক্ষ্য। অন্তর-জীবনের স্বাধীনতা তথা সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা যদি না আসে, তবে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বেশী দিন স্থায়ী হয় না। তাই, জাতিকে আত্মস্থ হ'তে হ'লে, পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে সর্বাগ্রে সাংস্কৃতিক দাসত্ব (Cultural Slavery) হ'তে মুক্ত হ'তে হবে। তখনই মানুষ কবিকণ্ঠে বলতে পারবে—

"মনের শিকল ছিঁড়েছি প'ড়েছে হাতের শিকলে টান।" (নজরুল)

তাই, আজকে জাতির সর্বাত্মক বিকাশের কথা ভাবতে হ'লে এবং তার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকেও স্থায়ী রূপ দিতে গেলে আমাদের প্রয়োজন চিন্তা এবং চর্যায় কতগুলো বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ১৯৪৭ সনে দীর্ঘদিনের পরাধীনতার শৃংখলমুক্তিতে নবযুগের সূচনা হ'ল ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে। ১৯৪৯ সনের ২৬শে নভেম্বর নব সংবিধনের মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে নবীন ভারত কল্যাণগর্ভ অগ্রগতির দিকে সুরু ক'রেছে তার নতুন যাত্রা। ফলে দিকে দিকে দেখা দিচ্ছে নব নব রূপান্তর। পুরাণো দিনের অনেক কিছুই নির্মোকের মত পরিত্যাগ ক'রে জাতি গ্রহণ ক'রছে নতুন উত্তরীয়। তারই অনুবর্তনে রাষ্ট্রভাষা পরিবর্তনের কথা উঠেছে এবং এই নিয়ে দেখা যাচ্ছে নানা জটিলতা। দীর্ঘদিন ধ'রে ইংরেজী ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে প্রচলিত থাকায় স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর কোনো ভারতীয় ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করার কথা অনেকে

ভাব্ছেন। তাই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে শাসকগণ রাতারাতি হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। কেউ কেউ এর পেছনে দেখ্ছেন অপর ভাষাভাষীদের সর্বপ্রকারে বঞ্চিত ক'রে বিশেষ এক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সর্বাধিপত্য বিস্তারের দূরভিসন্ধিপ্রসূত দূরভিসন্ধি। ফলে, বিভিন্ন প্রদেশে আত্মরক্ষার তাগিদে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ধূমায়িত হচ্ছে প্রবল অসন্তোষ। রাজ্য পুনর্গঠনের ব্যাপারে কোথাও কোথাও সেই প্রধূমিত ক্ষোভ রূপান্তরে লেলিহান শিখা বিস্তার ক'রে দিগ্দাহী বহ্নির রূপ ধারণ ক'রেছে, বিশাল ভারতের অখণ্ড যোগসূত্রকে ধ্বংস ক'রতে হ'য়েছে উদ্যত। মানুষের মধ্যে যখন সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধি জেগে ওঠে, তখন সকল কল্যাণ বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে সে ছিন্নমস্তার ভূমিকায় করে অভিনয়। বিভেদের বিষবাষ্পে মনের আকাশ আচ্ছন্ন থাকায় সে হারিয়ে ফেলে স্বচ্ছ দৃষ্টি। তাই, দেখেছি, ভেদবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত মানুষের দানবীয় উন্মত্ততার যূপকাষ্ঠে ভারত-কল্যাণের বলিদান—অগণিত মানুষের দুঃখ দুর্গতির কারণ স্বরূপ খণ্ডভারতের প্রতিষ্ঠা। আজকে আবার যদি ভেদবুদ্ধির রন্ধ্রপথে সর্বনাশের শনি ভারতের ভাগ্যজীবনে প্রবেশ করে, তাহ'লে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর বুকে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা দুষ্কর হ'য়ে উঠ্বে। তাই, আজ সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা স্থিরীকরণে প্রয়োজন বিশেষ বিবেচনা, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি এবং অনাবিল কল্যাণবুদ্ধি। নিখিল ভারতের সামগ্রিক সাধনা ও চেতনাকে প্রকাশ করা, সকল ভাষাভাষী জনগণের সমভাবে উন্নতির সহায়তা করা এবং নিখিল ভারতের প্রদেশগুলিকে পরস্পর এক যোগসূত্রে বন্ধন ক'রে তোলাই হবে রাষ্ট্রভাষার প্রধান লক্ষ্য। উপলক্ষ্য থাক্বে অবশ্য আরো অনেক।

কিন্তু, হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্থিরীকরণে এই সব কথা ভাবা হয়নি, ভাবাবেগই লাভ ক'রেছে প্রাধান্য। ফলে, তার প্রতিবাদে প্রচলিত ইংরেজীকেই রক্ষা করার জন্য অনেকে আবার উঠে প'ড়ে লেগেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত ভাষা কমিশনের বহুমত রিপোর্টে ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডক্টর পি. সুব্বারায়ন্ আপাততঃ প্রচলিত ইংরেজীকে রক্ষার জন্য অভিমত দিয়েছেন। হিন্দীর প্রতিবাদ কর্তে গিয়ে ইংরেজীর ওপর অত্যধিক জোর দেওয়ায় ভারতীয় ভাষাসমূহের স্বাধিকার রক্ষার কথা তাঁরা বিস্মৃত হ'য়েছেন। একদিকে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ, অপরদিকে নতুন ইংরেজী মোহ এর কোন্‌টি কল্যাণকর অথবা অন্য কোন্ ভাষা এই বিষয়ে যথোপযুক্ত—এই বিশেষ বিবেচনার দিন আজ এসেছে। সংস্কারমুক্ত মন এবং উদার দৃষ্টিতে পর্যালোচনা ক'রে স্থির করতে হবে নতুন সিদ্ধান্ত। ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সুষ্ঠু বিচারে দেখা যায় সংস্কৃতই নিখিল ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার সর্বাধিক যোগ্যতা দাবী করে।

ভূমিকার প্রশস্ত রাজপথ ছেড়ে এবার বিশ্লেষণের দুর্গম পথে করি যাত্রা।

স্বাধীন ভারতবর্ষ অনেকগুলি রাজ্যের সম্মিলিত একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র, বহু জাতির এবং বহু ভাষীর দেশ। তাই, ভারতীয় সংবিধানে প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিসত্তার প্রতি মর্যাদা জানিয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে :—

"..........to secure to all its citizens :

Justice, social, economic and political ; liberty of thought, expression, belief, faith and worship, Equality of status and of opportunity ; and to promote among them all Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity of the nation.

(The Constitution of India. Preamble P—1)

এই প্রতিশ্রুতিরই অনুবর্তনে যে ১৪টি ভাষাকে সংবিধানের ৮ম তপশিলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে—আসামী, বাংলা, গুজরাটী, হিন্দী, কান্নাড়া, কাশ্মীরী, মালয়ালম, মারাঠী, উড়িয়া, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু ও উর্দু।

এখানে আমরা দেখি কেবলমাত্র সংস্কৃতই কোন অঞ্চলবিশেষের ভাষা নয়। তবু একে স্বীকৃতি দেওয়ার কারণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং গভীর বিবেচনাপ্রসূত। অঞ্চল বিশেষের ভাষা না হ'য়ে একমাত্র সর্বভারতীয় ভাষারূপে এর স্থান অনস্বীকার্য। বহুদিনের সাংস্কৃতিক দাস মনোভাবের জন্য পূর্ণ মর্যাদা দানে কুণ্ঠিত হ'য়েও একে অস্বীকার ক'রলে একদিন নিজেদের অস্তিত্বও বিচলিত হ'তে পারে বুঝেছিলেন সংবিধানের প্রণেতৃগণ। তাই, আংশিক সুবুদ্ধিতে আঞ্চলিক ভাষারূপে হ'লেও এর স্বীকৃতি না দিয়েপারেন্‌নি তাঁরা ; হাজার হোক্‌, ভারতের মানসিকতায় গীতার বাণী অজ্ঞাতসারে হ'লেও কাজ করে চলেছে।

"স্বল্পমপ্যাস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

পৃথিবীর অন্যান্য সংযুক্ত রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা সর্বত্র একরকম নয়। একই ভাষাভাষী রাজ্যসমূহের সংযুক্ত রাষ্ট্রে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে কোন জটিলতা নেই। কিন্তু, বিভিন্ন ভাষাভাষী রাজ্যসমূহের সংযুক্ত রাষ্ট্রে কোথাও একটি, কোথাও বা একাধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত হয়েছে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং আমেরিকায় শুধু ইংরেজী, কানাডায় ফরাসী ও ইংরেজী দুই-ই সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত। সুইজারল্যান্ডে তিনটি ভাষা গৃহীত। যুগোশ্লাভিয়া ও সোভিয়েট দেশে তো একাধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রচলিত র'য়েইছে। তাদের এই দৃষ্টান্ত দেখে আমাদের দেশেও সংবিধানে স্বীকৃত ১৪টি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করার সুপারিশ ক'রেছেন কেউ কেউ। অনেকে আবার সেই সংগে বিদেশী ভাষা ইংরেজীকেও অন্যতর ভারতীয় ভাষা রূপে সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য চেষ্টা ক'রছেন। তাহ'লে মোট ১৫টি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা

রূপে গ্রহণ ক'র্তে হয় এই বহুধাবিভক্ত বিশাল দেশে। একাধিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি দানকারী যে সব দেশের দৃষ্টান্ত যাঁরা তুলেছেন, তাঁরা ভুলে গেছেন যে সেই সব দেশের এই ভাষাগুলি পরস্পর ভগ্নীস্থানীয় এবং সমপরিণত। মনে রাখতে হবে, সংস্কৃতের মত একটি অতিপরিণত এবং তাদের সমস্ত ভাষার জননীস্থানীয় ও সামগ্রিক সংস্কৃতির ধাত্রীস্বরূপা কোন ভাষা সেখানে বর্তমানে প্রচলিত নেই। তাই, তাঁদের বাধ্য হ'য়ে ঐ পন্থা অবলম্বন ক'র্তে হ'য়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে সংস্কৃতের প্রচলন থাকায় এই জটিলতায় যাওয়ার কোন কারণই নেই।

গ্রীক এবং ল্যাটিনের সংগে সংস্কৃত একই গোত্রীয় এবং গ্রীক্-ল্যাটিনকে বাস্তব জীবনে অত্যধিক ভাবে গ্রহণ না ক'রেও যেমন সেই সব দেশ এগিয়ে চ'লেছে, আমরাও সংস্কৃতকে ছেড়ে পার্‌ব না কেন, ব'ল্‌তে চান কেউ কেউ। তবে তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, গ্রীক এবং ল্যাটিন যে স্তরে রয়েছে, সংস্কৃত সেই স্তরে নেই। ভাষা হিসাবে এটি আরো পরিণত এবং সমৃদ্ধ। এই সম্বন্ধে কয়েকজন বিশ্ববন্দিত ভাষাবৈজ্ঞানিক ও মনীষীর সুগভীর গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত বিবেচনা ক'র্‌লে আমাদের মোহ কিছুটা কাট্‌তে পারে। জ্ঞানরাজ্যের যাঁরা পথচারী, সত্যের সন্ধানী যাঁরা, তাঁদের কাছে এই সব মনীষী অপরিচিত নন বলে এঁদের ব্যক্তিগত পরিচয় দিয়ে আর ভারাক্রান্ত কর্‌লাম না আলোচনা।'—

Sir William Jones :—

"It is of a wonderful structure, more perfect than Greek, more copius than Latin, more exquisitely refined than either. Whenever, we direct our attention to the Sanskrit literature, the notion of infinity presents itself. Surely, the longest life would not suffice for a single perusal of works that rise and swell protuberant like the Himalayas, above the bulkiest compositions of everyland beyond the confines of India."

Friedrich Schegel :—

"justly it is called Sanskrit i. e. perfect and finished.

Prof Maxmuller :—

"Sanskrit is the greatest language in the world, the most wonderful and the perfect It is difficult to give an idea of the enormous extent and variety of that literature.

W. C Taylor : —

"Sanskrit is a language of unrivalled richness and variety, a language, the parent of all those dialects that Europe has finally called classical."

Prof Whitney :—

"Its exceeding age, its remarkable conservation of primitive materials and forms, its unequalled transparency of structure give it (Sanskrit) an indisputable right to the first place among the tongues of the Indo-European family."

Prof. Bopp :—

"Sanskrit was at one time the only language of the world."

M. Dubiois :—

"Sanskrit is the origin of the modern lauguages of Europe."

Dr. Macdonell :—

"Since the reneissance there has been no event of such world significance in the history of culture as the discovery of Sanskrit literature in the later part of the 18th century".

যাঁরা স্বদেশীয় সংস্কৃতি এবং তার চাবিকাঠি সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞ, কিংবা প্রত্যক্ষ ভাবে না জেনেও জানেন ব'লে মনে ক'রে অশিক্ষিত পটুত্ব প্রদর্শন করেন এবং বিলেতের রঙীন চশমার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে স্বদেশীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষাকে বিচার করেন, তাঁদের অবগতির জন্যই এই সব বহুমানিত পাশ্চাত্য মনীষীর কথাই উল্লেখ করা হ'ল।

এছাড়াও গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষায় এখন নতুন সৃষ্টি আর হচ্ছে না। কিন্তু, সংস্কৃতে নিত্য-নূতন গ্রন্থরচনা অব্যাহত ভাবেই চ'লেছে। রাষ্ট্রশক্তির এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অবহেলা এবং প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সুরভাষার মন্দাকিনীধারা মানব-মনীষাকে সুজলা সুফলা ক'রে প্রবাহিত হচ্ছে এখনো। দৈনন্দিন জীবনে অন্ততঃ বিশ কোটি ভারতীয় নিত্য এই ভাষা আশ্রয় ক'রে তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবনের পথে এগিয়ে চ'লেছেন; জন্ম মৃত্যু বিবাহাদি সামাজিক সংস্কার, পূজার্চনাদি মংগলানুষ্ঠান ক'রে চ'লেছেন। প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত সম্প্রদায় বহু অবজ্ঞা এবং ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যেও অচল অটল ভাবে এই সংস্কৃতবিদ্যার ধারাকে প্রাণপণে রক্ষা ক'রে চ'লেছেন। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখা যায় এই বাংলাদেশেই অগণিত গ্রন্থ সংস্কৃতে রচিত হ'য়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এই বাংলাদেশেই অবিমিশ্র সংস্কৃত বিদ্যার কেবলমাত্র টোলের পরীক্ষার ছাত্রসংখ্যাই হ'চ্ছে ১৯৫৭ সনে প্রায় ১০ হাজার। স্কুল কলেজের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় বৃটিশ ভারতে প্রথম স্থাপিত হ'ল, তা'তে তখন স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য হিসাবে ধরা হ'য়েছিল। এই সংগে মনে রাখা দরকার যে আর কোন ভারতীয় ভাষাকে তখন সংস্কৃতের মত উচ্চশিক্ষার উপযোগী মনে না করায়, ঐরকম মর্যাদা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় স্বীকৃত হয়নি। পরে যখন বংকিম, বিদ্যাসাগর,

মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের অবদানে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হ'ল, তখন কর্মবীর আশুতোষের চেষ্টায় বাংলা ভাষা স্বীকৃতি পেল বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে। হিন্দী প্রভৃতি অন্যান্য ভাষাতো এখনো বাংলারই তুলনায় অনেক অপরিণত। আর সংস্কৃতের সংগে তুলনা চলেই না। যাই হোক্, এই সব নানা কারণে, দেখি গ্রীক্-ল্যাটিন যে ভাবে মৃতভাষা, সংস্কৃত তো তা মোটেই নয়। সংস্কৃতের প্রচার এবং প্রয়োজনীয়তা এখনো শেষ হ'য়ে যায়নি। বৈজ্ঞানিক যুগে ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষাশিক্ষার কোন প্রয়োজন আছে কিনা বিবেচনা কর্‌তে ইংলণ্ডে প্রথম মহাযুদ্ধের পর লয়েড জর্জ একটি কমিটি গঠন করেন। বহু অনুসন্ধান এবং বিবেচনার পর পূর্ণ প্রয়োজন র'য়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেন কমিটি। ল্যাটিনের সংগে তাঁদের যা সম্পর্ক, আমাদের সংস্কৃতের সংগে আরো নিবিড়তর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সর্ববাদী সম্মত। ইউরোপের বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়ের গ্রীক ল্যাটিনের প্রতি বৈরূপ্য তো নেইই, বরঞ্চ আছে আগ্রহ। তবু তাকে তাঁরা সংস্কৃতের মত স্থান দিতে পারে্ছন্‌না। কিন্তু, ভারতের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অজ্ঞতা, বিরূপতা এবং প্রতিকূলতার মধ্যেও সংস্কৃত যে এখনো স্বীয় আসনে সমাসীন আছে, এটি তার প্রাণ শক্তির অনন্ত প্রাচুর্যের কথাই ঘোষণা করে, মৃত্যুর নয়! অন্ধ সূর্যকে দেখ্‌তে পায় না ব'লেই সূর্য নেই, এই কথা বলা চলে না। সীমিত দৃষ্টি এবং খণ্ডিত বুদ্ধির দ্বারা যাঁরা সংস্কৃতকে মৃতভাষা বলেন, তাঁদের কথা কতদূর গ্রাহ্য, বিচারশীল সত্যানুসন্ধানীগণ যুক্তিনিষ্ঠ মন নিয়ে বিচার ক'রে দেখুন—এই অনুরোধ।

হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার বিপক্ষের কারণগুলো বহু আলোচিত। প্রথমতঃ অন্য ভাষাভাষী জনগণের স্বার্থরক্ষা হবে না! ফলে, সকলের স্বার্থরক্ষা এবং সুযোগদানের যে পবিত্র প্রতিশ্রুতি আমাদের সংবিধানে দেওয়া হ'য়েছে, সেটি লঙ্ঘিত হবে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হিন্দী ভাষাভাষী জনগণের একাধিপত্য হ'তে বাধ্য। অন্যভাষাভাষী জনগণ হবে বঞ্চিত। যে কোন আঞ্চলিক ভাষাকে বহু ভাষাভাষী ভারতের রাষ্ট্রভাষা ক'র্‌তে গেলে এই সমস্যা জেগে উঠ্‌বেই। হিন্দী ক'র্‌লে যেমন কেউ কেউ বঞ্চিত হচ্ছে, বাংলা ক'র্‌লেও তেমনি অনেকে বঞ্চিত হবে, মালয়ালম্ ক'র্‌লেও আবার তাই-ই হবে। একমাত্র কোন সর্বভারতীয় ভাষাই এই সমস্যার সমাধান ক'র্‌তে পারে সুষ্ঠুভাবে।

হিন্দীভাষা এখনো অত্যন্ত অপরিণত। প্রশাসনিক সমস্ত কাজ এই ভাষায় চালাতে গেলে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হয়। বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষা তৈরী ক'র্‌তে গিয়ে এই অসুবিধা পদে পদে দেখা যাচ্ছে। তাই, সংস্কৃত হতে অদ্ভুত তৎসম শব্দ সব গ্রহণ ক'র্‌তে হচ্ছে। এই সত্য উপলব্ধি করাতেই প্রধানতঃ সংস্কৃতের সাহায্যেই হিন্দীকে প্রশাসনিক ব্যবহারের উপযুক্ত ক'রে তোলার জন্য ভারতীয় সংবিধানে নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছে :—

"It shall be the duty of the Union to promote the spread

of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for a l the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assim·lating without interfering its genius, the forms, style and expressions ……by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages." (The consitution of India Page 170 Pare—35)

এই ভাষাকে কার্যোপযোগী ক'রতে সময় এবং অর্থের অপচয় অবশ্যম্ভাবী। অন্য যে কোন আঞ্চলিক ভাষার পক্ষেও এই অসুবিধা দেখা দেবে। প্রায় সমস্ত ভাষার মাতৃস্থানীয় এবং সর্বাধিক পরিণত ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা ক'রলে এই সব অসুবিধার কোনটিই থাকে না।

হিন্দী কিংবা কোন আঞ্চলিক ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হ'লে, কেবল সেই ভাষার উন্নতি সাধনেই রাষ্ট্রীয় উৎসাহ এবং সাহায্য প্রযুক্ত হবে, অন্যান্য ভাষাগুলো হবে অনাদৃত। আর, হিন্দী প্রভৃতি ভাষাগুলি ভগ্নীস্থানীয়া ব'লে এদের একের উন্নতিতে অপরের কোন লাভ নেই। ভারতের বিচিত্র সংস্কৃতির বাহন হিসাবে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার আত্মবিকাশের পথে সাহায্য করা সরকারের অপরিহার্য কর্তব্য। সংস্কৃতের প্রতি অজ্ঞতা ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে শক্তিহীন ক'রে তুলছে। যাঁরাই আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে বিভিন্ন দিকে সমৃদ্ধ ক'রেছেন, তাঁরা সংস্কৃতের অনন্ত রত্নভাণ্ডার থেকে মণিমাণিক্য ক'রেছেন আহরণ। মাতার স্বাস্থ্য ভাল থাকলে স্তন্যপায়ী সন্তানও ভাল থাকবে, এই প্রাকৃতিক নিয়ম। তাই, উৎস স্থানীয় সংস্কৃত ভাষার প্রচার এবং প্রসারে সরকারী সক্রিয় উৎসাহ পাওয়া গেলে, তা'র দ্বারা পরম্পরাক্রমে আঞ্চলিক ভাষাসমূহও হবে সমুন্নত। হিন্দী ভাষার একমাত্র উল্লেখযোগ্য অতুলনীয় গ্রন্থ তুলসীদাসের "রামচরিতমানস" সংস্কৃত রামায়ণের শুধু ঘটনা নয়, ভাষাকেও বহুলভাবে গ্রহণ করেছে ব'লেই এতো হৃদয়গ্রাহী। বাংলাভাষার নির্মাতৃগণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রলে এই সত্য আরো ভালভাবে উপলব্ধি করা যায়। একান্ত সংস্কৃতানুগ বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য এবং মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য ছেড়ে দিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই দেখিনা কেন; রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, মধুসূদন, বংকিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, হরপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যুগন্ধর বংগসাহিত্য রথিগণের অপরিমেয় সংস্কৃত জ্ঞান তাঁদের প্রতিভাকে সৃজনশীল ক'রে তুলেছিল। কেবলমাত্র বিষয়বস্তু নয়, শব্দ, অলংকার, আদর্শ এবং সাহিত্যিক কলাকৌশলও কি ক'রে তাঁরা সংস্কৃত হ'তে নিয়ে আত্মস্থ ক'রে মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ ক'রে তুললেন এ এক গবেষণার বিষয়। বিশেষ কি, বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অবিসংবাদিত সাহিত্যগুরু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি রচনা বিশ্লেষণ ক'রলে এর পরিচয়

মেলে সুন্দরভাবে। সংস্কৃত পণ্ডিতমণ্ডলী তাই তাঁকে "কবিসার্বভৌম" উপাধি দান ক'রে অভিনন্দিত ক'রেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে বাংলা শিক্ষার্থীদের প্রথমে সংস্কৃত শিখ্‌তে উপদেশ দিতেন এবং শান্তিনিকেতনে প্রথমের দিকে নিজেই সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়াতেন বাংলার ছাত্রদের। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ শিক্ষককে বাংলা পড়াতে দিতেন্ না। তাঁর প্রথম যুগের সংগৃহীত শিক্ষকমণ্ডলী মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, আচার্য ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী, পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রভৃতি প্রায় সকলেই সংস্কৃতাশ্রিত বিদ্যায় ছিলেন পারংগত। বহুদিন পূর্বে একবার ক'ল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতকে আবশ্যিক-এর পরিবর্তে ঐচ্ছিক করার সিদ্ধান্ত ক'র্‌লে, তিনিই তার প্রতিবাদে আন্দোলন ক'রে অসাধু সংকল্প পরিত্যাগ ক'র্‌তে বিশ্ববিদ্যালয়কে বাধ্য করেন। বিশেষ কি, যেখানে সর্বভারতীয় জাতীয়তার প্রশ্ন তিনি দেখেছেন, সেখানে সংস্কৃতকেই তিনি নির্বিচারে ক'রেছেন গ্রহণ। অক্স্‌ফোর্ড্‌ বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে তাঁকে যখন সম্মানাত্মক "ডি-লিট্‌" উপাধি দেওয়া হয়, তিনি সেই সমাবর্তন সভায় তাঁর উত্তর দান করেন বাংলায় নয়, হিন্দীতে নয়, ইংরেজীতে নয়, একমাত্র সর্বভারতীয় জাতীয় ভাষা সংস্কৃতে। চীনদেশ হ'তে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল শান্তিনিকেতনে এসে তাঁদের সংস্কৃতির বাহন চীনা ভাষাতেই সভার কার্যাদি ক'র্‌বেন বলায় রবীন্দ্রনাথও সেই সভার পরিচালনা ক'র্‌লেন ভারতীয় সংস্কৃতির বাহন সংস্কৃতভাষায়। আজ তিনিও নেই, দেশেরও দুর্দিন। ১৩০৯ বংগাব্দের নববর্ষে রবীন্দ্রনাথ যে কথাগুলো বলেছিলেন, আজকের জাতীয়তাবিহীন আন্তর্জাতিকতার দিনে সেগুলো আরো বেশী ক'রে স্মরণ করা প্রয়োজন।—

"দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য, তাহা আমরা কয়েকজন শিক্ষাচঞ্চল যুবক বিলাসে, অবিশ্বাসে, অনাচারে, অনুকরণে এখনো ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই। শান্তির মর্মগত এই বিপুল শক্তিকে অনুভব করিতে হইবে, স্তব্ধতার আধার ভূত এই প্রকাণ্ড কাঠিন্যকে জানিতে হইবে। আমরা আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছিনা, জানিতে পারিতেছিনা, ইংরেজী স্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাসমাত্র চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি, তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ। তাহা আমাদের বাগ্মীদের বিলাতী পটহতালে সভায় সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায় না—তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্ররৌদ্রবিকীর্ণ বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠ ভীষণ, তাহা দারুণ সহিষ্ণু, উপবাসব্রতধারী। তাহার কৃশ পঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত অশোক অভয় হোমাগ্নি এখনো

জ্বলিতেছে। আর আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর, আস্ফালন, করতালি, মিথ্যাবাক্য, যাহা আমাদের স্বরচিত, যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য, একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্বেলিত পশ্চিম সমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেনরাশি, তাহা, যদি কখনো ঝড় আসে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন দেখিব, ঐ অবিচলিত শক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্ত চক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে; তাহার পিংগল জটাজাল ঝঞ্ঝার মধ্যে কম্পিত হইতেছে; যখন ঝড়ের গর্জনে অতি বিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরেজী বক্তৃতা আর শুনা যাইবে না, তখন ঐ সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণ বাহুর লৌহবলয়ের সংগে লৌহদণ্ডের ঘর্ষণঝংকার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপর শব্দিত হইয়া উঠিবে। এই সংগহীন নিভৃতবাসী ভারতবর্ষকে আমরা জানিব; যাহা স্তব্ধ তাহাকে উপেক্ষা করিব না, যাহা মৌন তাহাকে অবিশ্বাস করিব না, যাহা বিদেশের বিপুল বিলাস সামগ্রীকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারা অবজ্ঞা করে, তাহাকে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিব না; করজোড়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিব, এবং নিঃশব্দে তাহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া স্তব্ধভাবে গৃহে আসিয়া চিন্তা করিব।... ... ...অদ্যকার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চিরপুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব: সায়াহ্নে যখন বিশ্রামের ঘণ্টা বাজিবে, তখনো তাহা ঝরিয়া পড়িবে না; তখন সেই অম্লান গৌরব মালাখানি আশীর্বাদের সহিত আমাদের পুত্রের ললাটে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে নির্ভয় চিত্তে সবল হৃদয়ে বিজয়ের পথে প্রেরণ করিব। জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্বাক্, তাহারই জয় হইবে: আমরা যাহারা অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে:

মিলি মিলি যাওব সাগরলহরীসমানা।" (স্বদেশ)

আজ কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতীয় সংস্কৃতির নাম ভাঙিয়ে বিশ্বের দুয়ারে আমরা মান ভিক্ষা ক'রতে যাই। কিন্তু, নিজেদের রাষ্ট্রীয় জীবনে সেই রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ এবং ভারতীয় সংস্কৃতির একমাত্র বাহন সংস্কৃত ভাষাকে করি অনাদর এবং অবজ্ঞা। বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলিতে সংস্কৃত "মহাভারত" উপহার দিয়ে সাংস্কৃতিক মিলনের যোগসূত্র রচনা ক'রে চ'লেছি। কিন্তু, ভারতের শতকরা কয়জন লোককে মহাভারত পড়ার মত সংস্কৃত জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ দেওয়া হ'য়েছে, ভাববার বিষয়। একসময় এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ভারতের সংস্কৃতাশ্রিত সংস্কৃতিতে দীক্ষিত হ'য়েছিল ব'লেই বৃহত্তর ভারত তথা দ্বীপময় ভারত গ'ড়ে উঠেছিল। সেই পুরানো প্রেম বন্ধনের কথা বলেই আজো আবার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংগে আমরা মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছি। কিন্তু তার বাহন সংস্কৃতকে করি অবহেলা। এইভাবে সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা না করায় আমাদের জীবনে ও বাণীতে, চিন্তা এবং

চর্যায় দেখা দিয়েছে বিরাট ব্যবধান। এই ব্যবধান দূর ক'রতে না পারলে তাসের ঘরের মত এই বিশাল ভারতের উন্নতির প্রাসাদ একদিন ভেঙে পড়বে, মিথ্যে আত্মপ্রসাদ ডেকে আনবে ধ্বংস। এইভাবে নিখিল ভারতের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষাগুলির সমভাবে উন্নতি এবং বিশ্বের দরবারে নিজেদের পরিচয়কে সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপিত করার জন্য সংস্কৃতকেই রাষ্ট্রভাষা করা প্রয়োজন।

কোন আঞ্চলিক ভাষাই সর্বভারতীয় চিরন্তন ভাবধারাকে যথার্থরূপে ধারণ ক'রতে পারেনি ; কেবলমাত্র অঞ্চল বিশেষের সাধনা সংস্কৃতিকে ক'রেছে প্রকাশ। তাই, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যখনই যে কেউ কিছু ক'রতে গিয়েছেন তখনই অবলম্বন ক'রেছেন সংস্কৃত ভাষা। তাই দেখি, কেরলের শংকরাচার্য যখন সমগ্র ভারতে তাঁর নতুন আদর্শের প্রচারে বহির্গত হলেন, তখন অবলম্বন করলেন সংস্কৃতভাষা, কেরলী ভাষা নয়। ফলে, নিখিল ভারতের সাংস্কৃতিক দিগ্বিজয়ে বিজয়লক্ষ্মী তাঁকেই বরণ করে নিলেন। তখনকার ভারতবর্ষ বিভিন্ন রাজার দ্বারা শাসিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হ লেও এক সংস্কৃত ভাষাই ছিল সকল দেশের রাষ্ট্রিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মনৈতিক ভাষা। আচার্য শংকর সকল ভারতবাসীর একমাত্র যোগসূত্র সেই সংস্কৃতকে অবলম্বন করেন ব'লেই সার্থকতা অর্জনে হলেন সমর্থ। পরবর্তীকালে গৌড়বঙ্গের প্রাণপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও এই সংস্কৃত ভাষাকেই অবলম্বন ক'রে করেন তাঁর উত্তরাপথ এবং দাক্ষিণাত্য পরিক্রমা। সুরসরস্বতীর খাতেই প্রবাহিত করেন তাঁর প্রেমপ্রবাহিনীর অমিয় ধারা। এই সেদিনও ভারতের নবযুগের উদ্গাতা মহাত্মা রাজা রামমোহন মাদ্রাজে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ক'রছেন সংস্কৃত ভাষার আশ্রয়েই। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম উৎসস্থানে প্রাকৃত ভাষায় প্রচারিত হ'লেও পরে সমগ্র ভারতে যখন প্রচারিত হ'তে গেল, তখন অবলম্বন ক'রল সংস্কৃত ভাষা। ফলে বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শন ও সাহিত্যের বিরাট ভাণ্ডার গ'ড়ে উঠ্‌লো সংস্কৃত ভাষার সর্বতঃপ্রসারিত আশ্রয়ে। সুতরাং, নিখিল ভারতের খণ্ড সংস্কৃতিকে নয়, সামগ্রিক সংস্কৃতিকে বহন ক'রে চ'লেছে যে ভাষা এবং কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হ'য়ে গেছে যার শক্তি, সেই সংস্কৃতভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার সর্বাধিক যোগ্যতা ধারণ করে। স্বাধীন ভারতবর্ষও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে যে সব আদর্শ সরকারী চিহ্নের সংগে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গ্রহণ ক'রেছে, সেগুলো পুরোপুরি সংস্কৃতই। যেমন, আমাদের রাষ্ট্রচিহ্ন অশোক চক্রের নীচেই সন্নিবেশিত করা হ'য়েছে সংস্কৃত বাণী "সত্যমেব জয়তে।" ভারতীয় বেতার কেন্দ্রে গৃহীত হয়েছে—"বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়।" ভারতীয় বীমা কর্পোরেশনে গৃহীত হ'য়েছে "যোগ ক্ষেমং বহাম্যহম্।" নৌবাহিনীর আদর্শ স্থির হয়েছে—"সং নো বরুণঃ"। লোকসভার অধ্যক্ষের আদর্শ স্থির করা হয়েছে—"ধর্মচক্রপ্রবর্তনায়"। লোকসভার দ্বারে লিখিত হয়েছে—ন সা

সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা, ন তে বৃদ্ধাঃ যেন বদন্তি ধর্মম্।" পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভারও এই শ্লোকটি পুরো উৎকীর্ণ রয়েছে। ডাক তার বিভাগের আদর্শ হ'য়েছে—"অহর্নিশ সেবামহে" দার্জিলিংএ হিমালয় আরোহণের কেন্দ্রেরও আদর্শ সংস্থানেই স্বীকৃত হয়েছে। এইভাবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংস্কৃতকে গ্রহণ না ক'রে পারেননি বর্তমান সরকারও। তাই, সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ ক'রলে সেই সর্বভারতীয় সামগ্রিক দৃষ্টিতে কার্যক্ষেত্রে সার্থক ক'রে তোলা হবে। বিশাল ভারতের বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে রক্ষিত হবে পরম ঐক্য; যা' কোন আঞ্চলিক ভাষায় একেবারে অসম্ভব।

ভারতের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই স্নাতকোত্তরমান পর্যন্ত সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু, হিন্দী কিংবা অন্যকোন আঞ্চলিক ভাষার স্বীয় অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় সর্বোচ্চমান পর্যন্ত শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হ'লে তাই অতিসহজেই জনসাধারণকে এই ভাষায় শিক্ষিত ক'রে তোলা যাবে।

সংস্কৃত ভাষা সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধারণ, বহন ও পোষণ ক'রে আসছে অনাদি কাল হ'তে। স্বাধীন ভারতবর্ষ তার ঐতিহ্যকে জানুক এবং তারি পাথেয় নিয়ে ভবিষ্যতের পানে এগিয়ে চলুক, এই তো কাম্য। বর্তমানের উন্নতির মর্মমূলে প্রোথিত রয়েছে অতীতের বুকে। তাই, কবির কথায় বলি—

"চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।"

(দ্বিজেন্দ্রলাল)

তরুলতার মূল ছিন্ন ক'রে দিলে তার ফুল এবং ফল ঝরে পড়ে—এই প্রকৃতির নিয়ম। বিবেকানন্দ, তিলক, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষকে জানতে গেলে সংস্কৃতভাষাই জানতে হবে প্রথম। উপনিষদ্ প্রেরণা যুগিয়েছিল রামমোহনকে; দয়ানন্দ বেদের ভিত্তিতে ভারত পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ এবং গুরুকুলে লালা মুন্সীরাম প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যায়তনের আদর্শকেই ক'রেছেন গ্রহণ। তিলক, অরবিন্দ, গান্ধীজী এঁদের সকলেরই রাজনৈতিক প্রেরণার উৎস সংস্কৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। বাংলার রক্তরাঙা যুগের অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম, কানাইলাল প্রভৃতি এই সংস্কৃত গীতার মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়েছিলেন এবং মৃত্যুকে জয় করার সাধনায় হ'য়েছিলেন সিদ্ধ। নেতাজী সুভাষচন্দ্রেরও নৈতিক জীবন গ'ড়ে উঠেছিল সংস্কৃত গীতা প্রভৃতি গ্রন্থের আদর্শের ভিত্তিতে। বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দ দেশবিদেশে সংস্কৃত দর্শন বেদান্তের মহিমা প্রচার ক'রেছিলেন এবং আকাঙ্ক্ষা ক'রেছিলেন দেশে বৈদিক শিক্ষার প্রচলন। আজ দেশে যখন নতুন শিক্ষা প্রবর্তন ক'রতে চ'লেছি, তখন মনে পড়ে সেই সত্যদ্রষ্টা দেশপ্রেমিক বীর সন্ন্যাসীর উদাত্ত আহ্বান ঃ—

"Before flooding India with socialistic and political ideas first deluge the land with spiritual ideas. The first work that demands our attention is that the most wonderful truths confined in our Upanishads, in our sciptures in our puranas, must be brougfit out. "(Thus spake Vivekananda)

সংস্কৃত বিশ্বভাষা সমূহের অনতম। সংস্কৃতভাষা এবং তদাশ্রিত সংস্কৃতির জন্যই ভারতের আন্তর্জাতিক সম্মান ও গৌরব। সংস্কৃতকে মৃত ভাষা বলে যাঁরা পাশ্চাত্যের দরবারে বাহাবা পেতে চান, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি পাশ্চাত্য মনীষী, প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাতনামা আচার্য Dr Louis Renou'র কথাটি :

"There is no living culture without a living tradition. If India is beloved and cherished among the elite of the west, it is on account of her traditional culture. And this culture is embedded above all in the treasures of Sanskrit. Sanskrit and India are inseparably connected, inspite of all the transitory harngues of the politicians."

আরও মনে পড়ে ভারতবন্ধু মনীষী Dr. Maxmuller-এর সুচিন্তিত অভিমত :—

"Such is the marvellous continuity between the past and the present in India, inspite of repeated social convulsions, religious reforms and foreign invasions, Sanskrit may be said to be still the only language that is spoken over the whole extent of the vast country. We can hardly understood how, at so early a date, the Indians have developed ideas which to us sound decidedly modern.

Some of the riddles of the future find their solution in the wisdom of the past."

যদি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত হিন্দী বা অন্য কোন আঞ্চলিক ভাষা রাষ্ট্র ভাষা রূপে গৃহীত হয়, তবে জাতিসংঘে এবং বিশ্বের বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীতে ভারতের মর্যাদাহানি অবশ্যম্ভাবী। সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হ'লে সেই সম্মান শুধু অক্ষুণ্ণ থাকবেনা পরিবর্ধিতও হবে ব'লে মনে হয়। সংস্কৃতে কথোপকথনের অক্ষমতার জন্য মাইকেল মধুসূদনকে লণ্ডনের বিশিষ্ট মনীষী Sir Moniar Williams এর কাছে কি ভাবে অপ্রস্তুত হতে হ'য়েছিল, তা অনেকেই জানেন। এখনো সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ যে সব ভারতীয় বিদেশে যান, তাঁদের কীরকম অপদস্থ হ'তে হয়, ভুক্তভোগী মাত্রেরই জানা আছে।

হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করায় যেমন নানা প্রদেশ হ'তে আপত্তি উঠেছে, সকল প্রদেশের কাছেই সমান সংস্কৃতকে ক'রলে তেমনটি হবে না। রাজ্য পুনর্গঠনের ব্যাপারে কোথাও কোথাও যে অসন্তোষের বহ্নি প্রধূমিত হ'চ্ছে, ভস্মাচ্ছাদিত হ'য়ে

আছে, হিন্দীকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করলে সেই অনল আবার সহস্র শিখায় জ্বলে উঠবে। সংস্কৃতকে ক'রলে সেই সব প্রতপ্ত স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে শান্তিবারি। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কৌটিল্যপ্রতিম সূক্ষ্মদর্শী নেতা কুশাগ্রধী চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন—"হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হ'লে ভারত শতধা বিভক্ত হ'য়ে পড়বে"। ঐক্যবোধ বিলুপ্ত হওয়ায় হয়তো দেখা দেবে গৃহযুদ্ধ। সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হ'লে বরং বিভেদের মধ্যেই স্থাপিত হবে পরম ঐক্য। সকল প্রদেশ এক ভাষার মাধ্যমে এক প্রেমবন্ধনে প'ড়বে বাঁধা। মিলনের রাগিণী সুরবীণার বীণাতেই ঝংকৃত হ'চ্ছে চিরন্তন কালের পটভূমিকায়। সাধারণ জলশুদ্ধির মন্ত্রে পর্যন্ত দেখি উত্তরাপথ ও দাক্ষিণাত্যের রাখী বন্ধনের কথা—গংগা-যমুনার সংগে নর্মদা-কাবেরীর মিলনের আহ্বান।—

"গংগে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি,
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলে স্মিন্ সন্নিধিং কুরু।"

নবজাত ভারতরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংগস্বরূপ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতা ও ঐক্য আজ বড়ই প্রয়োজন। ভারতের নিজস্ব জাতীয়তার ভিত্তিতে এই সর্বভারতীয় অখণ্ড ঐক্যবোধ জাগ্রত ক'রতে পারে একমাত্র সংস্কৃত ভাষা। রামায়ণ-মহাভারত, কিংবা ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাসকে আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী সমগ্র ভারতবর্ষের সকল অধিবাসী সমভাবেই শ্রদ্ধা করেন, নিজ প্রদেশীয় নয় বলে কেউ অবজ্ঞা করেন না।

মুসলমান শাসকগণ ভারতবর্ষে সংস্কৃত চর্চায় বরাবরই বিশেষ উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। আকবর, শায়েস্তা খাঁ, শাজাহান প্রভৃতির দরবারে বহু বড় বড় সংস্কৃত কবি এবং পণ্ডিত সমাদর পেয়েছিলেন। যিনি "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ব'লে শ্লোক রচনা ক'রেছিলেন, সেই নব কালিদাস আকবরের সভায় ছিলেন ব'লে তাঁকে বলা হ'ত আকবরীয় কালিদাস। "রসগংগাধর", "চিত্রমীমাংসা" প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা সুবিখ্যাত কবি এবং দার্শনিক, আলংকারিক-মূর্ধন্য পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ সাজাহানের রাজসভা অলংকৃত করে-ছিলেন। মহম্মদ শাহ্ সংস্কৃতে সংগীতগ্রন্থ "সংগীত-মালিকা", "শেখ ভাবণ, "অল্লা উপনিষদ্", খান্ খানান্ আব্দুল রহমান "খেট-কৌতুকাদি" গ্রন্থত্রয়, আব্দুর রহমান "সন্দেশ রাসক" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। রাজপুত্র দারাসুকো "সমুদ্রসংগমম্" নামক বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্যের রচয়িতা। তাঁরই অনূদিত পঞ্চাশটি উপনিষদের সুললিত ফার্সী অনুবাদ ওলন্দাজ ভাষায় অনূদিত হ'য়ে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং শোপেনহাওয়ার প্রভৃতি দার্শনিককে করে ভাবমুগ্ধ। দশম শতকের আরবদেশীয় ঐতিহাসিক মাসুদী (মৃত্যু-৯৫৬ খৃঃ) "কিতাব্ এল্-হিন্দ্‌বাদ্" কাহিনীটি সংস্কৃত হ'তেই আরবী ভাষায় অনূদিত হ'য়েছে ব'লে ব'লছেন। Chosraa Anosharwaa-এর তত্ত্বাবধানে Buroe নামধারী জনৈক চিকিৎসক ৫৩১—৫৭৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে

সংস্কৃত "পঞ্চতন্ত্রের" পহ্লবী ভাষায় অনুবাদ করেন। আরবী ভাষায় আব্দুল্লা ইবন্ অল মোকাফা এবং সিরীয় ভাষায় Bad এই সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রেরই অনুবাদ করেন ৫৭০ খৃষ্টাব্দে। বাঙালী মুসলমান দরাফ্ খাঁ সংস্কৃতে গংগাস্তুতি রচনা করেন। দৌলৎকাজি, আলাওল প্রভৃতি সংস্কৃতনিষ্ঠ বাঙালী কবির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, এই সেদিনের পূর্বে বাংলার ঋষিকল্প মনীষী সাহিত্যবিশারদ আব্দুল করিমের সংস্কৃত প্রীতির কথা কে না জানে? পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের পুরোধা এবং প্রেরণাদাতা এই অশীতিপর বৃদ্ধ সারস্বতসেবককে দেখেছি গ্রামে গ্রামে সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ ক'রে বেড়াতে, ক্ষেপা যেমন খুঁজে ফিরছিল পরশ পাথরের সন্ধানে। অল্পশিক্ষিত গ্রাম্য মুসলমান প্রজার কাছে লেখকের সংস্কৃত চাণক্যশ্লোকের শিক্ষা। এই সব কারণে দেখি, সংস্কৃতকে গ্রহণ ক'রতে গিয়ে কেউ কোনদিন প্রাদেশিক কিংবা ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়নি। সুদূর অতীতে মনীষী অল্‌বেরুণী গজনীতে বসেই সংস্কৃত শিখছেন দেখতে পাই। এই বর্তমান বিংশ শতাব্দীতেও আফগানিস্তানের কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা অবশ্যপাঠ্যরূপে গৃহীত হ'য়েছে এবং তার পঠন পাঠনও চলছে সুষ্ঠুভাবে। প্রায় সংস্কৃত সংগীত "বন্দে মাতরম" মন্ত্রের মত চৈতন্য সম্পাদন ক'রেছিল দেশ প্রেমিক সকল ভারতবাসীকে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সবাইকে দেশের জন্য প্রাণোৎসর্গে ক'রেছিল উদ্বুদ্ধ। দীর্ঘদিন ধ'রে মুসলমান আমলে ফার্সী এবং ইংরেজ আমলে ইংরেজী রাজভাষা হ'লেও, সংস্কৃত চর্চার প্রবাহ কখনো যায়নি হারিয়ে; শাসকের শোষণেও হয়নি শুষ্ক; অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত এখনো প্রবাহিত হ'য়ে চ'লেছে ভারতীয় মননভূমির অভ্যন্তরে।

মেকলে যখন নব্যযুগে সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র সংস্কৃত কলেজের নানা প্রতি কূলতা ক'রছিলেন, তখন সুবিখ্যাত পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ লণ্ডনস্থিত মনীষী উইলসনকে শ্লোকে ব্যাধরাজ মেকলের শর হতে সংস্কৃত বিদ্যাকেন্দ্ররূপ কুরংগকে রক্ষার আবেদন জানান। তার উত্তরে মহাচার্য উইলসন্ শ্লোকাকারেই আশ্বাস দিয়ে ব'লেছিলেন যে—"সংস্কৃতের প্রতি বিধাতার অসীম করুণা। তাই, সর্বদা বহু প্রাণীর পদাঘাতে নিষ্পিষ্ট, প্রখর সূর্যকিরণে দগ্ধ, ছাগাদির দ্বারা ভক্ষিত এবং কোদাল দিয়ে পরামৃষ্ট হ'য়েও দূর্বা যেমন বেঁচে থাকে, সংস্কৃতও তেমনি সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম ক'রে বেঁচে থাকবে।—

"নিষ্পিষ্টাপি পরং পদাহতিশতৈঃ শশ্বদ্ বহু প্রাণিনাং
সন্তপ্তা'পি করৈঃ সহস্র কিরণেনাগ্নি-স্ফুলিঙ্গোপমৈঃ।
ছাগাদ্যৈশ্চ বিচর্বিতা'পি সততং মৃষ্টা'পি কুদ্দালকৈঃ
দূর্বা ন ম্রিয়তে কৃশা'পি নিতরাং ধাতুর্দয়া দুর্বলে॥" (উইলসন্)

সুদূরে অতীত কাল হ'তেই বৃহত্তর ভারতে এবং নিখিল বিশ্বে সংস্কৃতকে অবলম্বন ক'রেই ভারতের সাংস্কৃতিক অভিযান চ'লেছে। ঐতিহাসিক সত্য

এই যে অন্ততঃ তিন হাজার বছরের ওপর সংস্কৃতই ভারতীয় মনীষার একমাত্র ভাষা ছিল। তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলার সর্ববিদ্যায়তনে বিভিন্ন দেশের জ্ঞানভিক্ষু বিদ্যার্থীর দল এই সংস্কৃতেই ক'রতেন নানা বিদ্যার চর্চা। খৃষ্টপূর্ব দুইশত বৎসর পূর্বে স্থাপিত ভিলসার কাছে গরুড়স্তম্ভ ও শিলালিপি পাওয়া গেছে। সেই স্তম্ভ হেলিওডোরাস নামক গ্রীক রাজদূত ভগবান বাসুদেবের উদ্দেশে উৎসর্গ ক'রেছিলেন এবং তার লেখাও সংস্কৃত ভাষায়। বাংলা ভাষার সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের" টীকা সংস্কৃত ভাষায়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেরও প্রাচীনতম টীকা সংস্কৃতে বিরচিত। অধিক প্রচলিত ভাষাতেই টীকা টিপ্পনী রচিত হওয়া স্বাভাবিক। হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার এই বিরাট ঐতিহ্য ও অফুরন্ত সম্পদ নেই বললেই চলে। আজও ভারতকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদা পেতে হ'লে সংস্কৃতকেই রাষ্ট্রভাষা করা একান্ত প্রয়োজন।

সর্বভারতীয় ভাষারূপে বর্তমানে সংস্কৃত এবং ইংরেজীকেই আমরা দেখতে পাই। নিজেদের সংস্কৃতের মত সমুন্নত ভাষা থাকতেও স্বাধীনতার পর যদি সেই জোর ক'রে চাপানো ইংরেজীর মোহ ত্যাগ ক'রতে না পারি, তবে সেটি লজ্জা এবং পরিতাপের বিষয়। ইউরোপের জার্মেনী, রাশিয়া, এশিয়ার চীন, জাপান প্রভৃতি বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলিতে কিন্তু ইংরেজী রাষ্ট্র ভাষা নয়। তবুও তাঁদের অগ্রগতি তথা আধুনিক প্রগতি কোথাও ব্যাহত হয় নি। সুতরাং, ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা না হ'লে আমাদের প্রগতি রুদ্ধ হ'য়ে যাবে মনে করা নিতান্ত অযৌক্তিক বলেই মনে হয়।

আঞ্চলিক ভাষাগুলির সংগে নিবিড় নৈকট্যের জন্য ইংরেজী থেকে আরো অল্প সময়ে এবং পরিশ্রমে সংস্কৃত শিখতে পারা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়-পরীক্ষায় সংস্কৃতের এবং ইংরেজীর উত্তীর্ণের হার তুলনামূলকভাবে বিবেচনা ক'রলে এই সত্য হৃদয়ংগম করা যায়। বাংলা শিক্ষার সংগে সংগেই শৈশবে আমরা ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করি এবং শিক্ষাকালে সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হয় ইংরেজীর ওপর। তা'ছাড়া, ভাল ইংরেজী শিক্ষার ফলে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রলোভন তো আছেই। তবু, প্রতিবৎসর সর্বাধিক ছাত্র ইংরেজীতেই উত্তীর্ণ হ'তে পারে না। আর, সংস্কৃত অত্যন্ত অবজ্ঞার সংগে দায় সারাগোছের ক'রে ৬ষ্ঠ কিংবা ৭ম শ্রেণী হ'তে পাঠ করা হয়। বাড়ীতে, বিদ্যালয়ে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে কোন উৎসাহ কিংবা বৈষয়িক উন্নতির কোন সম্ভাবনা বা প্রলোভন এর নেই। তবুও সংস্কৃতের শতকরা ৯০ জন ছাত্রই উত্তীর্ণ হয়।

সংস্কৃত ব্যাকরণের দুরূহতা নিয়ে কেউ কেউ ব'লে থাকেন। তাঁদের বলতে চাই, সংস্কৃত ব্যাকরণ দুরূহ নয়, সুশৃংখল বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইংরেজী কিংবা হিন্দীর তুলনায় অনেক সরল। ভাষার ক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক বিশৃংখলাই দুরূহতার কারণ। সংস্কৃতের মত শৃংখলাসম্পন্ন

সুসংবদ্ধ ভাষা জগতে আর নেই। তাই, যুগযুগান্ত ধ'রে অবিকৃত অবস্থায় এই ভাষা চলে এসেছে। সংস্কৃত প্রচারের পরই পাশ্চাত্য দেশে ভাষাবিজ্ঞান (Philology) নামক নতুন শাস্ত্রের উদ্ভব সম্ভব হ'ল। বাংলাদেশের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অতুলনীয় কীর্তি ব্যাকরণ-কৌমুদীর জ্ঞানই সাধারণভাবে সংস্কৃত পঠন পাঠনে যথেষ্ট। ইংলণ্ড, ফরাসী, জার্মেনী, হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামে ৬ মাসে কার্যকরী সংস্কৃত শিখিয়ে দেওয়া হয়। আবার যাঁরা ভাষাবিজ্ঞান এবং ব্যাকরণ নিয়ে গবেষণা ক'রতে চান, তাঁদের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র র'য়েছে ত্রিমুনি ব্যাকরণের গহন কাননে। সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকজন ভাষাবৈজ্ঞানিক মনীষীর অভিমত বিবেচনার জন্য উল্লেখ করা হল।—

Sir W. Hunter :—"Grammars of Panini stands supreme among the grammars of the world ··· It stands forth as one of the most splendid achievments of human invention and industry."

Prof Maxmuller :—"The achievments of grammatical analysis of India in Sanskrit are still unsurpassed in the grammatical literature of any country."

Prof Weber :—"Panini is universally admired for his shortest and fullest grammar in the world."

Prof Willson :—"No nation but the Hindu has yet been able to discover such a perfect system of Phonetics."

Prof Thomson :—"The arrangement of consonants in Sanskrit is a unique example of human genius."

সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, শিল্পকলা, শারীরবিদ্যা, আইন, যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞানবৃক্ষের সকল শাখারই চর্চা সংস্কৃতে হ'য়েছিল এবং এখনো হ'তে পারে ও হচ্ছেও। হিন্দী প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষার এখনো সে শক্তি আসেনি। দৈনন্দিন জীবনে কথ্যভাষা না হ'য়ে এবং ভারতীয় ভাষা সমূহের সংগে সম্পূর্ণ সম্পর্ক বিহীন হ'য়ে ফার্সীভাষা ভারতে পাঁচশত বছর এবং ইংরেজী দেড়শত বছর রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রচলিত হওয়ায় যদি কোন অসুবিধা না হয়, তবে একান্ত সম্পর্কযুক্ত সুসমৃদ্ধ, শক্তিশালী ভাষা সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হ'লে অসুবিধার পরিবর্তে সুবিধাই বেশি হবে বলে মনে হয়। এই বাংলাদেশেই সেন আমল পর্যন্ত যাবতীয় রাজকার্য সংস্কৃতেই নির্বাহিত হ'ত।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের আরো কয়েকজন চিন্তাশীল নায়কের দুয়েকটি কথা চিন্তা করার জন্য বুদ্ধিজীবীদের মনের দুয়ারে উপস্থিত ক'রছি।—

Pt Jawaharlal Neheru :—"If I was asked what is the greatest treasure which India possesses and what is her finest heritage, I 'would answer unhesitatingly it is the Sanskrit language and literature and all that it contains."

Sardar. K. M. Panikkar :—"Apart from Sanskrit, being

our greatest single national inheritance, the roots of our national behaviour, the pattern of our thought and the source of all our ideas being embedded in Sanskrit, a familiarity with it is neccessary for any one who claims to be a true Indian."

Dr. Rajendra Prasad :—Without a thorough knowledge of Sanskrit, our culture, our literature, our regional languages, our arts and our history, in short our whole life will ever remain an unsolved puzzle for us."

শ্রী কহৈয়ালাল মাণিকলাল মুন্সী—"অতীতবিষয়কজ্ঞানরহিতো দেশঃ বর্তমানাবস্থায়াং ন বিশ্বাসং প্রাপ্নুয়াম্বা ভবিষ্যৎকালে আশামুদ্বহেৎ। যদি সংস্কৃতমস্তং গচ্ছেৎ, ভারতো দেশশ্চ বৈ নৈবং ভবেৎ; সংস্কৃতাধ্যয়নস্য সংবর্ধনমন্তরা প্রান্তীয়া ভাষা ন বৃদ্ধিং প্রাপংনুয়ুঃ।"

ডক্টর শ্রী কৈলাস নাথ কাট্‌জু ঃ—"মম বিচারে সৈব রাষ্ট্রভাষা ভবেৎ, যা সম্পূর্ণেঽপি রাষ্ট্রে প্রচরেৎ। সংস্কৃতং মদ্রাস, গুজরাত, পঞ্জাব প্রভৃতি সর্বেষ্বেব দেশেষু প্রবৃত্তম্। সাধারণজনতায়াঃ ভাষায়ামেকস্য রূপস্য সম্পাদনং সংস্কৃতভাষয়ৈব কৃতম্। মম বিচারে সর্বৈরেব অস্মাভিঃ সংস্কৃতমধ্যেতব্যম্।"

এছাড়া বিহারের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল ডক্টর মাধবদাস শ্রীহরি আনে ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ডক্টর চিন্তামন দ্বারকানাথ দেশমুখ, সুপ্রীমকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি স্বর্গীয় ডক্টর বিজন কুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীর সুচিন্তিত অভিমত তো র'য়েইছে। পরিশেষে স্মরণ করি বাংলার স্বর্গত রাজ্যপাল, পণ্ডিত প্রকাণ্ড ৺ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের কুলপ্রদীপ, আজীবন শিক্ষাব্রতী, কুলপতিকল্প আচার্য, রাজর্ষিকল্প মনীষী ৺ ডক্টর হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত কথাগুলি—"বহু ভাষা, বহু ধর্ম, বহু কৃষ্টির সমন্বয়ে গঠিত এই বিশাল ভারতবর্ষের মিলনসূত্র নিহিত হ'য়ে আছে এই বিশাল দেবভাষার অন্তর্দেশে। মৃতভাষারূপে আখ্যাত হ'লেও প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতই ভারতের চিরজাগ্রত, জীবন্ততম, চিরপুরাতন অথচ চিরনবীন ভাষা। যে ভাষার অমৃত উৎস থেকে জন্মলাভ ক'রেছে অন্যান্য ভারতীয় প্রায় সব প্রাদেশিক ভাষা, যে ভাষার মাধ্যমে গ'ড়ে উঠেছে নিখিল ভারতীয়, নিখিল বিশ্বব্যাপী এক সার্বজননী কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃত ভাষা ভারতের রাষ্ট্রভাষা রূপে নামতঃ গৃহীত না হ'লেও কার্যতঃ হিন্দী, বাংলা, গুজরাতী প্রভৃতি ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষাসমূহের জননী ও অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে সংস্কৃতই হ'য়ে থাক্‌বে ভারতের একমাত্র শাশ্বত ভাষা।"

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর আজ দিকে দিকে দেশমাতৃকার রাজরাজেশ্বরী মূর্তি গঠনের পরিকল্পনা চ'লেছে। সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা রূপে হ'লে সেই কর্মসমাপ্তি ত্বরান্বিত হবে, বহু সমস্যা বিদূরিত হবে এবং সূচিত হবে ভারতবাসীর ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অভ্যুদয়।

ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রভাষা দ্বন্দ্বের নিরসনে লোকসভায় যে শুভ প্রস্তাব আলোচিত হয়েছিল, তার পূর্ণ বয়ান Proceeding of Loka Sabha হতে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য উদ্ধৃত করা হল।

সংস্কৃতকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করার জন্য লোকসভায় মাননীয় সদস্যবৃন্দের ভাষণ

গণপরিষদে সর্বভারতীয় সরকারী ভাষা স্থিরীকরণের সময় এই বহু ভাষা-ভাষী দেশে হিন্দীর মতো কোনো গোষ্ঠীবিশেষের ভাষাকে প্রাধান্য দিলে অন্য ভাষাভাষীদের প্রতি অবিচার এবং পরিণামে আত্মকলহের আশংকায় দূরদর্শী বাঙালী সদস্য ৺পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র সংস্কৃতকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সেই প্রস্তাবের প্রধান সমর্থক ছিলেন আর একজন বাঙালী মুসলমান সদস্য নাজিরুদ্দিন আহমেদ। গণ-পরিষদে আলোচনা কালে বহু যুক্তির অবতারণা ক'রে এই প্রস্তাবকে প্রবল ভাবে সমর্থন করেন ৺ডঃ বি. আর. আম্বেদকর, শ্রী বি.ভি. কেশকার, শ্রী টি.টি. কৃষ্ণমাচারী, ডঃ পি. সুব্বারায়ন, শ্রীযুক্তা দুর্গাবাই, শ্রী ভি. এস. মুনিস্বামী পিল্লাই এবং মাদ্রাজ ও বাংলার আরো বহু সদস্য। কিন্তু, প্রায় সকল দলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল তখন হিন্দীভাষা ব্যক্তিবর্গের হাতে। আর সেদিন অহিন্দীভাষী রাজনীতিকবর্গ নিজেদের দলীয় নির্দেশের বেদীমূলে দেশকল্যাণকে বলি দিয়ে হিন্দীর যূপকাষ্ঠে সংস্কৃতকে হত্যা ক'রলেন। ফলে এক ভোটের ব্যবধানে হিন্দী সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা রূপে সংবিধানে গৃহীত হ'ল। কিন্তু এই হঠকারিতা দেশে রচনা ক'রল গৃহযুদ্ধের ভূমিকা, সূচনা ক'রল সর্বজনীন মানবতার অপমৃত্যু। ফলে ১৯৫৬ সালে ৺বালগংগাধর খেরের সভাপতিত্বে Official Language Com ıssion এবং ১৯৫৭ সালে ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে Sanskrit commission যখন সারা ভারত পরিক্রমা ক'রে সর্বস্তরের জনগণের সাক্ষ্য গ্রহণ ক'রছিল, তখন হিন্দীর অন্যায় আধিপত্যের বিরুদ্ধে বহু ব্যক্তি অভিমত প্রকাশ করেন। বিশেষতঃ, ১৯৫৫ সনে রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সময় হিন্দীর বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিটি প্রাদেশিক ভাষাভাষী মানুষের বিক্ষোভ প্রকাশ পেতে থাকে। তখন সর্বভারতে সদ্যো-জাগ্রত এই গৃহযুদ্ধাচিকীর্ষাকে বিদূরিত করার জন্য "অখিল ভারত সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা সম্মেলনের" পক্ষ থেকে কয়েক লক্ষ লোকের স্বাক্ষরে সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের জন্য আলোচনার্থে প্রস্তাব আনয়নে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়। তখন লোকসভায় বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত সদস্য শ্রী চপলা কান্ত ভট্টাচার্য সংবিধানে হিন্দীর সংগে সংস্কৃতকে "সহযোগী সরকারী ভাষারূপে" গ্রহণের জন্য প্রস্তাব আনয়ন করেন। ১৯৬০ সনের ২২শে নবেম্বর প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হয় এবং ২২শে নবেম্বর, ৬ই ডিসেম্বর, ও ২০

৬ই ডিসেম্বর ঐ বিলটি দীর্ঘ সময় ধ'রে লোকসভায় আলোচিত হয়। নির্ধারিত সময় থেকে আরো ৩২ ঘণ্টা অধিক সময় বাড়িত হয় এই আলোচনায়। সময় পরিবর্ধনের প্রার্থনায় প্রথমবার পক্ষে ছিলেন ৮১ জন এবং বিপক্ষে ছিলেন ১৭ জন ও দ্বিতীয় বার পক্ষে ছিলেন ৩৯ জন এবং বিপক্ষে ছিলেন ১০ জন।

১৯ জন মাননীয় সদস্য এই প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। তা'তে ১৫ জন প্রস্তাবকে সমর্থন করেন আর বিরুদ্ধতা করেন মাত্র ৪ জন। যে ১৫ জন সমর্থন ক'রে বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন, তাতে ৮ জন কংগ্রেস, ২ জন কম্যুনিষ্ট, ১ জন জনসংঘ এবং ৪ জন ছিলেন নির্দলীয় সদস্য। ২ জন কংগ্রেস, ১ জন সোস্যালিষ্ট এবং ১ জন দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম সদস্য বিরুদ্ধতা করেন। আলোচনার ধারা এবং উৎসাহ দেখে অনুমান হ'চ্ছিল যে এই প্রস্তাব গৃহীত হ'য়েই যাবে। তাতে কোনো এক অজ্ঞাত নিগূঢ় কারণে স্বরাষ্ট্রবিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী হাজারনবীশ এই প্রস্তাবটিকে ভোটে দিতে দিলেন না। তাই, যে সকল সদস্য এই শুভ প্রস্তাবকে সমর্থন ক'রে আলোচনা ক'রে ছিলেন, তাঁরাই দলীয় নির্দেশের ফলে ভোটদানের অধিকার হ'তে বঞ্চিত হলেন। এই ভাবে গোষ্ঠী অথবা ব্যক্তি-বিশেষের অশুভ সংকীর্ণতাবোধ এবং অজ্ঞতার ঔদ্ধত্য দেশকে একটি মহৎ কল্যাণের আশীর্বাদ হ'তে বঞ্চিত ক'রল। তখন যে সকল দূরদর্শী মাননীয় সদস্য সংস্কৃতের সমর্থনে আলোচনায় অংশ গ্রহণ ক'রেছিলেন, তাঁদের সেই ভাষণাবলীর অংশবিশেষ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত লোকসভা ভাষণাবলী হ'তে সংগ্রহ ক'রে নীচে উদ্ধৃত করা হ'ল।—

22nd November, 1963 **[from 15-14 Hrs to 16-30 hrs (1 hr. 16m)]**

1. Shri Chapala Kanta Bhattacharya **(Raigrnj, West Bengal), Congress.**

The incidents that have been happening in the House during the last two days amply demonstrate the need for making provision for a *neu r l l nguage.* (For this) my bill seeks to add Sanskrit to Hindi in Article 44 ......

I would only submit that if Sanskrit could play a very vital role in the life of India, why should it be debarred from playing that role in free India now ? When I suggest that Sanskrit be accorded the status of an official language, I do not make a new or surprising proposal. In fact, that proposal has been pending before the country since the days of the Constituent Assembly. In the Constituent Assembly, the

proposal was mooted by Shri Naziruddin Ahmed that Sanskrit be accepted as the sole official language of India.

The proposal has been before the country all the time and has agitated public mind The Government of India appointed the Sanskrit Commission in 1956. One of the recommendations of that Commission was that Sanskrit be accorded the status of an additional official language.

I do not want to disturb the position of Hindi or English. But I just want to try to make a way out of the linguistic controversies that we are seeing before us now. The Hon'ble Prime Minister has laid down that the official language of India should not be a foreign language and the same time, it must be a language of all acceptance—I submit, again, that there is only one language in the world which satisfies both the aspects, and that language is Sanskrit.

In putting up the claim for Sanskrit I should say that Sanskrit is not unknown to the Constitution. The Constitution has specifically laid down that in developing Hindi, it should primarily draw upon Sanskrit. The Constitution having specifically laid it down, a recognition is given to the language itself. Again, without being a regional language it is included in the Eighth Schedule of Indian languages recognised by the Constitution. The Prime Minister has stated that all the languages in the Eighth Schedule are regarded as national languages.

I should say, Sir, that Sanskrit enjoys a status more than a national language. It is one of the *international languages* of the world having got that recognition·········

In course of my tour in Europe and America, I approached every University and tried to find out what arrangements were there for the study of Sanskrit·········

That is the position that this language enjoys, and that is what I would like to bring forward as the background of my Bill which I am placing before the House today. If Sanskrit is accepted, then Sanskrit will automatically receive inter-

national recognition. I will go further and say that *it will help international understanding between the East and the West.*

Some of the questions which have been raised against this proposal are superficial. One argument is that Sanskrit is a dead language and a dead language can not be made the official language of a State. I join issue there. In one of his lectures in the London University, Prof. Max Muller deals with this question whether Sanskrit is a dead language and he comes to the conclusion that it is not, for he says that Sanskrit plays a vital role in the life of the people of India and a language which has a vital force in India cannot be regarded as a dead language.

The other objection that is raised is that Sanskrit is not a spoken language A question is asked whether a language can be accepted as an official language when it is not a spoken language. To that my reply is, to be an official language it is not necessary that the language should be the language of the masses Today we have English as an official language of India and we have fought for it It is the language of only the intelligentsia, and language of the intelligentsia has been accepted in the Constitution as the official language of the Union. In that way Sanskrit has always been the language of the intelligensia in India.

Sir William Jones carried out extensive researches in 1786 and came to the conclusion that for a long time Ssnskrit was the language of administration for courts and used for other official purposes. From the day of Sir William Jones, I would come to the days of the University Education Commission presided over by Dr. S. Radhakrishnan. The Commission has come to the conclusion that "*Sanskrit was all the time the languafranca of the world of learning in India*," and this position it has held all the time in India. Therefore there is not the least difficulty on that score and we may revive that tradition and bring in Sanskrit to the

stage in which it may be accepted as an official language·······

Sanskrit presents the greatest common measure of agreement amongst the languages of India not only in their vocabulary but also in their spirit, and that is why the Constitution in article 351 has accepted the position that Sanskrit should be the basis of our official language. Then again, I believe, more than many thousands of years old Indian culture is based on Sanskrit language and literature and to-day for bringing about unity in thought, Sanskrit would be of great help. In fact, unity of India depends upon Sanskrit. Then again, it is one of the most advanced languages of the world. Further, from the point of view of national solidarity, special advantage should be taken of the fact that Sanskrit presents a language which is not belonging to any particular region or any particular State. Therefore if it is accepted as an official language, it willnotparticularly favour any one or put any particular difficulty or disadvantage to any region or to any section of the people. When this language is included in the Constitution all the States will be equally placed in regard to advantages or disadvantages. Therefore, none of the States will feel its rights or privileges curtailed in any way or feel that any undue advantage has been granted to another State because of Sanskrit being accepted as an official language of India.

The other question is whether it has the dynamic effect which an official language ought to have. Here I could mention the distinguished namesof the persons who appeared before the Sanskrit Commission and suggested that it might be accepted as an official language (They are) Sardar Panikkar, Sir C. V. Raman, Shri Sriprakasa, Dr. K. N, Katju and Shri Patanjali Shastri. Shri Patanjali Shastri, after he retired from the Supreme Court, suggested in a public lecture that Sanskrit should be accepted as an official language of India. Sir C. V. Raman went a little further. He said that Sanskrit should be declared as the linguafranca of India.

As I have stated already it has much support in the country. What is wanted is that there should be a move on the part of Government to do the justice which it deserves and requires.

I have referred already to some of the objections and whether this old language can be resuscitated as an official language of India. The State of Israel came into existence in the year 1948. The 15 years old State has brought back into existence the many thousands years old language Hebrew, and is using it for all official purposes of that State. The acceptance on Hebrew and its introduction and continuation as an official language has not hampered its administration or its progress in any way. If they could have done it, what is the difficulty in our country for not accepting Sanskrit as an official language ?

The difficulty is that we are habituated to think of it only as a classical language, The idea should be shaken off from the mind. It is a living language. Original books are being written even now. Researches are being carried on. There are thousands of persons who speak fluentlyin Sanskrit and amongst themselves they speak only in Sanskrit I know of families where even the womenfolk speak in Sanskrit.

It is a living language of our culture, our heritage, our literature, our thought, our philosophy, and I maintain our political administration too.

In referring to the political administration, allow me to refer to one instance only. The White Paper No II on Chinese matters brought out by the External Affairs Ministry contains a chapter on the Himalayas. In trying to establish its claim on the Himalayas, the Government of India had to ransack the entire Sanskrit literature from the Vedas down to the middle ages. It begins from the Vedas and comes up to the days of Kalidasa.

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ ।

So, Sanskrit is not a mere classical language. As I stated,

it serves the Government of India in a very urgent diplomatic negotiation and it would be graceful and grateful on the part of Government of India if they admit their obligation to the language, the language which has served them even now in such an important matter.

If we give it the recognition, we get the advantages out of it. If we do not give it the recognition, we lose much of what we should not, That is my submission and I hope, with what I have stated, the Government will agree to have my Bill circulated. If the public opinion be there it will come back to the House and the House will consider it.

22-11-63

2. *Nalini Ranjan Ghosh* (Jalpaiguri, West Bengal), Congress.

The object of the motion of my Hon. friend Mr. Bhattacharya is very modest......

There are some salient features of Sanskrit which have to be borne in mind by all of us. Sanskrit is definitely the integrating factor to keep the whole of India together. Sanskrit is the golden thread which knits the whole of India together and which helds it together. It is actually the symbol of our national life. As a feeder language, it has got a unique position. The grammar of Tamil and the grammar of other Southern languages has been patterned from Sanskrit.

My friend has already given some views of the top men of our country. I shall quote a few more. Shri Jawaharlal Nehru made the statement before the Sanskrit Commission that Prof. Oppenheimer, the famous American Atomic Scientist, spends considerable time in reading Sanskrit and Pali.

As a matter of fact it is now admitted that Sanskrit has contributed very richly to Medicine, Mathematics, Astronomy and to other scientific subjects. Shri Nehru also said :

"I would personally like as many Indians as possible to know Sanskrit which is the very basis of our culture."

The late lamented Shri G B Pant said that Sanskrit has given symphony to our life. Hon. members of the House know that Bala Gangadhar Tilak, Pandit Madan Mohan Malaviya and others were great votaries of Sanskrit. Mahatma Gandhi was also a votary of Sanskrit He said that the Gita was the breath of his life and that if only for reading the Gita people should read Sanskrit

I shall read out another quotation from the Report of the Sanskrit Commission. At page 66 of the report, we find :

"The Director of Public Instruction of Madhya Pradesh, who is a Christian, told that the he advised the Anglo-Indian students also to read Sanskrit. It was necessary that, as future citizens of India, they gained an insight into the mind and the culture of the bulk of the Indian people And this, he added, was possible only through the study of Sanskrit."

This shows the approach of other communities too. (Refers to large number of persons who supported the Resolution in the Constituent Assembly for making Sanskrit the official language of India.) I am putting forward the fact to show that as a matter of fact, they accepted the position that Sanskrit has got a unique position in India and further, *if Sanskrit be now accepted as an associate official language, then much of the bitterness that is raging in the country at present would disappear*······

I would now refer to the recommendation of the Sanskrit Commission :

"That in view of the cultural importance and an-Indian character of Sanskrit, and with a view to arresting the growth of fissiparous tendencies of linguistic parochialism, which are at present threatening the unity of India (through the agency of Sanskrit which has, through the ages, played the role of a great unifying force in the country), Sanskrit, which is already one of the languages recognised by the Constitution, should be declared as an Additional Official Language (by the side of Hindi and English, for the time

being) to be used for such public purposes as may be feasible."

I would only mention here that for thousands of years Sanskrit has been the national language of India. Sankaracharya in olden times and even recently Dayananda Sarasvati preached through out India the Veda through the medium of Sanskrit Vivekananda in many of his discourses, when pandits of the South and the North assembled together, had to speak in Sanskrit. Sanskrit holds such a unique and great position in India that the Bill, which is a very modest Bill, should be accepted unopposed.

22-11-63

3. *Shri K. K. Warior* (Trichur, Kerala), C.P.I.

I support the motion of Shri C. K. Bhattacharya to circulate the Bill for eliciting opinion thereon. There is a large consensus of opinion in the country saying that Sanskrit should be made the national language precisely because they are pacifists who do not want to fight for any particular language, especially that language which is suggested at present as the national language of India. For instance, people coming from Bengal cannot say the Bengali should be made the national language, at the same time they do not relish very much, Hindi being foisted upon them. So as a via media they suggest that Sanskrit be made the national language.

Even with some limitations, I think that this subject will arouse much academic interest at least among the enlightened people, and as such it will not be futile to have it circulated and get the considered opinion of at least the uppermost strata in our Society.

22-11 63

4. *Dr. Sarojtni Mahisi* (Dharwar North, Mysore), Congress.

I do welcome this Bill, and the Hon. member has rightly brought this Bill at this particular moment when there is so

much harangue in the House about the official language. Right from the beginning of the Constituent Assembly, time and again a move has been made to make Sanskrit one of the official languages of India.

The learned people used to speak in that language, it was the court language. That was the language of the people also. But that was not patronised. Up to Sankara, Ramanuja and Madhava's period all these intellectual discourses were written in Sanskrit only.........

Therefore, in order to understand the spirit of our Indian culture, our highest literature, our great heritage, it is necessary that we shall haue to give a proper place for Sanskrit not only in the examination hall, but in our society, in our politics and in our life as a whole.

22-11-63

5. *Shri Yaspal Singh* (Kairana, U. P), Independent.

Mr. Dy. Speaker, I give thousands of thanks to Shri Chapala Kanta Bhattacharya for introducing such nice Bill in the House. An Hon. member has said that this language (Sanskrit) has become old and stagnated. But can the language in which is written the Gita, the Vedas, the Ramayana, the Upanishads, ever become old ?

If the newly created state of Israel is able to revive Hebrew which was dead and 2000 years old, there is on reason why India should not be able to carry its on Government with Sanskrit its ancient and greatest language.

I earnestly appeal to the Home Minister to accept the Resolution.

22-11-63

6. *Shri Sachindra Chaudhuri* (Ghatal, W. Bengal), Congress.

I welcome the proposal made by my esteemed friend, Sri Bhattacharya for this reason that I feel that Sanskrit has a merit which is beyond the merit of all the current languages

to day in India which entitles it to be considered as a national language.

Much of what I want to say has already been said. What should be the criteria in modern times for any language to occupy the position of national language ? Firstly, it must have its origin in the country. Sanskrit has that. In fact, as suggested by practically every one of my friends, Sanskrit is the mother of all languages. It should not have any conflict with any other language. What question is there of conflict between mother and daughter ? Everybody accepts that Sanskrit is suitable. It is not that Sanskrit comes into the arena for the purpose of disputing the position of Hindi. That is not the idea.

Let us consider what Sanskrit can do. If this language is used for the purpose of everyday business and conversation, one has got to see whether it meets the requirements. For that my suggestion is that Sanskrit is a language which by its very construction and grammar is capable of absorbing into itself and expressing any new idea or novel idea which comes in. Sanskrit has never eschewed the journey into it of other languages or other nations. In fact, it has always absorbed words from other languages. If we accept it today for our purposes, there is absolutely no reason why the process should not go on and why we should not take into it words form other languages and distil it through the means of Sanskrit grammar. That can be done.

It is certainly a matter of congratulation for us that this language raises no dispute between one region and another which a regional language may do. It certainly has the other virtue that it does not try to claim excellence over any particular language.

The position today is that we have to keep English alive because no particular language, not even Hindi, has that university or universal acceptance in the country. Which would make it useful to every ctitizen of the country,

Sanskrit is capable of that because there is no resistance to it from anywhere. You will find a few man in every village in India, who can speak Sanskrit and who can express themselves in Sanskrit—it may not be classical Sanskrit, it may not be learned Sanskrit but it will be enough to understand a person from any part and enough to express one's thoughts to make a conversation possible

The English language claims to be a language which is of universal appeal, which opens the door to the west. The door to the west was opened by the Sanskrit language as has been demonstrated by Shri Bhattacharya, because the first glammering of culture of India travelled to the west through the Sanskrit language and its study. Therefore it is evident that it is capable of not only of opening but keeping open that window which lets in western light and takes our light to the west.

If these are good reasons, that this language is capable of being brought to life again, and if it has been sleeping, *it has only been sleeping and not died* : if it is also ture that other countries have taken interest in this language, and learned people in other countries have studied the language sufficiently to converse with learned people in our country, why should this proposal be not accepted ?

There is only one other thing that I want to bring to the notice of this House. A certain amount of doubt has been raised as to whether Sanskrit is a dead language or the language is alive. I am not going 2000 years back. I have told you that today the language is studied. The language is capable of rendering any thought. In support of that, if I may introduce a note of personal experience, I want to tell you an instance. It is an incident only about 30 or 35 years back. There was a gentleman by name Ananta Shastri. He was from the South, a very learned man, a professor of Sanskrit of the Madras University and later transferred to the University of Calcutta. That gentleman had one of his

books plagiarised. He wanted to have a copy right. He was not well versed in English. He spoke only little Hindi. The only language in which he conversed with people in Northern India or even Bengal was Sanskrit. He came along seeking somebody who understood simple Sanskrit. It was may good fortune to meet him. He wanted to ask whether the court had jurisdiction or not. The word "jurisdiction" had been sought to be translated into modern Indian languages and I am yet to come accross a word which correctly represents it. The word "copyright" is also considered as rather difficult of translation. This gentleman has no difficulty in translating it.

What he said to me was this :

অস্য ধর্ম্মাধিকারস্য স্থানাধিকারত্বম্ বিষয়াধিকারত্বম্ অর্থাধিকারত্বং বর্ততে বা ন বা।

Has this court got jurisdiction as to the territory, as to the subject matter and as to the amount involved ?

পুস্তকস্য অনুভারস্বত্ববিষয়ে ব্যবহারদাতুম্ ইচ্ছামি।

I wish to institute a suit in respect of the copy right of my book. This is what he said, simply, clearly and without any difficulty for me. who does not claim to be a Sanskrit scholar, in understanding what he said. If the language is capable of rendering thoughts which are entirely modern, which are discussed in modern courts and the language has been used in the past for expressing every kind of scientific thought, is it a language to be eschewed ? Is it a language to be denied the place which it pre-eminently deserves, in fact a language which is enshrined in our Constitution earlier ? Is it a language which has got to be denied its chance of recognition by the country as an official language ? It is not a question of whether it should or should not get into the Constitution. That is a very moderate suggestion or submission made by my esteemed friend, Shri Bhattacharya. If I have taken up your time, I apologies, but I think the occasion demanded that something should be said by somebody who does not

claim to be a Sanskrit scholar and who has got every admiration for English language.

6. 12. 63 (14. 30 hrs. to 17 hr = $2\frac{1}{2}$ hours).

7. *Shri Ramesvaranada* (Karnal, Punjab), Jan Sangh.

The Hon'ble Member Shri Bhattacharya has delivered an excellent speech on the Bill introduced by him. In respect of the Bill I say that Sanskrit was not only the official language of India during the time of the Mahabharata, but it had travelled beyond India and had recognition in other countries as well. The Aryans travelled and moved throughout India from North to South and West to East and carried the same language (Sanskrit) with them. I am surprised to find that an Hon'ble Member says that Sanskrit was never the language of the people. But I cannot blame him as he has not read Sanskrit. I pity those who say that Sanskrit was never the language of the people. They have read only the history of the Mughal period and are ignorant about the period previous to that.

I say that had Sanskrit been made the only official language from the beginning of the Constitution, and not an additional official language as is being proposed now, the quarrel over the language that are raging in the country would not have arisen at all. Even if we accept it as an additional official language now, all the bitterness will disappear

In our regional language (Hindi) there are thousands of Sanskrit words. So also in Marathi and Gujrati In Bengali, the Sanskrit words are innumerable. If anybody speaks in Sanskrit to a person who knows Bengali, the latter will at once understand the substance thereof. So also is in the case of Punjabi, which contains thousands of Sanskrit words. If Sanskrit is made the official language, then there will be no quarrel in any manner.

For the reasons I state that if Sanskrit is recognised as the official language along with Hindi, there cannot be any reasonable objection to it. *If we can learn English,*

the language of the people living beyond the seven seas ; if we can learn Arabic and Persian, the language of the people living in foreign lands, it will take very little time for us to learn Sanskrit, the language of our own land.

8. *Shri Hirendra Nath Mukherjee* (Calcutta), C. P. I.

Though I do not envisage Sanskrit in practical terms as the national language of our country to be used for all official purposes, I think that the motion which has been brought by my Hon'ble friend, Shri Bhattacharya deserves the support of the House, particularly because of a certain crisis which seems to have arisen in our country in regard to the language problem. Mr. Bhattacharya has very modestly put up the case for Sanskrit not to be the sole official language of our country, but as one of the alternative languages to be used for official purposes. And that modifies the position to an extent which I think, ought to mobilise the support of this House for his motion.

If goes without saying how very much this country owes to the glory of Sanskrit not only in order to satisfy our national self respect, but also to sustain the day to day inspiration which ought to be there if we are going to conduct ourselves properly in a free India. Our country, our State has for its motto, the Sanskrit saying সত্যমেব জয়তে নানৃতম্ (Truth alone triumphs, not falsehood). There are mottos inscribed on the walls of the Parliament House which are couched in Sanskrit mainly because it has the classical quality of conciseness and the profoundest significance at the same time. There are so many other ways in which we can remind ourselves of the glory of Sanskrit and how much we owe to it.

I do not for a moment deny that Sanskrit even today, even in degenerate days, has a very great position of importance as a unifying factor.

After all, Sanskrit has been a cementing factor. Muslim scholars have studied Sanskrit very carefully. Since we

owe to Sanskrit so much of that inspiration which alone can help us to go ahead, let us try to find out what our people feel about it. If we can co-exist with English, if Hindi and English can co-exist, why not Hindi and English and Sanskrit also ? In the South people are putting up the question : let us support English because Hindi-predominance is going to be a dangerous thing. Now how are you going to answer this ? Let us find out what they feel in regard to Sanskrit. If the South feels that their apprehensions can be mollified by the adoption of Sanskrit as an additional alternative language, let us find out. And Mr. Bhattacharya wants nothing more than to have the elicitation of opinion, and therefore. I feel that this is a matter which ought to be supported.

11. *Shri Hanumanthaia* (Bangalore City, Mysore), Congress.

The Bill before the House has attracted great attention throughout India mostly in the intellectual circles. The other day I read in a paper that a great leader like Dr. Katju saying that Sanskrit would be a very effective All India link for the purpose of Indian unity. I agree with that view. But as every thing has its own laws and principles, so has language, which changes in two dimensions ; in time and in space. This law seems to be as effective and lasting almost as the law of gravity. You see any language in any country. It reigns from place to place and from time to time. In the case of Hindi, I am told that there are at least 25 varieties differing from place to place in Northern India.

This law is applicable to Sanskrit also. It has changed in course of time and in course of space. Our best works in the field of religion and literature are embedded in this language. We should not neglect these ancient heritages merely because it did not happen to be current language or current coin of literature.

Every greatman whom we come across in English history or politics studied Greek and Latin in the grammar schools

or in other schools. That gave them such a good foundation that they started on the inheritance of their forefathers or what is called the European heritage or renaisance.

If you want our youth to rise in stature and standards and achieve great things for this country, *their education must be solid and that can only be done by studying* Sanskrit.

Sanskrit has attained such a great height, that no regional language in India, no modern language in the world has been able to attain as yet that height of excellence in the field of literature and religion.

Therefore, I would request the House to include it as one of the languages in the schedule but not necessary for the purpose of official intercourse. If we include English as one of the languages in the Schedule, self-respect and gratitude to our fore-fathers demand the inclusion of Sanskrit as one of the official languages.

12. *Dr. Madhavdas Sri Hari Aney* (Nagpur),
Independent.

Shri Bhattacharya only wants that after the word "Hindi" the words "and Sanskrit" shall be inserted. All that he wants is that Sanskrit should be recognised and honoured as an official language along with Hindi. There is no danger of Hindi being superseded by Sanskrit. Therefore, if this Bill is passed as it is, there is no danger of Hindi being superseded by Sanskrit. Reasons are as follows :—

Firstly, if we are to really carry out or implement the position which is given to Hindi in the Constitution, then Hindi has to be developed and enriched. That can be done only if Hindi and other national languages which are mentioned in the schedule draw heavily from the treaures of Sanskrit.

Secondly *if there is any language whick has really close touch with the majority of languages of India, it is only the Sanskrit language.* Therefore, if all the regional languages of India cannot be made the official languages but some

languages should be recognised as official languages. Sanskrit is the only language which can perform that function.

Out of Sanskrit has grown several languages. Shauraseni, Magadhi, Paisaci and Maharashtri are the four languages out of which most of other vernacular languages have grown. Besides the vocabulary of words in all these languageg, which have ultimately new grown into our modern languages, is mostly Sanskrit. Almost 80 per cent of the words of these languages are from Sanskrit.

So in a way, Sanskrit is the only language which has close association with almost every language, with all the people who speak different languages of India. Therefore the people of India have got common respect for this language second only to their mother toungue.

Now the modern educationists find it difficult to make adequate provision for encouraging the study of sanskrit. Not withstanding the fact that the entire Indian culture illumined with the impress of Sanskrit, *proper provisions for the study of Sanskrit is not made and the attention which it ought to deserve is not given to it.* If we include Sanskrit as official language in the Constitution, as Shri Bhattacharya has suggested, naturally a situation will arise where the position of Sanskrit will improve.

I feel confident that the demand (recognising Sanskrit as the Rashtra Bhasa) which is the only natural and rational solution of the problem of Rashtra Bhasa for India will forcibly attract the attention of those who are for the present at the helm of the Central Government. They learn after bitter experience and therefore it takes time.

13. *Shri N. S. Ranga* (Chittoor, Andhra Pradesh), Swatantra.

I would like to associate myself with the supporters of this idea that Sanskrit should also be included in the list of languages which are to be recognised by the nation as a part of our national heritage and if we should have any

link languages in this country, Sanskrit should also be one of the link languages.

At Oxford I was forced to study French and German. It was a difficult task and yet I learnt them. We had to learn two other European languages in addition to English. If that is the case even now with the British Universities, why should we not also make a similar effort in our country ?

If we want to develop our own languages, we must see to it that mother language, the Sanskrit language is developed, preserved and protected..........

In that way, we can preserve this great treasure not only of our past culture and past thoughts and past poesy, but also we will be able to develop our own genius through Sanskrit and through our genius we can develop Sanskrit literature also. So, I am in favour of this motion.

14. *Shri A. T. Sarma* (Chatrapur, Orissa) Congress.

We are now using Sanskrit in an indirect form. From birth to death we are using Sanskrit only The other languages are for our own purposes. But, for these সংস্কারs starting from জাতকর্ম up till the death ceremony, we use only Sanskrit, and we perform all these সংস্কারs in Sanskrit.

If we wake up in the morning, we recite Sanskrit Slokas. When we take our bath, recite Slokas. If we perform any puja and worship our gods, we worship them in the Sanskrit language. If our children begin their lessons, they begin with শ্রীগণেশায় নমঃ। For any auspicious work we begin or we do, we say first শ্রীশুভমস্তু or বন্দে মাতরম্ or ওঁতৎসৎ. Similarly, if we conclude any thing, we say ইতিশ্রী. *So even now Sanskrit is in use in various forms.* And therefore we could not afford to neglect the Sanskrit language, even though we may speak so many languages in India.

If we look at the actual official position, we can see that even our Government are using the Sanskrit language in several forms. Our motto সত্যমেব জয়তে is a Sanskrit term, Even the technical terms which have been coined in Hindi

are almost 99 per cent Sanskrit words. So, Sanskrit is not out of use. *It is not a dead language.* Still it is alive in our country

If Sanskrit is adopted as the official language, *it is not difficult. It can be learnt very easily, within one year.* There are two aspects of Sanskrit, one the language side ; the other the শাব্দিক side. Learning the শাব্দিক side will take a long time, even 40 years. *But the language side can be learnt in one year. If Sanskrit is adopted as our official language. I think all the world will welcome it, and Sanskrit will flourish among our languages. So in my opinion Sanskrit is the language best suitable to be chosen as official language.* I whole heartedly support the motion.

16. *Shri Raghunath Singh* (Varanasi, U. P. Congress.

My friend, Mr. Mutta Gounder (D. M. K.) who perhaps belong to Tamil nationality has very nicely opposed the Bill. But perhaps he is unaware of his own history. There was a time when the Mayapith Empire was established by the Tamil people in Cambodia, Thailand, Vietnam and Malaya by Emperor Vijay. *In the 12th century A. D. these Tamil people made Sanskrit the State language of these countries.* Let us have look on Andhra. The Andhra people established the Moan Empire in Burma which extended from Pegu to Mandalaya. *State language of this Empire was Sanskrit* ; and it remained so upto the 12th Century A. D. Take the case of Malayasia where people of both Tamil and Andhra nationality were inhabitating. Malaya's last king was Parameswaran. He adopted the Arabic script *but the state language remained to be Samskrit.* It was only about 130 years ago.

Take the case of Kashmir, 90 per cent of the people there are Muslims. Our "Deeds of Rights" are printed in small books in English. But the language of Kashmir was the language of "Loka Prakash" upto the Moghul period. This book was written in Sanskrit and had been current in

the society from the 5th century B. C. upto the 16th century A. D. Of course during the time of Zainul Abedin a few words of Arabic and persian infiltrated in. "Loka Prakash" during the time when the rule of Islam was established in Kashmir, but its language remained the same, namely, Sanskrit.

It is no doubt true that books on Buddhism were written in Pali But *Buddhism could not flourish in India until Buddhist literature was translated into Sanskrit.* It was after Asvaghosha had translated the life of Buddha and books on Buddhism into Sanskrit, that Buddhism spread all over India, and South East Asia. Prior to that it was confined to Bihar and Uttar Pradesh. Those who say that Tamil is different from Sanskrit forget their own history, their own glory. They forget that they spread culture in Borneo, Sumatra and Java and carried Sanskrit with them. I therefore stand for this Bill and express my desire that Sanskrit may be made the official language.

17. *Shri Prakash Vir Shastri* (Bijnor, U. P.), Independent.

I welcome the Bill introduced by Shri Bhattacharya with all my heart. Two or three questions have been raised regarding this Bill in the House. Some friends have said that when Sanskrit was the state language, it taught one class of people to hate another class. Some member has blamed Sanskrit for caste system in our country amongst the people. Some has said that Sanskrit was never the people's language at all - it was a language limited to a class.

To those who say that Sanskrit begot the feeling of superiority and inferiority, I would only refer to a Mantra of the Rigveda :—

যথেমাং বাচং কল্যাণী মা বদানি জনেভ্যঃ ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্যায় স্বায় চারণায় ॥

It means that the pious voice of the Vedas or this storage of knoweledge does not belong to any particular class or caste. It belongs equally to Brahmins. It is equally

acceptable to the Aryas as well as to Anaryas. Any distction ever made between Anaryas and Aryas was based only on social behaviours. Those who followed the tradition of the society and obeyed the rule of law were regarded as civilised and were called Aryas ; those who behaved otherwise were called Anaryas. These names were not based on caste system but on the social arrangements Knowledge stored in Sanskrit was meant for all equally. Sanskrit never begot or encouraged the so-called caste feeling.

Rr : Whether Sanskrit was ever the people's language I would place only two instances before you. One is found in Bhoja Prabandha One day a man was crossing a river with a bundle of wood on his head. King Bhoja was coming from the opposite direction. Finding that the man was sweating, the King asked ভারং কিং বাধতি ভদ্র ? (Do you feel pain by carrying the load ?) The man replied ভারং ন বাধতে রাজন্ যথা বাধতি বাধতে. (The load does not pain me so much as the use of the word বাধতি in place of বাধতে) This reveals the knowledge of Sanskrit possessed by even a man belonging to the class of wood-cutters. One more example. The famous Kumarila Bhatta during the days of the great Sankaracharya, went to the native place of the erudite scholar Mandan Misra and enquired from the villagers about the location of his house. An ordinary man promptly replied :

স্বতঃ প্রমাণং পরতঃ প্রমাণং কীরাঙ্গনা যত্র গিরো গিরন্তি।
দ্বারস্থনীড়ান্তর-সন্নিরুদ্ধা অবেহি তন্মণ্ডনমিশ্রবাসঃ ॥

Know that to be the house of Mandana Misra where you will find that even the female parrots are discussing with each other whether the Vedas prove themselves or are to be proved by some other external evidence. Even after reading these instances if any body says that Sanskrit was never the people's language, it would show that he is ignorant of history of our land.

The volume of Sanskrit literature is also enormous. It

possesses Lilavati's Mathematics, Panini's Grammar and Kautilya's Arthashastra, which is regarded as a wonderful book on politics, so much so that it was first of all translated into German at the instance of Hitler himself. It has the Panchatantras in which priciples of politics, social behaviour and conduct of a householder have been illustrated in simple language through short stories. It has also Aeronautical Science of Bharadvaja. There is no knowledge and learning in the world which is not found in Sanskrit.

People say that in our country Pali or Prakrit was the current language. The ease is just the same as Hindi. In the province I hail from, there is not one single form of Hindi, there are several different forms which we call dialects differing from place to place. In the same way as আর্যপুত্র in Sanskrit became অজ্জউত্ত in Prakrit ; the word was same , but was pronounced differently due to difference in place or ignorance as we have just seen that some people orthodoxically adhere to use Apabhramsha and not Sanskrit. But how can Sanskrit be blamed for this ?

Concluding my speech I want to say only one thing more. It is our good fortune that Shri Rajagopalacharya, the first Governor General of Independent India, Dr. Rajendra Prasad, the first President of India, Dr. Radhakrishnan, our present President, all have been scholars and lovers of Sanskrit. This is also our good luck that whoever sits on the chair on which ধর্মচক্রপ্রবর্তনায় is inscribed, whether he is G. V. Mavalankar or Shri Anantasayanam Ayenger, or Shri Hukum Singh, all of them are erudite Sanskrit scholars. All our Home Ministers also whether he is Sardar Ballabh Bhai Patel, or Govind Vallabh Panth, or Dr. Kailash Nath Katju, or Shri Lal Bahadur Sastri, all are lovers of Sanskrit. I do not know about Shri Guljarilal Nanda. But unfortunately for us, in spite of all these stalwarts, Sanskrit was not made popular, or even a

compulsory subject of study in the State as it should have been. *We did not do justice to Sanskrit, or to ourselves.* I believe Sanskrit will get some strength from this Bill of Shri Bhattacharya. This Bill has given us an opportunity to think over the matter again.

With these words, I again welcome the idea of the Bill.

18. *Shri D. C. Sarma* (Gurudaspur, Punjab), Congress.

I rise to pay my tribute to all persons who have spoken in favour of this Bill. I also offer my felicitations to those who have spoken against the Bill. I think Shri Raghunath Singh has given the most devastating reply to those persons who thought that Sanskrit was the language of separatism.

20. 12. 63. (14.01 hrs. to 15. 24 hrs.)

19. *Shri Hajarnavis*, The Minister of State in the Ministry of Home Affairs. (Bhandara, Maharastra) Congress.

I am one of those who, though not proficient in Sanskrit have very great regard and affection for Sanskrit, and one of the minor dissatisfaction in life which I suffer from is my wholly inadequate knowledge of Sanskrit. *Sanskrit, of course, is the fountain head of our cultural life.* It has very rich literature, and as I expressed at the other place, two days back, *no study of northern languages will be complete without a knowledge of Sanskrit.* Of course I am not competent to speak of the southern languages. But I am told Malaylam and Telegu have also a very large percentage of Sanskrit words. I am quite sure that no one can be fluent or proficient in Bengali, Marathi etc. unless he has adequate knowledge of Sanskrit. Sanskrit, with its almost perfect grammar, with its highly developed science of Alankaras which is adopted in the regional languages, ought to be regarded as a necessary subject of study, at least in the secondary stage. Speaking for myself, I am one of those who feel like that. But all this will not permit me of it being prescribed as the official language. When a census was conducted in India, as mother-tongue not more than 500

people claimed to speak in Sanskrit, so that the very pre-condition, the actual necessary condition for a language to be prescribed as an official language, that is to say, the language in which Government transacts its business, is wanting in this particular language. Therefore I must oppose the motion for circulation.

Shri Chapala Kanta Bhattacharya in reply.

I thank the Hon. Minister for the speech that he has made in support of Sanskrit. While I admired his argument, I was surprised how he could avoid the inevitable conclusion that a language which have such a footing in the country should be at least allowed to be used for some official purposes. He argued admirably in favour of Sanskrit, but came to the wrong conclusion that it may not be used. I feel I have got the House with me as the speeches that have been made on the last occasion will show. I feel assured to find that in the number of speakers who supported me were some of the most eminent lawyers in India.

I introduced the Bill by quoting the Hon. Prime Minister (Quotes from Discovery of India regarding Sankarachary's propagation of his doctrine through out India and continent): This happened in the 8th and 9th Century. May I ask what was the medium in which this great mind carried on all these things—this arguing, debating, reasoning and convincing ? What was the language which he used for doing this on an all-India scale, on a mass scale, from Kerala to Kashmir, and from Kashmir to Assam ? The medium was Sanskrit. I question again, what was the binding thread that he used to bring about unity and synthesis out of the diversity that was present during his time ? *That force, that binding thread, that cement, was Sanskrit which he used.* If this could have happened in the 8th century, not very long ago, what is the reason that you are so diffident now ? What is the reason that we fell sceptic now and speak as the Hon. Minister has just now spoken ?

In this House, the Prime Minister has spoken a number of times on the official languages......Whenever he takes up the question of official language, the vision of Sanskrit appears in the back ground. On the 7th August, 1959 on Shri Frank Anthony's proposal to put English in the 8th Schedule, he stated :

"Every one knows Sanskrit was the symbol of our magnificent civilisation in the past—a tremendous thing. Whenever I think of it I am overwhelmed by the achievement of Sanskrit. It is a tremendous thing. *Now we cannot leave it.*"

Then, in September of the same year, the Prime Minster spoke on the report of the committee of Parliament on Official Language. There he said : "I have on a previous occasion expressed my great admiration for Sanskrit. I think *if there is one thing which can embody the greatness of India's thought and culture in the past*, it *is Sanskrit.*"

"The Indian languages of today are either directly descended from Sanskrit, or like the Southern languages been closely allied to it. The background of thought and culture whether it is of Tamil, Telegu or any other southern language is closely allied to the background of thought and culture of northern languages because of Sanskrit and its effect on the whole of India. *If we cut away these roots, it will be very bad for us*"

It is to maintain these roots, it is to preserve our connection with these roots that I have suggested that Sanskrit be given recognition as an official language, at least for some limited purposes as has been recommended by the Sanskrit Commission.

I hoped that if my arguments do not prevail with the Government of India, at least arguments of the Prime Minister would. But somehow I have failed. While the Minister argued for Sanskrit and came to a conclusion against it, I feel there is some confusion somewhere. Otherwise, it could not have been so.

When I heard the Minister speaking like that, the Lord's saying in Gita came to my mind :

কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাত্ করিষ্যস্যবশোঽপি তত্ ।

What you are not inclined to do today because of confusion in thinking, you will have to do someday out of force of circumstances.

When I proposed Sanskrit as official language, I did not think of a classical language at all. I proposed Sanskrit because it is very modern in its thought and ideas. It is one of the storehouses of the most progressive thinking. It has the capacity to express ultra-modern ideas. There are my friends in the opposition as well as on the Congress who want to put ceiling on the possession of an individual. I am quoting something beyond which they will not go. I am quoting from Bhagavatam :—

যাবদ্ ভ্রিয়েত জঠরং তাবত্ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি ॥ ভা ৭/১৪/৮

An individual in a society is entiled only to that much which will be required to sustain his existence. Any individual trying to have more, is a social thief and deserves punishment. I do not know whether my friends in the opposition are prepared to go so far as what Bhagavatam has about the individuals' rights in society.

We are now thinking of land reforms and ownership of land. If my friend Shri Mukherjee refers to Manu, he will find it stated there that the land belongs to the person who tills it.

(স্থানুচ্ছেদস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতো মৃগম্ । মনু ৯/৪৪

These are the modern ideas of which Sanskrit is the storehouse. I could have given more. That is what attracted me to suggest that Sanskrit may be taken up as an official language.

As a language, I have supported it because of its scientific character. It is the most scientific language in the world. In its precision and integrity it has no equal in the world :

Not even English is equal to Sanskrit in precision, integrity and scientific character. These are the reasons for which I took it up.

(Referring to utterance of Sanskrit sayings by Shri H. N Mukherjee to justify his party's patriotic character, or by Mr. Nath Pai when he tried to impress upon the Prime Minister the necessity of preserving the integrity of India in the face of Chinese aggression, he continues :

These are words which come to us not because they are mere obsolete classical words, but because they express the ideas and thoughts which are current in our blood even now. That is what emboldened me to take it up.

My friend the Hon. Minister stated that 500 people have recorded Sanskrit as there speaking language. The very fact that even in these days are 500 people who use Sanskrit as speaking language is enough commendation for giving it the recognition that I suggest for it.

We have been learning English for the last two centuries. What an amount of money the British Government had spent and this Government is spending on learning English. It is stated in the Kher Commission report that even after two centuries of learning of English, not even one per cent of the people of India could express themselves sufficiently in English. *Will they throw out English because not even one per cent of the people speak English ?* Yet you are passing laws in English and you are maintaining it as an associate official language. If that can be done, simply because only 500 people speak Sanskrit, there can be no bar to Sanskrit being adopted as an official language.

A language dies when the culture dies. If the culture does not die, the language does not die. Some of the European languages are dead because the culture is dead. The climate of culture in which Sanskrit was born still persists. I maintain that, that culture is living and having very active existence in our life.

Let it be remembered that the proposal to have Sanskrit as an official language was broached in the Constituent Assembly by Shri Naziruddin Ahmed That should be remembered because that is a remarkable thing. Our present Speaker, who was a member, said, "I do again make it clear that I am not against Sanskrit and if that is taken up straight way, I will suport it" Even then, I do not want to disturb the present scheme of things. Let Hindi remain where it is ; let English remain where it is. But let Sanskrit be given recognition for limited official purposes.

The Minister was referring to some Universities. In my introduction speech, I stated that I asked the Parliament Secretariat for the use of Sanskrit on ceretain ceremonial occasions, but I was told it could not be used unless it is there in Article 343.

I have not raised the question of lingua franca. I have suggested Sanskrit only as an integrating factor in the present India ; not only in India, but it will integrate us with the rest of the world, particularly the Eastern Asia.

Some years ago, I was in Saigon and I met the Education Minister of Burma there I asked him how they found out technical words for their language. He said that they tried to find them in the Burmese language and when they could not find in the Burmese language, they went to Sanskrit. Even now the Education Minister is doing it. What is the difficulty in our case, I do not know.

I shall quote only one more instance and then conclude. I spoke of Israel. When that state was formed the Jews from all sides came and amongst that multi-national and multi-language people, the only way they found to bring about unity was to restore Hebrew. This could be done even in our present case as a measure of integrating factor.

I shall conclude with a saying of Bhavabhuti that comes to my mind now. This time when we close the chapter which began in 958 and when I conclude it sadly, the words of Bhavabhuti came to my mind.

যে নাম কেচিদ্ ইহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাম্।
জানন্তু তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ॥

Those who are ignoring me today, whatever knowledge they may possess, let them also know that my efforts have not been for them. Then he said :

উৎপৎস্যতেহস্তি মম কোহপি সমানধর্মা

There are others who think like me and more will come. Then he concluded :

কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলা চ পৃথ্বী।

The world is vast and time is eternal.

(*The motion was negatived.*)

Members, who spoke in support of the resolution :—

1. Shri Chapala Kanta Bhattacharya —Congress.
2. „ Nalini Ranjan Ghosh „
3. „ K. K. Wariar —Communist Party of India.
4. Dr. Sarojini Mahishi —Congress.
5. Shri Jashpal Singh —Independent.
6. „ Sachindra Chaudhury —Congress
7. „ Rameswarananda —Janasangha.
8. „ Hirendra Nath Mukherjee —Communist Party of India.
9. „ D. N. Tewary —Congress.
10. „ Hanumanthia „
11. Dr. Madhavdas Sri Hari Ane —Independent.
12. „ N. S. Ranga —Swatantra.
13. Shri A. K. Sarma —Congress.
14. „ Raghu Nath Singh „
15. „ Prakash Vir Sastri —Independent.
16. „ D. C. Sarma —Congress.

Members, who spoke against the resolution :—

1. Shri Ram Sevak Yadav —Socialist Party
2. „ Muthu Gounder —D. M. K.
3. „ Hazarnavis —Congress. (Minister of State)

সর্বজনীন শিক্ষায় প্রাচীনভাষা সংস্কৃত

"জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ"—ভারতে দীর্ঘকালের প্রচলিত প্রবাদ। তাই দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্য-বিধানের সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত ক'রে তোলাই হ'ল কল্যাণ-রাষ্ট্রের লক্ষ্য। জ্ঞানদীপ্ত, সমুন্নত-চরিত্র নাগরিকই হ'ল রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিশেষতঃ, যে দেশের সরকার মনীষী লিংকনের সূত্রানুসারে "Government of the people, by the people for the people," সেই দেশে সুশিক্ষিত মানুষেরই প্রয়োজন সর্বাগ্রে। স্বাধীনোত্তর ভারতে সেই জন্যে শিক্ষাবিষয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক্রমাগতই চলেছে। শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বজনীন ক'রে তোলা এবং তার মানের (standard) যথাযথ উন্নতিসাধন হচ্ছে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্যেই শিক্ষণীয় বিষয়গুলিরও পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন আজ দেখা দিয়েছে। সাধারণতঃ, মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন শিক্ষায় পরিণত ক'রে তোলা আমাদের উদ্দেশ্য। মোটামুটি শিক্ষিত মানুষ হিসেবে পরিগণিত হ'তে হ'লে বর্তমানে সবাইকে অন্ততঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হবে। তারপরে, প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে এবং প্রয়োজনীয়তা বিচার করে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের জন্যে স্ব স্ব রুচি অনুসারে নরনারী যে যেদিকে ইচ্ছা অগ্রসর হ'তে পারেন। তাই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে মোটামুটি বর্তমানে মান ধরা হয় ব'লে তাতে বিবিধ বিষয়ের সঙ্গে প্রাচীনভাষা তথা সংস্কৃতের স্থান কিরূপ হওয়া উচিত, তাই বর্তমান নিবন্ধে আলোচ্য।

বৃটিশশাসনে সংস্কৃতশিক্ষা ঃ—ভারতবর্ষে অধুনা প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার শুরু উনিশ শতকের গোড়ায়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেকলের প্রস্তাবানুসারে আমাদের দেশে বিলাতী বিদ্যার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এই বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'য়েছিল জ্ঞানের উদ্বোধন নয়, মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা নয়, জীবনকে বিকশিত করা নয়, ইংরেজ সরকারের দপ্তরে নিম্নপদস্থ কর্মচারী হবার যোগ্যতা জন্মানো। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করলেন যে সরকারী কর্মচারী পদে এই ইংরেজী স্কুলে শিক্ষিত ব্যক্তিদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ১৯৫২-৫৩ সালে স্যার আর্কট্ লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ারের নেতৃত্বে ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত "Secondary Education Committee"র রিপোর্টের দশম পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"The education imparted in these schools became a passport for entrance into Government services. This was mainly due to the proclamation issued by Lord Hardinge in 1844 that for service in public offices preference should be given to those who were educated in English Schools. *In*

consequence thereof education was imparted with the limited object of preparing pupils to join the service and not for life."

ফলে, কেবলমাত্র একচোখো নীতিতে শুধু ইংরেজী বিদ্যার জন্যেই সরকার সমুদয় অর্থ ব্যয় করতে লাগলো। ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভেই লর্ড বেণ্টিংকের শাসনকালে এই কথাই বলা হয়েছে সরকারী "communique"এ—

"The great object of the British Government ought to be the promotion of European literature and Science among the natives of India and all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed *on English education alone.*"।

ইংরেজের হীন অনুকৃতিতে শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিপুণ ক'রে তোলাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। লর্ড মেকলের ১৮৩৫-এর বিখ্যাত "Minute"এ তাই এমন মানুষই তৈরী করার নির্দেশ রয়েছে, যারা হবে "a class of persons Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect."

স্বাধীন ভারতে বাংলাদেশে সংস্কৃত শিক্ষা :—কিন্তু, এই পরিস্থিতিতেও পরাধীন ভারতে গোড়ার দিকে এফ্-এ পর্যন্ত সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য ছিল। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত প্রবেশিকামান পর্যন্ত সংস্কৃত সকলকেই অবশ্যপাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হ'ত। কালক্রমে স্বাধীনোত্তর ভারতে পশ্চিমবঙ্গে "মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ" সংস্কৃতকে ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত ক'রে হিন্দীকে সংস্কৃতের বিকল্পরূপে গ্রহণের সুযোগ দান করেন। ফলে বাংলাদেশ থেকে সংস্কৃত-শিক্ষা সমূলে উৎখাত হ'তে চলল দেখে দেশের মহতী বিনষ্টি আশংকা ক'রে সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করার আবেদন নিয়ে সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস্ ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ মোদক, ব্যবহারজীবী ৺নির্মলচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং বর্তমান লেখক তৎকালীন "মধ্যশিক্ষা পর্ষদের" প্রশাসক ৺ডঃ শিশিরকুমার মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে দীর্ঘ আলোচনা করেন। আলোচনান্তে ডঃ মিত্র সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করা নিয়ে সমর্থন জানিয়েও বললেন যে "মধ্যশিক্ষা আইন" অনুসারে এই ভাষাশিক্ষার পুনর্বিন্যাসে কিছু করার ক্ষমতা পর্ষদের হাতে নেই, আছে সরকারের হাতে। তারপরে ঐ ব্যক্তিবর্গ আবার তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে এই নিয়ে আবেদন জানান। এদিকে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ এবং অখিল ভারত সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা সম্মেলন এই বিষয়ে দেশে আন্দোলন সৃষ্টি করে। প্রায় সকল ইংরেজী ও বাংলা দৈনিকই সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করার আবেদন সমর্থন করে। ফলে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুআরির ২৪৩নং (শিক্ষা) সরকারী প্রস্তাবানুসারে তেরো জন বিদগ্ধ শিক্ষাব্রতীকে নিয়ে মধ্যশিক্ষায় ভাষার

পুনর্বিন্যাসের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। তাতে সভাপতিরূপে ছিলেন ডঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সদস্য রূপে ছিলেন ভাষাচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞানাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বৈজ্ঞানিক ডঃ শিশিরকুমার মিত্র, সাহিত্যাচার্য ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গণিতাচার্য অধ্যক্ষ অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শিক্ষাচার্য অধ্যক্ষ অনাথনাথ বসু, অধ্যক্ষ ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, অধ্যক্ষ ডঃ জে. সি. দাশগুপ্ত, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীজ্যোতির্বিকাশ মিত্র এবং শ্রীবিনয়কৃষ্ণ নিয়োগী। এই কমিটিতে বৈজ্ঞানিক, গাণিতিক, আইনজ্ঞ, ভাষাবিদ্, শিক্ষাতাত্ত্বিক এবং প্রধানশিক্ষক প্রভৃতি সর্ব বিষয়েরই মুখ্য-পুরুষেরা ছিলেন। তাঁদের ৯ জনের সিদ্ধান্তানুসারে এই ছিল ব্যবস্থা—

(১) বাংলা—১ম হ'তে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত সকল শাখাতেই অবশ্যপাঠ্য।

(২) ইংরেজী—৩য় হ'তে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত সকল শাখাতেই অবশ্যপাঠ্য।

(৩) সংস্কৃত অথবা অন্য যে কোন প্রাচীন ভাষা—৫ম হ'তে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবশ্যপাঠ্য, তারপরে শুধু মানবিক শাখায় ৯ম হ'তে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত ইলেক্টিভ্ বিষয়রূপে অবশ্যপাঠ্য।
বিজ্ঞান, বাণিজ্যাদি শাখায় ঐচ্ছিক।

(৪) হিন্দী—৮ম শ্রেণীতে মৌখিকরূপে অবশ্যপাঠ্য। পরে ঐচ্ছিক।

কিন্তু বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বাংলাভাষার প্রখ্যাত আচার্য ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডঃ শিশিরকুমার মিত্র এবং অধ্যক্ষ অনাথনাথ বসু সংস্কৃতকে মানবিকবিদ্যায়ও অবশ্যপাঠ্য করার বিরুদ্ধে অভিমত দান করেন। কিন্তু, পূর্বোল্লিখিত সিদ্ধান্ত অধিকাংশ সদস্যের অভিমত (১৩ জনের মধ্যে ৯ জনের) ব'লে তাই প্রচলিত করার নির্দেশ দান করেন সরকার। রাজ্যপালের স্বাক্ষরে এই নির্দেশ গেজেটে প্রকাশিত হওয়ামাত্র পর্ষৎ-প্রশাসক ডঃ মিত্র ভাষা-শিক্ষাবিষয়ে সরকারী ক্ষমতার বৈধতার প্রতিবাদ করেন। যদিও কমিটির সদস্যপদ স্বীকারকালে কিংবা Note of Dissent দেবার সময়ে এই প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেননি। বরঞ্চ গোড়ার দিকে তিনিই বলেছিলেন যে এই বিষয়ে পর্ষদের কোন ক্ষমতা নেই, রয়েছে সরকারের। কিন্তু এখন তিনি বললেন, এই বিষয়ে ক্ষমতা রয়েছে পর্ষদেরই, সরকারের নয়। ফলে এই অচলাবস্থার অবসানের জন্য তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর অনুমতিক্রমে বর্তমান লেখক ও পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। তখন ডঃ বিধানচন্দ্র রায় এই বিষয়ে আলোচনার্থ ভাষাচার্য সুনীতিকুমার, ডঃ মিত্র, পূর্বোক্ত ডঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্রীনির্মলচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মোদক, শ্রীমনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং বর্তমান লেখককে আহ্বান করেন। সুদীর্ঘ আলোচনায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই এবং তাই দীর্ঘদিন প্রচলিত ছিল।—

(১) বাংলা—সকল শাখায় ১ম হইতে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত।
(২) ইংরেজী—সকল শাখায় ৩য় হইতে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত।
(৩) সংস্কৃত (অথবা অন্য কোন প্রাচীন ভাষা)—৮ম শ্রেণীতে সকলের জন্য এবং মানবিকবিদ্যা শাখায় ৯ম হ'তে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত।
(৪) হিন্দী—সকলের জন্যে ৭ম এবং ৮ম শ্রেণীতে।

এতে কেবলমাত্র ৮ম শ্রেণীতেই বিজ্ঞান ও বাণিজ্যশাখাদির ছাত্রেরা সংস্কৃত পড়ছে। পূর্বে তাদেরও ৪ বৎসর সংস্কৃত পড়তে হ'ত। মানবিক বিদ্যার ছাত্রেরাই শুধু এখন ৮ম হ'তে ১১শ পর্যন্ত ৪ বৎসর সংস্কৃত পড়ছে।

সংস্কৃতকে শিক্ষাব্যবস্থায় এইটুকু স্থান দিতেও পশ্চিমবঙ্গে বহু শিক্ষাব্রতী এবং নেতা আজ রাজী নন। পরাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃতের যে স্থান ছিল, স্বাধীন ভারতে বিশেষতঃ পশ্চিমবংগে তাও নেই। এই প্রসঙ্গে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত "Sanskrit Commission" ('56—'57)-এর ৭ম পৃষ্ঠার কথাগুলো বিশেষভাবে আলোচনীয়—"Since the attainment of independence, the country as a whole has been undergoing an all-round regeneration, and the Government have gone all out to explore the channels through which they could help the growth and consolidation of the nation. It cannot be forgotten, as Rajyapal Sri Sriprakash said that in the struggle for freedom which this nation waged it was inspired and sustained by a sense of its great heritage and an ardent desire to come into its own and regain the glory that had been eclipsed by alien domination. The dawn of indpendence has been looked up to by the nation as the begining of an age of cultural rehabilitation of the country. In the fields of arts and letters, several concrete steps have been taken by the Government. And Sanskrit, being the bed-rock of Indian speech and literature and artistic and cultural heritage of the country, has been naturally looking forward to the Government, all these years, for measures for its rehabilitation. This Commission, in the course of its tours, could see a feeling of regret and disappointment among the people that, while no positive steps had been taken for helping Sanskrit, the measures undertaken in respect of other languages have had adverse repercussions on it. *The ultimate result of this has been that*

Sanskrit has not been allowed to enjoy even the status and facilities it had under the British Raj."

বর্তমান ভারতে, বিশেষ ক'রে পশ্চিমবঙ্গে এই শোচনীয় পটভূমিকায় সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্যায়ন পুনর্বিবেচ্য। সর্বাঙ্গীণ এবং সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারে দূরপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। আমাদের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের নবোত্থিত সমস্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন ভাষা তথা সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যাচাই ক'রে গ্রহণ করতে হবে নতুন সিদ্ধান্ত। আপাতোদ্ভূত সমস্যার তাড়নায় দিশেহারা না হ'য়ে শিক্ষার মূল আদর্শকে স্থির রেখে জীবনকে সত্যের দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ক'রে শিব সুন্দরের মহিমায় উজ্জ্বল ক'রে তুলতে হবে। সমুন্নত জীবনের জন্য প্রয়োজন যে সমুন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, তাতে সাধারণ ভাবে প্রাচীন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ ক'রে আমাদের পক্ষে সংস্কৃতের অপরিহার্যতা আলোচনা করা যাক।

শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাচীন ভাষা : সুদূর অতীতে ভারতের শান্তরসাস্পদ তপোবনে ঋষিকণ্ঠে উদ্গীত হয়েছিল মানবের বন্দনা—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"। অমৃতময় পূর্ণব্রহ্মের সন্তানরূপে মানুষ পূর্ণতার ঐতিহ্যকে উত্তরাধিকারসূত্রে নিজের জীবনে বহন ক'রে চলেছে। কিন্তু, যথোচিত শিক্ষার অভাবে জ্ঞানের ঊনতার জন্য সেই পূর্ণতা সাধারণতঃ তার জীবনে প্রসুপ্ত হ য়ে থাকে। সেই প্রসুপ্ত পূর্ণতার উদ্বোধন তথা মানব-প্রতিভার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ-সাধন হ'চ্ছে শিক্ষার মূলীভূত উদ্দেশ্য। ভারতের নবজাগৃতির অন্যতম পুরোধা স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রসঙ্গে বলেছেন—"Education is the manifestation of the perfection already in man." তাই, শিক্ষাব্যবস্থায় জীবনধারণের বিষয়গুলির সঙ্গে জীবনগঠনের উপাদান-সমূহের সমন্বয়সাধন একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষা হওয়া উচিত যুগপদ্ ভাবেই formative এবং informative। শিক্ষাব্যবস্থায় গোড়ার দিকে এই সমন্বয়ের আদর্শ পরিত্যক্ত হ'লে শিক্ষা হবে অসম্পূর্ণ। সেই জন্য শিক্ষার পূর্ণতা সাধনের দিক থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমে প্রাচীন ভাষা শিক্ষার অপরিহার্যতা স্বীকার না ক'রে পারা যায় না।

অতীতের বুকেই বর্তমানের প্রতিষ্ঠা। ভিত্তিকে বর্জন ক'রে সৌধের নির্মাণ এবং উন্নয়ন কখনো সম্ভব নয়। অতীতের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপরই বর্তমানকে প্রতিষ্ঠিত করলে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির প্রসার হবে সম্ভবপর। বর্তমানের মর্মমূলে যদি অতীতের রসভূমি হ'তে রসাহরণ না করে তবে সেই বর্তমান অচিরেই বিশুষ্ক হ'য়ে বিনষ্ট হ'য়ে যাবে। আর তার ভবিষ্যৎ অগ্রগতিও হবে স্তব্ধ। তাই, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর জয়যাত্রা এবং প্রযুক্তিবিদ্যার অপরিমেয় প্রসার সত্ত্বেও বর্তমান জীবনে প্রাচীন ভাষা এবং তদাশ্রিত সংস্কৃতির প্রভাব এবং প্রয়োজন বহু ক্ষেত্রে স্বীকৃত। সেইজন্য এই যান্ত্রিকযুগেও প্রাচীন ভাষাকে

বর্জন করার কোন স্থায়ী প্রয়াস চিন্তাশীল চিত্তে আজো পরিলক্ষিত হয়নি।

প্রাচীন ভাষা এবং সাহিত্য অতীতে বহু শতাব্দী ধ'রে মানব-জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে ; সর্বগ্রাসী কালের করাল আক্রমণকে উপেক্ষা ক'রেও বর্তমানের দুয়ারে এসে উপনীত হ'তে পেরেছে। এর কারণ, মানব-মনীষার অন্যতম মহনীয় অবদান এই প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের প্রয়োজন এবং আবেদন আজো শেষ হ'য়ে যায়নি। তত্ত্বের চিরন্তনত্ব, তথ্যের প্রাচুর্য এবং প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যই প্রাচীন ভাষাকে বর্তমান জীবনেও সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছে। সুদূর অতীতে ধরিত্রীর শৈশবেই প্রাচীনভাষাকে আশ্রয় ক'রে মানব-প্রতিভার যে অতুলনীয় বিকাশ ঘটেছিল, তার কথা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়। জ্ঞানরাজ্যের সকল দিকেই পরিণত জ্ঞানের সাক্ষ্যবহ অসংখ্য গ্রন্থরাজির প্রাচীনভাষায় প্রকাশ ও প্রচার আমাদের পূর্বসূরীদের অপূর্ব মননশীলতাই সূচিত করে। প্রসঙ্গতঃ জনৈক বিদগ্ধ চিন্তাবিদের কথাগুলো স্মরণ করা যেতে পারে—"Our ideas of law, citizenship, freedom and empire, our poetry and prose literature ; our political, metaphysical, aesthetic, and moral philosophy, indeed our organised rational pursuit of truth in all its non-experimental branches as well as a large and vital part of the religion which has won to itself so much of the civilised world are rooted in the art or thought of that ancient civillisation."

প্রাচীন সংস্কৃতির যাঁরা ছিলেন প্রধান প্রবক্তা, তাঁদের রচনাবলীর যথাযথ অনুশীলন হ'ল প্রাচীন ভাষা পাঠের ফলশ্রুতি। এই সকল গ্রন্থরাজি কেবলমাত্র প্রাচীন সংস্কৃতির ব্যাখ্যানেই পর্যবসিত হয়নি, অধিকন্তু মানবাত্মার মহিমা প্রকাশেও সার্থক হ'য়ে উঠেছে।

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়। ভূতবিদ্যার নব নব আবিষ্কার এবং নিত্য নূতন ভৌগোলিক পরিচয় মানুষের জীবনে তখন যুগান্তর আনয়ন করে। শিল্পবাণিজ্যের অভাবনীয় প্রসার, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রাবল্য এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিকাশ মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে এক বিরাট পরিবর্তন। ফলে, প্রাচীন ভাষা এবং আধুনিক বিজ্ঞান—সাধারণতঃ এই দুইটি ভিন্ন শাখায় আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বিন্যস্ত করার প্রবণতা দেখা দেয়। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগ বিশেষভাবে বিজ্ঞানের দ্বারাই বিধৃত। তবুও প্রাচীন ভাষা স্বকীয় মহিমায় এখনো প্রতিষ্ঠিত এবং ভবিষ্যতেও প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আজো শত শত বিদ্যার্থী এই প্রাচীন ভাষার প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেন এবং তারই অনুশীলনে আত্মনিয়োগ ক'রে থাকেন।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভাষা শিক্ষার কোন প্রয়োজন আছে কিনা এই বিষয়ে বিতর্ক বর্তমান শিক্ষাজগৎকে

আন্দোলিত ক'রে তুলেছে। এর পক্ষের এবং বিপক্ষেয় যুক্তিগুলি পর্যালোচনা ক'রে একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, শিক্ষার উদ্দেশ্য বিদ্যার্থীর মধ্যে পূর্ণ মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি। তাহ'লে শিক্ষাব্যবস্থাকেও সর্বাঙ্গীণ এবং সম্পূর্ণ করা একান্ত প্রয়োজন। এই পূর্ণতার জন্য আবশ্যক আধুনিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনভাষায় বিধৃত মহনীয় ভাবধারারও পরিবেশন। জীবন-জিজ্ঞাসার মৌলিক উপাদানগুলি প্রাচীন হ'লেও বর্তমান জীবনেও একান্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং প্রাচীনভাষা প্রতিটি মানুষের অবশ্য-শিক্ষণীয়। এর প্রতিবাদে কেউ কেউ বলেন যে প্রাচীন ভাবধারায় জ্ঞানলাভের জন্যে প্রাচীনভাষা শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। আধুনিক ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমেই তো প্রাচীন জ্ঞান অর্জন করা যায়।

তার উত্তরে বলা চলে অনুবাদ বিশিষ্ট জ্ঞানের পরোক্ষ রূপটিকেই পরিবেশন করে। অনুবাদ যতই মূলানুসারী হোক না কেন, মূলের পরিপূর্ণ পরিচয় এবং প্রভাব অনুবাদের মাধ্যমে কখনো পুংখানুপুংখরূপে পাওয়া যায় না। বিশেষ আধারে বিশেষ বস্তুর একটি স্বকীয় সুষমা এবং মহিমা প্রকাশিত হয়, যা যে-কোন আধারে সম্ভব নয়। প্রাচীন ভাষার বিশেষ প্রকাশভঙ্গী এবং ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ শব্দরাশির সহায়তায় জ্ঞানের যে বিশিষ্ট রূপ এবং সৌন্দর্য উপভোগ করা চলে, তা অনুবাদের মাধ্যমে কখনো আস্বাদন করা যায় না। অনুবাদে সাহিত্যের মৌলিক সৌন্দর্য তিরোহিত হয়। মূলের রস অনুবাদে কখনো মেলে না—রসিকজনের কাছে এই সত্য একান্ত প্রত্যক্ষ। সুতরাং সুষ্ঠুভাবে প্রাচীন জ্ঞানলাভের জন্য প্রাচীনভাষা শিক্ষা অবশ্যপ্রয়োজনীয়।

জীবনের বর্তমান চাহিদা এত প্রবল এবং প্রত্যক্ষ যে তাতে প্রাচীনভাষা শিক্ষায় বৃথা শক্তিক্ষয় না ক'রে বর্তমানের বিজ্ঞান এবং নাগরিকতাবোধাদির শিক্ষায় মানুষের প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। অতীতের ভাষা অপেক্ষা বর্তমানের জীবন অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। এই মতবাদ যাঁরা প্রচার করেন, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে অতীতেরই সৃষ্টি বর্তমান। মৃত্তিকা থেকে যতক্ষণ রস আহরণ করে, ততক্ষণই বৃক্ষের হয় বিবর্ধন। মৃত্তিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে বনস্পতিও সমূলে হয় উৎপাটিত। সুতরাং, বর্তমানকে সমৃদ্ধ করতে হ'লে অতীতের জ্ঞানভূমি হ'তে সঞ্জীবন-রস আহরণ করতে হবে। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের অগ্রগতি হবে পরিণত এবং ত্বরান্বিত।

[প্রাচীনভাষা বহুবিধ জ্ঞানের আকর। এমন কি বর্তমানের বিজ্ঞান তর্কশাস্ত্র, রাজনীতি, আইন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, শব্দশাস্ত্র, দর্শন, ভাষাবিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে জানতে গেলে প্রাচীনভাষা শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এই সব বিবিধ বিদ্যার মর্মমূলে প্রোথিত হ'য়ে আছে অতীতের প্রাচীন ভাষার সনাতন ভূমিতে। এই বিষয়ে জে. বি. এস্. হ্যাল্‌ডেন,

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য চন্দ্রশেখর বেংকট রমণ, আচার্য কে. এস্., কৃষ্ণন্ প্রভৃতি বরণ্যে বিজ্ঞানসাধকের অনুশাসন উল্লেখনীয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এককালের প্রেসিডেন্সী কলেজের মেধাবী ছাত্র এবং পরবর্তীকালের ভারত-রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে বলেছিলেন—"বাল্যকালে সংস্কৃত পড়নি, রাজেন? তোমরা একেবারে degenerated। সংস্কৃতের মত বৈজ্ঞানিক ভাষা জগতে আর নাই। সংস্কৃতই তো বিশ্বের প্রাণ। সংস্কৃতের এক একটি শব্দ মানুষকে অনেক আবিষ্কারের দিকে প্রবৃত্ত করতে পারে।"

আধুনিক ভাষাসমূহের জননী হচ্ছে প্রাচীন ভাষা। সুতরাং আধুনিক ভাষায় পরিণত জ্ঞানলাভের জন্য প্রাচীন ভাষা শিক্ষা অপরিহার্য। নব নব ভাবের প্রকাশার্থে নূতন নূতন শব্দ চয়ন এবং গঠন করার জন্য প্রাচীনভাষায় জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

প্রাচীনভাষার ব্যাকরণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীনভাষা শিক্ষার মাধ্যমে মানসিক শৃংখলাও মানুষ অধিগত ক'রে থাকে সেই কারণে।

আধুনিক পদ্ধতিতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে যদি প্রাচীনভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহ'লে স্বল্প সময়েই সুষ্ঠুভাবে প্রাচীনভাষা শিক্ষা ক'রে তার সাহিত্যের রসাস্বাদনে এবং প্রাচীন সংস্কৃতির মহিমা উদ্ঘাটনে বিদ্যার্থীরা সক্ষম হবেন। তাহ'লে সময় এবং শক্তির অপচয়ের যুক্তি আর টিঁকবে না।

কেউ কেউ বলেন যে প্রাচীনভাষা শিক্ষার দ্বারা মানুষের দৃষ্টি শুধু অতীতাশ্রয়ী হবে। কুসংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হ'য়ে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেবে বিদ্যার্থী। কিন্তু, সেকথা ঠিক নয়। উদার দৃষ্টিতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালই সমভাবে বিধৃত থাকবে। বিশেষ ক'রে অতীতভাষায় জ্ঞানলাভ করলে, তার মাধ্যমে অতীতের জ্ঞানকে মূলধন ক'রে নিয়ে বর্তমানে ভবিষ্যৎ প্রগতিকে ত্বরান্বিত করা যাবে। মূলধন ব্যতীত বৈষয়িক উন্নতি যেমন কখনো সুখকর নয়, তেমনি এক্ষেত্রেও তাই।

সর্বোপরি, মানুষ তো কেবল দেহ নিয়েই নয়। দেহ এবং মন উভয় নিয়েই মানুষ। অধিকন্তু, মনের উৎকর্ষের জন্যেই মানুষ ইতরপ্রাণী হ'তে শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞান-শিক্ষার দ্বারা মানুষের দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা চূড়ান্ত-ভাবে সম্ভব। মানসিক উৎকর্ষের উপাদানগুলো অধিকতরভাবে মেলে প্রাচীন-ভাষা ও সাহিত্যে। মানসিক উৎকর্ষ সম্পাদিত হ'লেই দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য সুষ্ঠুভাবে উপভোগ করা চলে। সুতরাং যে মননের জন্যে মানুষ মানুষ, সেই মননের বিকাশের জন্য প্রাচীনভাষা শিক্ষার প্রয়োজন একান্ত অপরিহার্য।

তদুপরি অধ্যাত্ম-জীবনের উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মৈত্রীসাধন এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠার জন্যেও এই প্রাচীনভাষার অনুশীলন সর্বদা অপেক্ষিত। পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থই প্রাচীনভাষায় রচিত। তাই ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ এবং ধর্মজীবনের বিকাশসাধনে প্রাচীন ভাষা অপরিহার্য। প্রাচীনকালে

বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে নানাভাবে যথেষ্ট সংযোগ ছিল। বর্তমানের বিভিন্ন সংস্কৃতি সেই সুপ্রাচীন সংস্কৃতি-সমষ্টিরই পরিবর্তিত রূপ। আজ জাতিগত, গোষ্ঠিগত এবং দেশগত অনৈক্যের যে বিষবাষ্প মানুষের মনের আকাশকে আচ্ছন্ন ক'রেছে, তার নিরসনে প্রয়োজন সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। প্রাচীনভাষায় জ্ঞান লাভ করলে সকল সংস্কৃতির মূল উৎস এবং তার বর্তমান বিকাশ জানতে পারা যাবে। প্রাচীন সাংস্কৃতিক মৈত্রীর অনুবর্তনে বর্তমান জীবনে সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং মৈত্রী প্রতিষ্ঠার শুভবুদ্ধি মানুষের মনে জাগ্রত হবে। ফলে, প্রাচীনভাষার অনুশীলন বিশ্বসংকট-নিরসনে এক প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ ক'রে মানব-সভ্যতাকে অগ্রগতির পথে পরিচালিত করবে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে সংস্কৃতের স্থানঃ—বিশ্বের সকল দেশেরই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচীন ভাষার প্রয়োজন সাধারণভাবে আলোচনা ক'রে এখন ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। বঙ্গ-ভারতের প্রাচীনতম এবং সমৃদ্ধতম ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত। অখণ্ড ভারতের সনাতন সংস্কৃতির চিরন্তনী ধাত্রী এই মধুময়ী দেবভাষা। ঊনবিংশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ক্ষেত্রে অন্যতম শিক্ষানেতা বিদগ্ধ বৈদেশিক মনীষী স্যার হোরেস্ হেমান্ উইলসনের স্বরচিত সংস্কৃত-প্রশস্তিটি প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে।—

অমৃতং মধুরং সম্যক্ সংস্কৃতং হি ততোধিকম্।
দেবভোগ্যমিদং যস্মাদ্ দেবভাষেতি কথ্যতে ॥
"ন জানে বিদ্যতে কিং তন্ মাধুর্যমত্র সংস্কৃতে।
সর্বদৈব সমুন্মত্তা যেন বৈদেশিকা বয়ম্ ॥
যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাদ্ যাবদ্ বিন্ধ্য-হিমাচলৌ।
যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্ ॥"

প্রতীচ্য জগতে বর্তমানে প্রাচীন ভাষা লাতিনের যে প্রভাব, ভারতবর্ষের বর্তমান জীবনে প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতের প্রভাব তার চেয়ে অনেক বেশী। আমাদের মাতৃভাষার বারো আনা শব্দই সংস্কৃতভাষামূলক। উদাহরণরূপে রবীন্দ্রসংগীতের একটি অংশ উদ্ধৃত করা যায়—

"অয়ি ভুবন-মনো-মোহিনি
অয়ি নির্মল-সূর্য-করোজ্জ্বল-ধরণি
জনক-জননী-জননি।
নীলসিন্ধু-জলধৌত-চরণতল
অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল-
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী ॥"

এই শ্রুতি-মধুর ভাবসমৃদ্ধ বাংলা কবিতাটিকে একটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত বাক্যও বলা চলে। প্রায় প্রতিটি ভারতীয় তার ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি

উপলক্ষ্যে নিত্যই কিছু কিছু সংস্কৃত বাক্য পাঠ এবং শ্রবণ করেন। এই ভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সংস্কৃতের ব্যবহার নানা রূপে এখনো বর্তমান। লাতিনের কিন্তু এই রকম নিবিড় সম্পর্ক বর্তমানের প্রতীচ্য জীবনের সঙ্গে নেই বললেই চলে। তাই, লাতিনের মত সংস্কৃত আমাদের জীবনে মৃতভাষা কখনও নয়; বরঞ্চ নিত্য ব্যবহারের দ্বারা সঞ্জীবিত। সুতরাং এই দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজন অধিকতরভাবে স্বীকরণীয়।

আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির চিরকালের বাহন এই সংস্কৃত ভাষা। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী মনীষী ডাঃ লুই রেণোর কথাটি স্মরণ করা যেতে পারে।—

"There is not a living culture without a living tradition. If India is beloved and cherished among the elite of the West, it is on account of her traditional culture. And this culture is embedded above all in the treasures of Sanskrit. Sanskrit and India are inseparably connected inspite of all the transitory harangues of the politicians."

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, চিন্তাশীল মনীষী ৺ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

"Sanskrit is the language of Indian culture and inspiration, the language in which all her past greatness, her rich thought and her spiritual aspirations are enshrined....Sanskrit has not only been the treasure-house of our past knowledge and achievements in the realm of thought and art, but it has also been the principal vehicle of our nation's aspirations and cultural traditions, besides being the source and inspirations of India's modern languages. For many centuries in the past Sanskrit provided the principal basis of the Unity of India. In that hoary past the whole country had more or less a common pattern of education, common rituals and common beliefs. It was Sanskrit that provided a common medium of expression and of literary effort."

মানবসভ্যতার অরুণোদয়ে মনীষা-সূর্যের প্রথম প্রকাশকে বিধৃত ক'রে রেখেছে সংস্কৃত ভাষা। সেই সুপ্রাচীন যুগে জ্ঞানসাধনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষা যে অতুলনীয় ফসল ফলিয়েছিল, সংস্কৃত ভাষাই বর্তমান উত্তরাধিকারীদের নিকট সেই ফসল বহন ক'রে এনেছে। এতো বিপুল এবং বিচিত্র সৃষ্টি সংস্কৃতের মতো আর কোনো ভাষায় হয়নি। জ্ঞানের সকল ধারাই

এখানে পরিপুষ্ট হয়েছিল। ভারতবর্ষে, বিখ্যাত মনীষী আচার্য ম্যাক্স্ মুলারের অভিমত এই বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য।—

"Whatever sphere of the human mind you may select for your special study, wether it be language or religion or mythology or philosophy, whether it be laws or customs, primitive art or primitive science, everywhere you have to go to India, whether you like it or not, because some of the most valuable and instructive materials in the history of man are treasured up in India and in India only." (India : what it can teach us—Max Muller, P. 15)

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতীয় আইনশাস্ত্র সম্বন্ধে পোল্যাণ্ডের জনৈক বিশিষ্ট আইনজ্ঞ বলেছেন—

"None can be compared with the Indian laws in exactness and versatility. I believe that no book so competent as Kautilya's Arthasastra was published in ancient times. No work on politics, administration, and law describes local conditions so well. This work alone is enough to invite the study of ancient India and to draw a man to this country for ever."

আবার তুলনামূলক ব্যাকরণ, ভাষাবিজ্ঞান, তর্কবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র, অলংকার, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, ফলিতজ্যোতিষ, বীজগণিত, জ্যামিতি, শারীরবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পশুবিজ্ঞান, পূর্তশাস্ত্র প্রভৃতি সকল বিষয়েই সংস্কৃত ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সুতরাং এই সকল বিষয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর জ্ঞানলাভের জন্যে সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান অর্জন অবশ্যই প্রয়োজনীয় এবং স্বীকরণীয়।

পাশ্চাত্য জীবনে লাতিনের যে প্রভাব তার চেয়েও সংস্কৃতের অধিকতর গভীর প্রভাব রয়েছে আমাদের জীবনে। অথচ ইউরোপের শিক্ষাব্যবস্থায় লাতিনের স্থান আমাদের সংস্কৃতের চেয়ে অনেক বেশী। ইংলণ্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের জন্যে গঠিত "Norwood Commission"-এর সিদ্ধান্ত এই প্রসঙ্গে অনুধাবনীয়। যাঁরা লাতিনকে তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁদের অভিমতকে বিবেচনান্তে অগ্রাহ্য ক'রে কমিশন বলছেন—

"We are not prepared to follow the lead of those reformers of the curriculum who would eject the study of the classics from the Secondary Grammar schools on the ground that their study is irrelevant to the purpose of modern society. We do not take the view that modern society purposes to turn its back upon English culture and to deny to succeeding generations one of the means of understanding themselves and their inherited traditions.

Unless a culture attains to and preserves self-knowledge, its continuity is not assured.

We regard study of Latin as of fundamental importance for University work in English. Modern Languages and Cognate subjects in History, Law, Philosophy and Theology."

আমাদের জীবনে সংস্কৃতের স্থান এর চেয়েও বেশী নয় কি? সুতরাং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতের একান্ত আবশ্যিকতা তথা অবশ্যপাঠ্যতা দূরদর্শী দৃষ্টিতে স্বীকার না ক'রে পারা যায় না।

দেশপ্রীতি ও সংস্কৃত :—শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দেশপ্রেমের উদ্বোধন। মধ্যশিক্ষা গ্রহণকালে, যখন ছাত্রদের হৃদয় থাকে কোমল, তখনি তাদের চিত্তে দেশপ্রীতির বীজ বপন করা প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে—

"Another important aim which the secondary school must foster is the development of a sense of true patriotism. ......Through a proper orientation and presentation of the curriculum it can make the students appreciative and proud of what their country has achieved in literature and science, art and architecture, religion and philosophy, crafts and industries and other fields of human endeavour."

(Secondary Education Commission Report, Govt. of India. Page—28)

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্কৃত উৎসাদনের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সরকার নিযুক্ত ভবতোষ দত্ত কমিশনের সংস্কৃত বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলি (১৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) মুক্ত বুদ্ধিতেই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ও গ্রহণীয়। এই কমিশনে সংস্কৃত, বাংলা বা দর্শনের বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীর পরিবর্তে ছিলেন অর্থনীতিবিদ্‌, গণিতজ্ঞ, আধুনিক চেতনাসম্পন্ন ঐতিহাসিক প্রমুখ প্রগতিশীল চিন্তার সরকার-স্বীকৃত মনীষিমণ্ডলী। তাঁদের সুস্পষ্ট অভিমত হল সংস্কৃতের পক্ষে।

অতীতযুগে ভারতীয় মনীষার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয়েছিল সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই। ওপরের বিষয়গুলিতে সত্যিকারের জ্ঞান লাভ করতে হ'লে সংস্কৃত ভাষায় অধিকার সর্বাগ্রে অর্জন করতে হবে। সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানলাভ ক'রে অতীত ভারতের সত্যিকারের মহনীয় রূপের পরিচয় পেলে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ছাত্রহৃদয়ে দেশপ্রীতি উন্মেষিত হবে। সুতরাং, দেশপ্রেমের উদ্বোধনের জন্য সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানলাভ একান্ত অপরিহার্য।

আত্মশক্তির উদ্বোধনে সংস্কৃত :—আত্মবিশ্বাস এবং আত্মশক্তি জাগ্রত করার প্রধান পন্থা, জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে সেও একদিন উত্তমর্ণ ছিল; ব্যাপক অর্থে সেও মহাজনরূপে বহু দেশে পরিচিত ছিল।

সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষ অতীতে উত্তমর্ণের আসনে সমাসীন ছিল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হ'তে সেদিন সহস্র সহস্র জ্ঞানভিক্ষু বিদ্যার্থী ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনে সমবেত হ'ত। মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়ান, হিউয়েন সাং তাই সংস্কৃতজ্ঞ গুরুর চরণতলে উপনিষণ্ণ হ'য়ে সেদিন জ্ঞানসাধনায় নিরত হয়েছিলেন। এই সব কারণে সংস্কৃত শিক্ষা বর্তমানে আমাদের করবে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ, আত্মচেতনায় জাগ্রত। প্রসঙ্গতঃ, মনে পড়ে স্বাধীন ভারতের দীর্ঘ দিনের কর্ণধার, অতুলনীয় প্রতিভাধর, স্বর্গত দেশ নেতা, মহামনীষী ৺পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর "Discovery of India" গ্রন্থের কথাগুলো—

"If I was asked what is the greatest treasure which India possesses and what is her finest heritage, I would answer unhesitatingly—it is the Sanskrit language and literature and all that it contains. This is a magnificient inheritance, and so long as this endures and influences the life of our people so long the basic genius of India will continue."

আমাদের আত্মপরিচয় তথা পিতৃপরিচয় মেলে এই সংস্কৃত ভাষায়। আর সেই পরিচয় অত্যন্ত গৌরবের। সেই গৌরবময় উত্তরাধিকারকে গ্রহণ করতে হ'লে, পূর্বপিতৃগণের মহনীয় পরিচয় লাভ করতে হ'লে সংস্কৃত ভাষা অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে। তাতে গৌরবময় অতীতের পরিচয় লাভ করায় আমাদের আত্মিক ও নৈতিক শক্তির হবে উদ্বোধন। তখন আমরা কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় বলতে পারব—

"চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া
অতীতের সেই মহা আদর্শ ॥
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে
রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ ॥"

এই সংস্কৃত সাহিত্যই ভারতবর্ষে মাতৃভূমির প্রতি জাগিয়ে তোলে সাতিশয় অনুরাগ। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর "The Fundamental Unity of India" নামক গ্রন্থে বহু যুক্তি এবং তথ্য সহকারে বলেছেন—

"This intense passion for father-land, indeed utters itself throughout Sanskrit literature." (Page 56)

তাই প্রগতিবাদী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষানেতাদের জানিয়েছেন উদাত্ত আহ্বান—

"Before flooding India with socialistic and political ideas, first deluge the land with spiritual ideas. The first work

that demands our attention is, that the most wonderful truths confined in our Upanishads, in our scriptures, in our puranas, must be brought out."

ধর্ম ও নীতিশিক্ষায় সংস্কৃত :—শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম ও নীতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। Dictum of the 7th Earl of Shaftbury-তে পাই—

"Education without instruction in religion and morals would merely create a race of clever devils."

সংস্কৃতশিক্ষা ধর্ম ও নীতি-নির্ভর। তাই শিক্ষাব্যবস্থায় এই ধর্ম ও নীতি-মূলক সংস্কৃতভাষা অবশ্যই গ্রহণীয়। কিশোর-চিত্তে নীতি এবং ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত করার জন্য সংস্কৃত "পঞ্চতন্ত্রাদি" গ্রন্থের খ্যাতি জগৎজোড়া। এই সকল গ্রন্থের নীতি-প্রেরণা মানুষকে আবার সংসারবিমুখও করে না। ভারতে বিলাতী শিক্ষার প্রথম যুগে চিন্তাশীল ইংরেজরা নীতিশিক্ষার জন্য সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ১৯১৪-এর সরকারী Despatch-এ বলা হয়েছে—"There were in the Sanskrit language many excellent systems of ethics with codes of laws and compendiums of duties." তাই, বিলাতের Court of Directors সংস্কৃতশিক্ষার জন্য যথোচিত ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন। ভারতে মধ্যশিক্ষা পুনর্বিন্যাসের জন্যে সরকারীভাবে গঠিত মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে এই সম্বন্ধে তাই মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে—

"The classical language have always exercised a great attraction.…To the bulk of Indians, *Sanskrit*, which is the mother of most Indian languages has always *appealed both from the* cultural and religious point of the view.…There is a great deal to be said in favour of the view that the study of language should be promoted." (Page-69)

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থায় এই ভাষার শিক্ষাসম্বন্ধে কতটুকু উন্নতি বিধান করা হয়েছে, তা চিন্তার বিষয়।

আমাদের ধর্মসাধনা সংস্কৃতনির্ভর। এমন কি বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মেরও উচ্চতর দর্শনাদিগ্রন্থ সংস্কৃতেই বিরচিত। শ্রীমৎ শংকরাচার্য, রামানুজাচার্য, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, এমনকি বর্তমান যুগে মহর্ষি দয়ানন্দ প্রভৃতি যুগন্ধর ধর্মপ্রবক্তারা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ধর্মপ্রচার করেছেন সংস্কৃত ভাষারই মাধ্যমে। ভারতের অধ্যাত্ম-সমুন্নতি-প্রয়াসী জনগণের নিকট সংস্কৃত ভাষাশিক্ষা অপরিহার্য।

মাতৃভাষাশিক্ষায় সংস্কৃত :—সকল শিক্ষাকমিশনের মতো মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

"Amongst languages, the highest importance is to be given to the mother-tongue." (Page-98).

তাছাড়া, মাতৃভাষায় পরিণত জ্ঞানের অভাব শুধু লজ্জার নয়, অপরাধবিশেষ। আমাদের মাতৃভাষা সংস্কৃত হ'তে উদ্ভূত ; সংস্কৃতশিক্ষা ব্যতীত মাতৃভাষায় আমাদের পরিণত জ্ঞান কখনো সম্ভব নয়। ভারতে মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য সংস্কৃতজ্ঞানের অপরিহার্যতার কথা বৃটিশ ভারতেও শাসকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। বিখ্যাত প্রশাসক A. Frazer "Report on the Sanskrit College, Calcutta (31st January, 1835)"-এ লিখছেন—

"The acquisition of Sanskrit is indispensable not only for the study of the classical books composed in that language, but principally as the mother language of a great number of Indian dialects···. It is true and obvious that a true and radical reform of a nation in learning and morality (which is the object of a good government) will begin and proceed with the improvement of their own national language. এই প্রসঙ্গেই পুণা সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ Captain Candy তাঁর রিপোর্টে (১৮৪০ খৃষ্টাব্দ) বলেছেন—

"Sanskrit, I conceive to be the grand reservoir from which strength and beauty may be drawn for the vernacular languages···I look on every native who possesses a good knowledge of his own mother-tongue, of Sanskrit and of English to possess the power of rendering incalculable benefit to his countrymen."

তাই, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষা এবং দীক্ষায় সংস্কৃতের দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর জীবনী অনুসন্ধান করলে তাঁর বাল্যকালের সংস্কৃতশিক্ষার পরিপাটি ব্যবস্থার কথা জানা যায়। তিনি বাংলা-শিক্ষার্থীর পক্ষে সর্বাগ্রে সংস্কৃতশিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজনের কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন ; নিজে সংস্কৃতশিক্ষার জন্য গ্রন্থও রচনা করেন "সংস্কৃতপাঠঃ" নামে। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা-পাঠার্থীদের তিনি নিজেও সংস্কৃত অধ্যাপনা করতেন। আমাদের মাতৃভাষাকে নব নব শব্দসম্ভার এবং ভাবরাজিতে সমৃদ্ধ করতে হলেও সংস্কৃতের জ্ঞান অপরিহার্য। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের

পরিণত সংস্কৃতজ্ঞান তাঁদের সাহিত্য-প্রতিভা-বিকাশে এক বিরাট স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। বর্তমান ভারতে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী দ্ব্যর্থহীন ভাবে সংস্কৃতশিক্ষার অবশ্য-প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা ক'রে বলেছিলেন—

"I quite agree that the study of Sanskrit is sadly neglected. I belong to a generation which belived in the study of the ancient languages. I do not believe that such a study is a waste of time and effort. I believe it is an aid to the study of modern languages. This is more true of Sanskrit than any other ancient language so far as India is concerned. and every nationalist should study it because it makes a study of the provincial languages easier than otherwise. It is the language in which our forefathers thought and wrote.…No translation can give the music of the original, which, I hold, has a meaning all its own."

(Harijan, 23rd March, 1940)

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন ভারতসচিব Sir Charles Wood ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারই ফলে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতা মাদ্রাজ এবং বোম্বেতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ভারতীয় মাতৃভাষা শিক্ষার জন্যই সংস্কৃতশিক্ষাকে আবশ্যিক করার প্রয়োজনীয়তা তিনি সেদিন ঘোষণা করেছিলেন। সেই বিখ্যাত "Wood's Educational Despatch of 1854"-এ স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে—"A knowledge of the Sanskrit language, the root of the vernaculars of the great part of India, is more especially necessary to those who are engaged in the work of composition in those languages."

জাতীয় সংহতি সৃষ্টিতে সংস্কৃত :—জাতীয় সংহতির অভাব স্বাধীনোত্তর ভারতের এক বিরাট সমস্যা। বহু ভাষা এবং বহু প্রদেশে বিভক্ত এই বিশাল উপমহাদেশ অনন্ত-বৈচিত্র্যের লীলাভূমি। একমাত্র সংস্কৃত ভাষাই এই বহুধা-বিভক্ত জনগণের ঐক্যসূত্র। অতীতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহৃত হ'ত। কেরলের শ্রীমৎ শংকরাচার্য, বাংলার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভৃতি মনীষী নিখিল ভারতে তাঁদের ভাবধারা প্রচারে সর্বভারতীয় ভাষা সংস্কৃতকেই গ্রহণ করেছিলেন, কোনো প্রাদেশিক ভাষা নয়। আন্তঃরাজ্য-সংযোগ এবং ভাবের আদান-প্রদান সংস্কৃতেই নিষ্পন্ন হ'ত। তখন অধিকাংশ রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা ছিল সংস্কৃত।

এই বাংলাদেশেই পাঠান শাসনের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ লক্ষ্মণসেনের শাসনকাল অবধি রাজকার্য সংস্কৃতেই সম্পাদিত হ'ত। বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত প্রাচীনতম গ্রন্থ "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের" টীকা সংস্কৃতে রচিত। চৈতন্যচরিতামৃতের টীকাও সংস্কৃতে রচিত। অধিক প্রচলিত এবং সর্বভারতীয় ভাষা বলেই এই সব টীকাকার সংস্কৃতকে অবলম্বন করেছিলেন। সংস্কৃত মন্ত্রাদিতেও সর্বভারতীয় ঐক্যচেতনাকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। যেমন, সামান্য জলশুদ্ধির মন্ত্রেও দেখি—"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥" বহুরাজ্যে বিভক্ত এই ভারতের জনসাধারণ একমাত্র সংস্কৃতের স্বর্ণসূত্রেই একসঙ্গে বাঁধা ছিল। সুতরাং ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে যদি ভারতীয় চিত্তে ঐক্যবোধ জাগ্রত করতে হয়, তাহলে একমাত্র সংস্কৃতই হচ্ছে তার নিদান। সুতরাং স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের চিত্তে একান্ত প্রয়োজন ঐক্যবোধের বীজ বপন করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করা অপরিহার্য। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং রাজনীতিবিদ সর্দার ডঃ কে. এম্. পানিক্কর বলেছেন – "When we talk of our national genius being unity in diversity, the fundamental oneness of the Indian mind ; what we are really meaning is the dominance of Sanskrit which overrides the regional differences and linguistic peculiarities and achieves a true national and even gives form and shape to the languages.····*The Unity of India will collapse if it ceases to be related to Sanskrit and breaks away from Sanskrit and the Sanskrit traditions. Sanskrit alone has the preeminence which Hindi could never claim over the great regional languages enabling her to maintain and uphold in every region of India* the supreme claim of Indian Unity". মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা ডঃ ৺পট্টভি সীতারামায়া বলেছেন—"To us in South India, I do not see how we shall stand to lose by recognising Sanskrit as the national language. We can understand Sanskrit better than Hindi and other derivatives of Sanskrit." এই সকল কারণে এক সংস্কৃত ভাষার সূত্রেই ভারতের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণকে বাঁধা যেতে পারে। জাতীয়সংহতির চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা তাই একান্ত প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক মর্যাদা অর্জনে সংস্কৃত :—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের যা মর্যাদা, তা কেবলমাত্র ভারতীয় সংস্কৃতির শাশ্বত অবদানের জন্য। আর সেই সংস্কৃতি হ'ল সংস্কৃত-ভাষাশ্রিত। সুতরাং

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের প্রাপ্ত সম্মানের মর্যাদা রক্ষা করতে হ'লে সংস্কৃত শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে যে কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ "অক্স্‌ফোর্ড্‌" বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে "ডি-লিট্‌" উপাধিপ্রাপ্তির প্রতিভাষণ দিয়েছিলেন সংস্কৃতে ; শান্তিনিকেতনে সাংস্কৃতিক মিলনোৎসবে চৈনিক প্রতিনিধিগণকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন সংস্কৃতে। এই সেদিনও ভারত-রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সোভিয়েট রাশিয়ায় মৈত্রীযাত্রায় গমন করলে সোভিয়েট সরকার ভারত-রাষ্ট্রপতিকে সংস্কৃতভাষায় রচিত মানপত্র দিয়ে সম্বর্ধিত করেন। অতীতে সংস্কৃতের মাধ্যমেই পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে ভারতের রাখীবন্ধন রচিত হয়েছিল। তাই, আজও সংস্কৃতই হচ্ছে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সত্যিকারের সার্থক মিলনভূমি। এই প্রসঙ্গে Rew Warner তাঁর "Cult of Power" (London 1946) গ্রন্থে লিখছেন—

"......a knowledge of the common origins of our ways of thought is a desireble thing to have in a world which must unite or perish. ...One might, on similar grounds, advocate the teaching of Sanskrit in all Indo-European schools." (Page 151.)

তাই ভারত সরকারের "Sanskrit Commission"-এর রিপোর্টে লিখিত হয়েছে—

"It was the inspiration from Sanskrit which had led to the establishment of the Indo-European world, and had brought in a new conception of history. On a study of Sanskrit and its sister languages, the basic unity of the Indo-European people has been, to some extent, established." (Page 74)

শুধু ইউরোপে কেন, এশিয়ারও অন্যান্য দেশের সঙ্গে সংস্কৃতের মাধ্যমেই ভারতের মৈত্রীবন্ধন রচিত হয়েছিল। প্রাচীন চীনে সংস্কৃতচর্চার একটি প্রশস্ত ধারা সেদিন বিদ্যমান ছিল। তথাকার সুপ্রাচীন "বোধিরুচি" মঠে সাতশত সংস্কৃতজ্ঞ ভিক্ষু বসবাস করতেন। সেই অতীতে সংস্কৃত-চৈনিক অভিধান তাঁরা রচনা করেছিলেন। হিউয়েন সাং-এর মতো মুমুক্ষু বিদ্যার্থীরা ভারতেই তীর্থযাত্রা করতেন। তিনি "মোক্ষাচার্য" এবং "মহাযানদেব" এই দুটি সংস্কৃত নাম নিজের চৈনিক নামের পরিবর্তে গ্রহণ করেছিলেন এবং চীনে ফিরে গিয়েও সংস্কৃত ভাষাতেই ভারতীয় গুরুদের সঙ্গে পত্রালাপ করতেন। কাম্বোডিয়া, জাভা এবং বোর্ণিয়োতে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত বহু শিলালিপি পাওয়া গেছে। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের পতি স্বর্গত রঞ্জিত পণ্ডিত বহু গবেষণা ক'রে প্রমাণ করেছেন যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে

বিভিন্ন দেশের আদানপ্রদানের ভাষা ছিল তখন একমাত্র সংস্কৃত। বিখ্যাত Spanish গ্রন্থকার এবং ঐতিহাসিক তাঁর "Le Races Aryans de Peru" গ্রন্থে বলেছেন যে দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি, বিশেষ ক'রে পেরু সংস্কৃতি সংস্কৃত ভাষার দ্বারা বেশ প্রভাবিত। তিনি লিখছেন —"Every page of Peruvian poetry bears the imprint of the Ramayana and Mahabharata. Sanskrit was the secret language of the rulers and Quichna, the language of the Peruvians."

সংস্কৃতের আন্তর্জাতিক প্রসার :—Sanskrit Commission-এর রিপোর্টেই বলা হ'য়েছে—

"Sanskrit by its origin and its basic character links us to the West. But it has been no less a potent bond of union for India with the lands of Asia—with Serindia or Central Asia of ancient and mediaeval times where the cultures of China and India had a common meeting place; with Tibet, with China and the lands within the orbit of Chinese civilisation —Korea and Japan and Vietnam; and above all, with the lands of farther India—Burma and Siam, Pathet Lao and Cambodia and Cochin China or Champa and the area of Malaya and Indonesia. Ceylon is of course a historical and cultural projection of India. In all these lands, Sanskrit found a home for itself as the vehicle of Indian thought and civilisation which flowed out into them as a peaceful cultural extension, from the closing centuries of the first thousand years before Christ. It found for itself new homes in the other countries of Asia as noted above. It found also a place of honour in the culture of a great and civilised people like the Chinese and following the Chinese the Korians, the Japanese and the Vietnamese, and also the Tibetans, and the Turks of Central Asia, and the Mongols and the Manchus."

(Page 74)

তাই, সংস্কৃতের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক বিশ্ব ভারতবর্ষকে জানে এবং সেই জন্যই মর্যাদা দান করে। সংস্কৃতবর্জিত ভারত এবং সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ভারতবাসী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শুধু অপাঙ্‌ক্তেয় নয় ধিকৃতও বটে। এই কারণেও স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃতের আবশ্যিকতা অনস্বীকার্য।

সংস্কৃত সম্বন্ধে মনীষিমণ্ডলীর অভিমত :—প্রসঙ্গক্রমে কয়েকজন স্বদেশী এবং বিদেশী দূরদর্শী মনীষীর সংস্কৃতবিষয়ক সদুক্তিসমূহ বিশেষভাবে স্মরণীয়।—

"I believe in the great power which Vivekananda used to ascribe to sanskrit. We are unnecessasorily frightened by the difficulty of learning Sanskrit······And that it must not be forgotten that such a knowledge of Sanskrit gives one a master-key to the knowledge of the majority of Indian languages not exceeding the southern group."

(M. K. Gandhi)

"The lives of over two hundred million people in our country are associated with the sacred rituals in Sanskrit from birth to death...Sanskrit is thus our great source of strength. The world is in a mess. It could only be redeemed by a wide appreciation of the Ramayana, the Mahabbharata and the Bhagavadgita and of the inspiring message of the upanishads, which teach truth and non-violence and above all, faith in the dignity of man's personality, in the moral order and in God." (Dr. K. M. Munshi)

"There is great inspiration in Sanskrit literature. This is why the study of Sanskrit has become essential for free India." (Dr. Harekrisha Mahtab)

"Its (Sanskrit) suitability to be the medium for legal, philosophical and scientific thought is unrivalled."

(Dr. Sampurnananda)

"The study of Sanskrit is not a luxury and should not be looked upon as such. *It is a necessity.* Sanskrit, being our greatest single national inheritance, the roots of our national behaviour, pattern of our thought and the source of all our ideas being embeded in Sanskrit, a familiarity with it is necessary for any one who claims to be a true Indian.

Sanskrit alone has the pre-eminence which Hindi could never claim over the regional languages enabling her to maintain and uphold in every region of India the supreme claim of Indian unity." (Sardar K. M. Panikkar)

সত্যসন্ধানী পাশ্চাত্যমনীষীদের গভীর গবেষণালব্ধ সত্যভাষণগুলো ভারতীয় শিক্ষানিয়ন্তাদের বিভ্রান্তি দূর করুক—

"Such is the marvellous continuity between the past and the present in India, that inspite of repeated social convulsions, religious and foreign invasions, Sanskrit may be said to be the only language that is spoken over the whole extent of that vast country. We can hardly understand how, at so early a date, the Indians had developed ideas which to us sound decidedly modern. Some of the riddles of the future find their solution in the wisdom of the past." (Prof. F. Maxmuller)

"Sanskrit, it is of a wonderful structure, more perfect than Greek, more copious than Latin and more exquisitly refined than either." (Sir William Jones.)

"Justly it is called Sanskrit i. e., perfect. finished. The Sanskrit combines these various qualities, possessed separately by other tongues.... Judged by an organic standard of the principal elements of language, the Sanskrit excels in grammatical structure and is indeed the most perfectly developed of all idioms not excepting Greek and Latin"

(Prof. Schelegel)

"Its exceeding age, its remarkable conservation of primitive materials and forms, its unequalled transparency of structure, give it an indisputable right to the first place among the tongues of the Indo-European family."

(Prof. Whitney)

"Sanskrit is a language of unrivalled richness and variety, a language, the parent of all those dialects that Europe has Finally called classical." [W. C. Taylor]

"The intellectual debt of Europe to Sanskrit literature has been undeniably great." (Prof. Macdonell)

"It is impossible to conceive a language so beautifully musical or so magnificiently grand." (Prof. H. H. Wilson)

"The most beautiful perhaps of all languages."

(Prof. A. Pictat)

প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধির আশংকায় আরো উদ্ধৃতিপ্রয়োগে নিরস্ত হওয়া গেল।

স্বাধীনতার পূর্ণতা-সম্পাদনে সংস্কৃত :—সর্বোপরি, ভারতের স্বাধীনতার পূর্ণতাসম্পাদনের জন্য সংস্কৃত শিক্ষা অপরিহার্য। স্বাধীনতার দুটি দিক—রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক। আমাদের দেশে বহু সাধনায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা এলেও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এখনো আসেনি। অথচ, সাংস্কৃতিক পরাধীনতা (cultural slavery) রাজনৈতিক পরাধীনতার (Political Slavery) চেয়ে অধিকতর ক্ষতিকর এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা না এলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা স্থায়ী হ'তে পারে না। সংস্কৃতকে অস্বীকার করে ভারতের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অসম্ভব। তাই, ভারতের কষ্টার্জিত স্বাধীনতার পূর্ণতা-সাধনের জন্য সংস্কৃত ভাষা অবশ্য গ্রহণীয় তথা অবশ্য শিক্ষণীয়।

হিন্দীশিক্ষায় সংস্কৃত :—ভারতের সরকারী ভাষা স্থিরীকরণকালে সর্বভারতীয় ঐক্য, সর্বপ্রদেশীয় জনগণের প্রতি সম বিচার এবং ভাষার অফুরন্ত প্রাণশক্তির কথা বিবেচনা করে সংস্কৃতকেই সেদিন গ্রহণ করার জন্য গণপরিষদে প্রস্তাব এনেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ হ'তে নির্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধি নাজিরুদ্দিন আহমেদ। আর তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিলেন গণপরিষদেরই তৎকালীন বিশিষ্ট সদস্য ৺ড. বি. আর. আম্বেদকর, ৺ডঃ বি. ভি. কেশকার, ৺শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী, ৺ডঃ পি. সুব্বারায়ন, শ্রীমতী দুর্গাবাঈ, শ্রী ভি. এস. মুনিস্বামী পিল্লাই, পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এবং আরো অনেকে। বাইরে থেকে সার মির্জা ইসমাইল, নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক আচার্য চন্দ্রশেখর বেংকট রমণ, ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু, ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়া, শ্রী এস নিজলিঙ্গাপ্পা, ডঃ মাধবদাস শ্রীহরি আণে প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই সংস্কৃত ভাষার পক্ষেই মত প্রকাশ করেন। নানা রাজনৈতিক স্বার্থ-বুদ্ধিতে পরিচালিত হয়ে হিন্দীকে দ্বিতীয়বার ভোট-গণনায় একটি মাত্র ভোটাধিক্যে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করলেও পূর্বকথিত কারণে সংস্কৃত হতেই শব্দাবলী গ্রহণ করার জন্য ভারতীয় সংবিধানে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে—

"It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expression used in Hindusthani and in other languages of India specified in the eighth schedule and by drawing...for

its vocabulary, ***primarily on Sanskrit*** and secondarily on other languages". (Indian Constitution. Page. 170).

সুতরাং, এই আপাতস্থিরীকৃত রাষ্ট্রভাষা শিক্ষার জন্যও প্রথমে সংস্কৃত শিক্ষা করা প্রয়োজন। সংস্কৃতে জ্ঞান থাকলে যে কোন ভারতীয় ভাষা সহজেই স্বল্প সময়ে শিক্ষা করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে ১৯/১০/৫২ তারিখে মধ্যপ্রদেশের তৎকালীন রাজ্যপাল ৺ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়া সুচিন্তিতভাবে বলেছিলেন—

'Sanskrit can no longer be regarded as a dead language. It is up to us to make it a living language. Sanskrit remains dead today because it is neglected. To us in South India, I do not see how we shall stand to lose by recognising Sanskrit as the national language. We can *understand Sanskrit better than Hindi* and other derivatives of Sanskrit. In Telegu there is 60 p.c. Sanskrit admixture and in Malayalam whole samasas of Sanskrit are incorporated".

পাশ্চাত্য জগৎও স্বাধীন ভারতকে সংস্কৃতের মাধ্যমেই দেখতে চায়। বর্তমান লেখক কর্তৃক সংস্কৃতে অনূদিত রবীন্দ্রনাথের "মুক্তধারা" নাটক প্রকাশিত হ'তে দেখে পশ্চিম জার্মানীর মিউনিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত আচার্য ডক্টর ফেডারিক্ হাইলার ২৪/৭/৬৪ তারিখে লিখিত পত্রযোগে নানা-কথার সঙ্গে জানাচ্ছেন—

"...I love Sanskrit as the most perfect language of the world, the earthly expression of the eternal ritam. Every Sanskrit verse is heavenly music for my ears. I only regret that the independent Indian State did not accept Sanskrit as the official language of India. Just as Israel has adopted the ancient language of the Old Testament to modern condition India could do the same with regard to Sanskrit...."

যাই হোক্, সংস্কৃতকেই মধ্যে রেখে অন্য ভাষা শিক্ষা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত সাহিত্যিক কাকা কালেলকার সুন্দর ভাবে বলেছেন—

"Any number of guests may invited to the house, but care has to be taken to see that the guests do not crowd out the host."

সিদ্ধান্ত :—এই সব কারণে শিক্ষাসংস্কারের জন্য গঠিত আচার্য সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে "University Education Commission" (১৯৪৮

—৪৯), আচার্য লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রের সভাপতিত্বে "Secondary Education Commission" (১৯৫২—৫৩) শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর খেরের অধিনায়কত্বে "Official Language Commission" (১৯৫৫—৫৬) এবং ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নায়কত্বে "Sanskrit Commission" (১৯৫৫—৫৬)-এ সর্বজননী শিক্ষায় সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তা দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রণ্ট সরকার গঠিত ভবতোষ দত্ত কমিশনের এই সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত শিক্ষার স্বার্থে অবিলম্বে রূপায়িত করা প্রয়োজন। প্রগতিশীল চিন্তার ধারকরূপে সরকার—স্বীকৃত গণিতজ্ঞ, ঐতিহাসিক, ও অর্থনীতিবিদ্‌গণ এই কমিশনের সদস্যরূপে মনোনীত হন। বিশেষত, কমিশনের সভাপতি আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবিদ এবং বহুদর্শী স্থিতধী অধ্যাপক এবং প্রশাসক ডঃ ভবতোষ দত্ত মহোদয়ের নেতৃত্বে গৃহীত এই সিদ্ধান্ত প্রগতির প্রতিষ্ঠাকামী সরকারের অবিলম্বে কার্যকর করার মাধ্যমে সরকারী নেতৃত্বের সততাই প্রমাণিত করবে। তাঁদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে :

Basic Considerations

10.8.1. Sanskrit has been the principal repository of the products of Indian thought over thousands of years. Its literature is vast and varied, and embraces all aspects of life. It is the confluence of various Indo Aryan families of languages. As such it is very important for the study of comparative philology/comparative Linguistics of these famiiles of languages. In this context, it would not be out of place to quote a few lines from the introductory brochure on Sanskrit published in the series "The Languages of Asia and Africa" under the auspices of the Central Department of Oriental Literature, "Nauka" Publishing House, Moscow.

10.8.2. "The symbolic role of Sanskrit in Indian culture corresponds to a certain extent, to its role in the structure of the Indian society. Sanskrit serves not only as a measure of social differentiation, but also as a measure of the level of social organisation of the given society. On the other hand, it performs a unique function of a cementing force. The very notion of India is hardly conceivable without Sanskrit, which has symbolised and cemented unity of Indian culture and history throughout severeal millenia.

10.8.3. The above-mentioned features of Sanskrit single it out from all other great languages of the world. Sanskrit has a unique value for the theoretical study of such problems as language and time, language and culture, language and society, the interrelation of the literany language and spoken dialects, the intermixing of languages, the problem of artificial language, the possibility of the co-existence of cognate languages at different stages of development. All this makes the study of Sanskrit very important for general linguistics"—(V. V. Ivanov and V. N. Toporov : SANSKRIT pp. 26-27/ published by the USSR Academy of Sciences, Institute of the Peoples of Asia, Moscow, 1998).

10.8.4. Sanskrit is the mother of most of Indian languages. The relation of Sanskrit with them is much more close than that of Latin and Greek with modern European languages. Bengali is a direct descendant of Sanskrit. The Bengali grammar is, in fact, derived from the Sanskrit grammar. About 75 percent of Bengali words are either Sanskrit words as such or closely related to them. Even now when one has to build a new word in Bengali, (or in such modern Indian languages as Hindi, Gujrati, Marathi etc.) in most cases one has to look for a suitable Sanskrit word of a Sanskrit root and also use basically Sanskrit rules for formation of words, in spite of the claim by some people that the Bengali grammar has now become independent of the Sanskrit grammar. Formation of new words is, at present, a great necessity for Bengali and this necessity will continue for a foreseeable future.

10.8 5. So far as studying Bengali (or Hindi, Gujrati, Marathi etc.) in depth and critically at the Honours and M. A. levels is concerned a good grounding in Sanskrit is a sine quo non. The same observation holds equally good for study of Indian Philosophy at the Honours and M. A, levels and study of Indian History up to the end of the twelvth century. (of course, it should be mentioned here that for

the history of the subsequent six centuries Persian has the same role.)

10.8.6. Study of History of Science is coming up. In this subject contribution of India in olden days can by no means be neglected. Here also a good grounding in Sanskrit is essential for study of original books, and this cannot be avoided. Here in lies the importance of the study of Sanskrit by a good number of our scientists.

10.8.7. Recently the University of Calcutta has started a Bacheler's Degree course in Ayurvedic Medicine and Surgery. For a good understanding and correct appreciation of classical books recommended for this course (although these books are provided with Bengali translations) a good knowledge of Sanskrit is also essential.

10.8.8. The Kothari Commission (*i. e.* the Education Commission 1964—66) has laid great stress on learning library languages other than English, such as Russian, German, French, Spanish, Japanese and Chinese. It has laid special stress on learning Russian [of S 1.57 and S 11. 60 (3) of the Report of the said Commission and also S 3 (g) of chapter I of the Summary of Recommendations made by it 7. A good knowledge of Sanskrit grammar will be of great help to one learning highly Inflexional languages like Russian, German etc. quicklv. Particularly useful are Russian and German, the structure of the grammars of these languages being closely related to the Sanskrit grammar.

10.8.9. All the above points are secular in nature and, thus, supporting study of Sanskrit cannot be branded as support in Hindu revivalism.

10.8.1o. Importance of study of Sanskrit has been recognised by the Government of India and it is supporting some universities/institutions meant for the study of Sanskrit along withe other subjects like Hindi, Bengali, English etc. as subsidiary subjects with more or less a uniform structure for the courses of studies. For these institutions, which have

not the status of a university the examinations are conducted by a central body. The object of such institutions has been to produce Sanskrit Scholars who can play their proper and effective role in modern society and remove the isolation of the old tol/chatuspathi system. In West Bengal there is only one such institution (not of the status of a university), namely, the Mugberia Bholanth Sanskrit Mahavidyalaya in the village Mugberia in the district of Midnapore, but the number of students there is very small for reasons stated in the next section.

10.9. Present state of study of Sanskrit in West Bengal—

10.9.1. It has been observed that the number of students studying Sanskrit in the B.A. Honours and Pass courses drastically declined over the past few years. The situation has reached a critical stage. One may be afraid that Sanskrit will eventually cease to be a part of our college curriculum. The principal reason for this decline of study of Sanskrit is economic. The study of Sanskrit has at present a very low job potential. Those who specialise in Sanskrit have a bleak future for appointment as teacher of Sanskrit even in a secondary school. *This situation has been created by making Sanskrit optional for classes IX and X in secondary schools in such a way that it can be easily avoided as a non-essential subject.* In effect, its study has been discouraged at this stage, So very few students are opting at this stage for Sanskrit and as a consequence they cannot take up Sanskrit at the next stage even if they feel a necessity for it. Study of Sanskrit for two years in classes VII and VIII does not serve any real purpose—it does not help the students to any significant degree in any direction and often begets in them an apathy for the subject, Under the present system a student is thus forced to take an important decision at too early a stage. The fate of Mathematics as a core subject in the former Eleven Year Higher Secondary Course is a pointer to the defect of leaving to the student of tender age a choice

for not too soft a subject. The total number of marks at the secondary stage has been reduced by 100 to give the student an easy pass, Sanskrit has been the victim of this policy as the policy-makers failed to appreciate the relative importance of Sanskrit. As a consequence of this policy even in the Sanskrit Collegiate School very few students take up Sanskrit as one of the subjects.

10.9.2. There is also another reason for a lesser number of students taking Sanskrit as a Pass subject at the B.A. stage. In some colleges the routine is arranged in such a manner that the students, who like to take up Sanskrit as a Pass subject cannot do so because Sanskrit classes are scheduled in the same hours along with other subjects which also they desire to take. The number of students studying in post secondary stages is also diminishing in its turn ; the demand for Sanskrit teachers at these stages diminish as a consequence and thereby the job potential for Sanskrit scholars is also being lowered further. The teachers, who have already been appointed have very little work to do and the result is a huge loss of public funds, which will continue for a long time unless the present situation is remedied by turning this expense into a useful one for which a real need exists.

10. 10. Suggested steps for strenghhening study of Sanskrit

10. 10. 1. The first step for strengthening the study of Sanskrit and remedying the present sorry state of affairs lies in the strengthening of study of Sanskrit in the secondary schools. This may be done in one of the following ways :

(i) Introduction of study of Sanskrit as a compulsory subject as a half paper (50 marks) by allotting 150 marks to Bengali as the first language and 50 marks to Sanskrit. The syllabus for Bengali should be modified accordingly to have an efficient and effective syllabus within 150 marks to be taught within the time that can be allotted in the routine for 150 marks. The syllabus for Sanskrit should also be modifide and adjusted accordingly and its teaching should be

modernised and made effective for the purposes for which it is being strengthened. Modern techniques of terching Sanskrit by easy, interesting and scientific methods are included in the B' Ed. syllabus (Calcutta University) but unfortunately, even trained teachers do not use these methods in the secondary schools. These or any other improved techniques should be followed. Sanskrit as an elective classical subject should continue in the secondary schools but techniques of teaching will have to be modernised. It is a needless to mention that Sanskrit should be taught by teachers well qualified to teach Sanskrit.

(ii) Reintroduction of one full paper (100 marks) on Sanskrit as a compulsory additional language in the secondary school stage only leaving the other things unchanged i. e. restoration of status quo ante,

10. 10. 2. of these the first one will not increase the language load of students to any great extent and will not make much inroad on the time in the routine. It will be taught where it is most needed and at the same time will not restrict the choice of optional/elective subjects by students in secondary/higher secondary stage. It will make study of rudiments of Sanskrit continuous from Class VII to class X which will be beneficial for learning the language. It has to be borne in mind that a good number of students in the science stream also may like to study Sanskrit latter either as a necessity or for pleasure.

10. 10. 3. The following steps may also be taken for the purpose of encouraging the study of Sanskrit :

(i) Making study of one paper Sanskrit compulsory within eight papers of Bengali Honours and Philosophy Honours and also in the M. A. courses (10 papers) in the corresponding subjects. Introduction of this arrangement will be easy and natural if the suggestion (i)-(a) is followed as recommended above.

(ii) Making a good knowledge of Sanskrit (or Persia) a

pre-condition for admission to courses in Indian History at the M. A. level. Study of some Sanskrit (or persian) texts should be made compulsory at this stage.

(iii) Introduction of separate certificate and diploma courses in Sanskrit on the lines of similar courses in Russian, German, French. Spanish, Tibetan, Chinese, Japanese already in operation. Such a course is feasible. If a highly inflexional language like Russian (with six cases for nouns, and pronouns with three genders and the adjectives agreeing in gender, case and number with those of the nouns they qualify can be successfully taught in such courses, there is no reason why similar courses in Sanskrit should not be successful. These courses should be open to people who have not studied Sanskrit in the Higher Secondary level or its equivalent. Students should be allowed to study these courses concurrently with any degree course.

(iv) Class routines should be such that students desiring to take up Sanskrit as a pass subject at the B. A. level are not put to such inconvenience as mentioned earlier—there should be a spirit to accommodate Sanskrit and not to be antagonistic to it.

10. 10. 4. If the above steps are taken the employment opportunities of Sanskrit scholars will naturally increase. However, Sanskrit scholars should not be discriminated against, out of prejudice, for employment.

In this respect the Sanskrit scholars themselves have to play a big role to be updating their training by including modern subjects in their curricula for traditional Sanskrit Schools i. e. Tols/Chatuspathies.

10. 11. Establishment of a Sanskrit University and an Advanced. Centre of Study in Sanskrit and allied subjects.

10. 11. 1. In view of the importance of Sanskrit studies and the steps taken by the Government of India for establishing Sanskrit Universities/Special institutions for Sanskrit studies, it is suggested that a Sanskrit University be establi-

shed in this State. The Sanskrit College may serve at the core of this university. Advanced Centre for Study places in the State under the supervision of the Sanskrit University. Nabadwip should be a site for such an Advanced Centre of Study, which may later be developed into University. The courses of study in a Sanskrit University should include current subjects and should not encourage isolationism.

10. 11. 2. As an immediate first step in the direction of founding a Sanskrit University, the Sanskrit College be made an Advanced Centre of Study for Sanskrit and alliem subjects.

[Report of the Commissions for Planning Higher Education in West Bengl Page—136—140. Govt. of W. B. 1984]

তাই মধ্য এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সকল শাখাতেই ৬ষ্ঠ হ'তে ১২শ শ্রেণী পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষাকে অবশ্যপাঠ্য করলে সর্বজনীন শিক্ষায় সংস্কৃতের স্থান কিছুটা রক্ষিত হবে। সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি সংস্কৃত না জানার অভিশাপ হ'তে মুক্ত হবে। কলেজীয় শিক্ষায় কলাবিভাগে স্নাতক পর্যায়ে অন্ততঃ ১00 নম্বরের একটি পত্র সংস্কৃতের জন্য অবশ্যপাঠ্যরূপে সংরক্ষিত করা একান্ত প্রয়োজন। আর স্নাতকোত্তর শিক্ষায় সকল সাহিত্য এবং দর্শন শাখার শ্রেণীতেও ১00 নম্বরের একটি সংস্কৃত পত্রের পাঠ প্রবর্তন করা সমুচিত বলে মনে হয়।

কয়েক বৎসর পূর্বে প্রাক্তন উপাচার্য এবং বিচারপতি ডঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সরকার কর্তৃক গঠিত "শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষা পুনর্বিন্যাস" কমিটির সংস্কৃতবিষয়ক অভিমতটিও বিশেষভাবে প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়—

"Sanskrit is a language in which the civillzation of India has found its expression for over thousands of years. Its influence on Indian civilization is inestimable. By its dynamic force it has absorbed and assimilated numerous elements attaining a classical character. As a language it has unsurpassed and unsurpassable intellectual value. Study of Sanskrit promotes intellectual discipline, and has great effect on the formation of national character. It is the greatest treasure India possesses and is her finest heritage. It would be a great loss to the country, to its culture and heritage if the language is lost. Sanskrit has practically an infinite variety of synonyms and antonyms and is capable of expressing every shade of

thought. It is from Sanskrit that words relating to higher culture could be derived. India needs new scientific and technical words for the development of Science. Sanskrit can supply in abundance the words for the growth of Science and Technology, subjects perhaps to retaining a few words of international use. Sanskrit presents the greatest common measure of agreement in its vocabulary among most of the languages of Modern India, and is vital to their development. *So the study of Sanskrit is essential.*" (Page 6.)

(১৭) উপসংহার—

যুগের প্রয়োজনে আজ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাজগতে নানাবিধ পরিবর্তন ঘটে চলেছে। তারই অজুহাতে সংস্কৃতশিক্ষাকে বৈদেশিক শাসনে যে স্থান দেওয়া হয়েছিল, তার থেকেও বিচ্যুত করা হ'য়েছে। বিশেষ করে বর্তমানে সাময়িক রাজনীতিতে প্রভাবিত সীমিত-দৃষ্টিসম্পন্ন অনেক শিক্ষাজীবীর প্রচেষ্টা সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তারের, দেশের যথার্থ কল্যাণের বিরুদ্ধ পথে চলেছে; অনেক ক্ষেত্রে অদূরদর্শিতা ও বিপরীতবুদ্ধি শিক্ষার মূল ভিত্তিকে কম্পিত করছে। অপরিপক্ক কল্পনার বিকলাঙ্গ রূপায়ণ শেষে না মহতী বিনষ্টিকেই নিয়ে আসে! অনেক প্রদেশে হিন্দীর যূপকাষ্ঠে সংস্কৃতকে বলি দিতেও কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে না; অথচ কেন্দ্রভূমি দিল্লীতে মধ্যশিক্ষার সকল শাখাতেই—সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করা হয়েছে।

শিক্ষাব্যবস্থাই হচ্ছে জাতীয়তার সত্যিকারের ভিত্তি, দেশোন্নতির মৌলিক উপাদান। যে মানবগোষ্ঠী ভবিষ্যতে জাতীয় প্রগতির নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, তাদের শিক্ষাব্যবস্থা অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিযুক্ত হ'লে ভবিষ্যৎ জাতি দুর্বল হ'য়ে পড়বে। তাই, ভারতবর্ষে সমুন্নত, সুশিক্ষিত এবং শক্তিশালী জাতিগঠনে সর্বজনীন শিক্ষার পাঠক্রমে সংস্কৃতশিক্ষার অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। সমুন্নত চরিত্র, দেশকল্যাণে উদ্বুদ্ধ, জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত, আদর্শনিষ্ঠ নাগরিক সৃষ্টিতে রয়েছে সংস্কৃতশিক্ষার বিরাট ভূমিকা। চতুর্দিকে আজ তরুণসম্প্রদায়ের একাংশের যে সার্বিক অধঃপতন জাতির ভবিষ্যৎকে আশংকিত করে তুলেছে, তাকে রোধ করতে গেলে সংস্কৃতশিক্ষার প্রসার একান্ত প্রয়োজন। সংস্কৃতের অমৃতস্পর্শে তরুণচিত্তকে সঞ্জীবিত করে তোলা স্বাধীন ভারতের পবিত্র কর্তব্য। তাহলে একদিন ভারতীয় শিক্ষিতসমাজে সার্থক হয়ে উঠবে উপনিষদের ঋষি পিতামহের মহতী বাণী—

"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।"

মহাগ্রন্থ মহাভারত

মানবসভ্যতায় ভারতবর্ষের সুমহৎ অবদান মহাভারত নামক মহাগ্রন্থ। বিশাল ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতির বাঙ্ময় বিগ্রহ মহাভারত। মহর্ষি বেদব্যাসের আর্ষ প্রতিভার অনবদ্য এই সৃষ্টি মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন রূপে বিশ্বে আজও বন্দিত। কাহিনী আছে—এই গ্রন্থের মহত্ত্ব এবং গুরুত্ব পরিমাপের জন্য দেবতারা এক সময় সম্মিলিত হন। তুলাদণ্ডের একদিকে উপনিষদাদি সমেত চার বেদ এবং আর একদিকে এই গ্রন্থ স্থাপন করে দেখা গেল এরই ভার বেশী। তাই অপৌরুষেয় বেদের চেয়ে আর্য এই গ্রন্থ গুরুত্বের ও মহত্ত্বের জন্য মহাভারত নামে পরিচিত হ'ল।

মহত্ত্বে চ গুরুত্বে চ ধ্রিয়মানং যতোঽধিকম্।
মহত্ত্বাদ্ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে ॥

[মহা ভাঃ—আ—অনু—২৭৫]

ইউরোপের মহাকাব্য ইলিয়ড্ ও অডিসির একত্রিত আয়তনের আটগুণ বড় হচ্ছে মহাভারতের পরিসর। আরো এক বৈশিষ্ট্য এর আছে। অখিল জ্ঞানের উৎস বেদে সঙ্গত কারণেই সকলের অধিকার নেই। কিন্তু নিখিল জ্ঞানের আকর এই গ্রন্থের পাঠে ও শ্রবণে রয়েছে সকলেরই অধিকার। সর্বজনীন ও সার্বকালিক প্রাচীনতম গণসাহিত্য এই মহাভারত। বর্ত্তমানের গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় তাই এই গ্রন্থের গুরুত্ব সমধিক। কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থকে শাশ্বত ভারতের ইতিহাস রূপে চিহ্নিত করে বলেছেন—

"রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস—এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।" (প্রাচীন সাহিত্য)

ভারতকল্যাণে সমর্পিতচিত্তা বিদেশিনী বিদুষী ডক্টর এ্যানি বেসান্ট্ "The story of the great war" গ্রন্থের ভূমিকায় প্রতিটি ভারতীয়ের এই গ্রন্থপাঠের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে লিখেছেন—

"There is no nation which has greater books than the Indian : The Mahabharata is the greatest poem in the world. There is no other poem so splendid as this, so full of what we want to know, and what it is good for us to study. It is not good to grow up without knowing a little of this greatest poem in the world, written by and for your forefathers."

ভারতীয় জীবনাদর্শের মহত্তম মর্মবাণীই মহাভারতের উপদেশ। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রজীবনের বিপুল কর্ম সংঘাতের 'অন্তরালে ত্যাগ ও বৈরাগ্যে অবিচল স্থিতিই হল এই মহাগ্রন্থের বাঞ্ছিত পরিণতি। জীবনদেবতা তথা বিশ্ববিধাতার এই কর্মরহস্যের উপলব্ধিতেই মেলে পরমপ্রশান্তি। রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের মর্মলোকে তারই সন্ধান পেয়ে লিখেছেন—

"মহাভারতে যে একটা বিপুল কর্মান্দোলন দেখা যায় তাহার মধ্যে একটি বৃহৎবৈরাগ্য স্থির অনিমেষ ভাবে রহিয়াছে। মহাভারতে কর্মেই কর্মের চরম প্রাপ্তি নহে। তাহার সমস্ত শৌর্য-বীর্য রাগদ্বেষ হিংসা-প্রতিহিংসার প্রয়াস ও সিদ্ধির মাঝখানে শ্মশান হইতে মহাপ্রস্থানের ভৈরব সঙ্গীত বাজিয়া উঠিয়াছে……পরিপূর্ণ আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যায়, করায়ত্ত সিদ্ধি স্খলিত হইয়া পড়ে; সকলের পরিণামে পরিত্যাগ। অথচ এই ত্যাগে দুঃখে, নিষ্ফলতাতেই কর্মের মহত্ত্ব ও পৌরুষের প্রভাব রজতগিরির ন্যায় উজ্জ্বল অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে।" (প্রাচীন সাহিত্য)

কুরুপাণ্ডবের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের বিষণ্ন পরিণতি শান্তির ঔদাস্যের দিকে চিরন্তন মানুষের মনকে পরিচালিত করেছে। বেদব্যাসের মর্মকথা রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরীর" "পুরস্কার" কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে :—

"কুরুপাণ্ডব মুছে গেছে সব
সে রণরঙ্গ হয়েছে নীরব,
সে চিতাবহ্নি অতি ভৈরব
ভস্ম ও নাহি তার।
যে ভূমি লইয়া এত হানাহানি
সে আজি কাহার তাহাও না জানি,
কোথা ছিল রাজা কোথা রাজধানী
চিহ্ন নাহিকো তার।
তবু কোথা হতে আসিছে সে স্বর
যেন সে অমর সমর-সাগর
গ্রহণ করিছে নব কলেবর
একটি বিরাট গানে,
বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ
সকল আশার বিষাদ মহান্‌
উদাস শান্তি করিতেছে দান
চিরমানবের প্রাণে।"

সাহিত্যতাত্ত্বিক তথা আলঙ্কারিকরা তাই মহাভারতের রস বিচারে শান্ত রসের কথাই ঘোষণা করেছেন।

এই মহাগ্রন্থের গোত্র বিচারে পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে একে Epic বা Great

Epic বলা হয়েছে। ভারতীয় দৃষ্টিতে একে মুখ্যতঃ ইতিহাস, কখনো বা পুরাণ সংজ্ঞায় সূচিত করা হয়েছে। ইতিহাসের লক্ষণ হল—

"ধর্মার্থ-কামমোক্ষাণামুপদেশ-সমন্বিতম্
পূর্ববৃত্তং কথাযুক্তমিতিহাসঃ প্রচক্ষতে॥"

[বায়ু—৪—১১]

"পুরা অপি নবম্" পুরাণো হয়েও যা নূতন তাই হল পুরাণ। সৃষ্টি, প্রলয়ান্তে নূতন সৃষ্টির বিকাশ, দেবতা ও ঋষিকুলের বংশ বর্ণনা, মনুগণের শাসনকাল ও রাজন্যমণ্ডলীর বংশের ইতিহাস যেই গ্রন্থে বর্ণিত তাই হল "পুরাণ"। মৎস্যপুরাণের মতে আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে— যেমন ভুবনবিস্তর, দানকর্মবিধি, শ্রাদ্ধকল্প, বর্ণাশ্রম বিভাগ, ইষ্টাপূর্ত এবং দেবতা প্রতিষ্ঠা—

উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব বংশান্ মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব ভুবনস্য চ বিস্তরম্॥
দানধর্মবিধিং চৈব শ্রাদ্ধকল্পং চ শাশ্বতম্।
বর্ণাশ্রমবিভাগং চ তথেষ্টাপূর্ত-সংজ্ঞিতম্॥
দেবতানাং প্রতিষ্ঠাদি যচ্চান্যদ্ বিদ্যতে ভুবি।
তৎ সর্বং বিস্তরেণ ত্বং ধর্মং ব্যাখ্যাতুমর্হসি

[মৎস্য—২—২২২—২২৪]

মহাভারতে 'ইতিহাস' এবং 'পুরাণ' এই উভয়ের লক্ষণই প্রযুক্ত হতে পারে। তাই মহর্ষি বেদব্যাস স্বয়ং এই মহাগ্রন্থকে কখনো ইতিহাস আবার কখনো পুরাণ বলেছেন।

"তপসা ব্রহ্মচর্যেণ ব্যস্য বেদং সনাতনম্।
ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ॥
ইতিহাসপুরাণানামুন্মেষং নির্মিতং চ যৎ।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যং চ ত্রিবিধং কালসংজ্ঞিতম্॥

[মঃ ভাঃ আ—১—৫৪, ৬৩]

ঐহিক অভ্যুদয় এবং পারলৌকিক মুক্তি—দুইকেই সমভাবে ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছে। জাগতিক উন্নতির জন্য ধর্ম, অর্থ, কাম এবং পারলৌকিক শান্তির জন্যে মোক্ষ এই চতুর্বর্গের সামঞ্জস্য স্থাপন করে পূর্ণ জীবনের সাধনা করেছে প্রাচীন ভারত, তারই পথনির্দেশ করেছে মহাভারত। সূর্য যেমন অন্ধকার বিনাশ করে, তেমনি মহাভারতও মানবমনের অজ্ঞানরূপ তমোরাশি করে বিদূরিত।

পুরাণরূপ এই মহাভারত পূর্ণচন্দ্ররূপে জ্যোৎস্নাকে প্রকাশিত করছে, আর মনুষ্যবুদ্ধিরূপ শ্বেতপদ্মকে করছে বিকশিত।—

ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষার্থৈঃ সমাস-ব্যাস-কীর্তনৈঃ।
তথা ভারতসূর্যেণ নৃণাং বিনিহতং তমঃ॥
পুরাণপূর্ণচন্দ্রেণ শ্রুতিজ্যোৎস্নাঃ প্রকাশিতাঃ।
নৃবুদ্ধি কৌরবাণাং চ কৃতমেতৎ প্রকাশনম্॥

[মঃ ভাঃ—আ –১—৮৫, ৮৬]

এইটি আবার ইতিহাসও। প্রদীপ তমোরাশি বিদূরিত করে গৃহের অভ্যন্তরকে করে উদ্‌ভাসিত। মহাভারত নামক এই ইতিহাস প্রদীপেরই মতো মোহের অন্ধকার ঘুচিয়ে মানুষের মনোলোককে জ্ঞানের আলোয় করে প্রোদ্‌ভাসিত।

ইতিহাসপ্রদীপেন মোহাবরণঘাতিনা।
লোকগর্ভগৃহং কৃৎস্নং যথাবৎ সম্প্রকাশিতম্॥

এই পরম জ্ঞানের পরিবেশন পদ্ধতিটি কিন্তু কাব্যের। সেই জন্য ঋষি নিজেই ব্রহ্মাকে বলেছেন—

উবাচ স মহাতেজা ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্।
কৃতং ময়েদং ভগবন্ কাব্যং পরমপূজিতম্॥

ব্রহ্মাও বলেছেন—আজন্ম তোমার বাণীকে সত্য বলেই জানি। তাই তোমার কথানুসারে এই গ্রন্থও কাব্যরূপে খ্যাত হবে। গৃহস্থাশ্রমকে যেমন, অন্য তিনটি আশ্রম অতিক্রম করতে পারে না তেমনি তোমার মহাভারত কাব্যকে আর কোনো কাব্য বিপুলতা এবং উৎকর্ষে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না।

জন্ম প্রভৃতি সত্যাং তে বেদ্মি গাং ব্রহ্মবাদিনীম্।
ত্বয়া চ কাব্যমিত্যুক্তম্ তস্মাৎ কাব্যং ভবিষ্যতি॥
অস্য কাব্যস্য কবয়ো ন সমর্থা বিশেষণে।
বিশেষণে গৃহস্থস্য শেষাস্ত্রয় ইবাশ্রমাঃ॥

[মঃ ভাঃ আ ১ অ-৭২, ৭৩]

Mathew Arnold-এর মতে **epic** তথা মহাকাব্যের লক্ষণ হল—

"The main story must relate to high personages and its language and metre should be simple and dignified It should contain vigorous dialogues. It should have interludes in the form of episodes. It must have a high and noble purpose."

এই লক্ষণ অনুসারে মহাভারতকে বলা চলে শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। প্রাচীন এবং প্রখ্যাত ভরত বংশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এখানে মূল ঘটনা আবর্তিত। মুখ্যতঃ অনুষ্টুভ্ এবং ত্রিষ্টুভাদি সহজ ছন্দেরই প্রয়োগ হয়েছে এই মহাকাব্যে। ভাষা সরল, মধুর ও গম্ভীর। বহু পার্শ্বকাহিনীও এতে গ্রথিত হয়েছে। শাশ্বত ধর্মের জয় ঘোষণাই এর প্রেরণা। তাই বলা হচ্ছে,—

এই জন্যই তো এটি পঞ্চমবেদ। একই আধারে কাব্য, পুরাণ ও ইতিহাস

হল এই মহাগ্রন্থ—সাংস্কৃতিক সাধনার পথে ত্রিবেণীসঙ্গম। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রখ্যাত প্রতীচ্য ঐতিহাসিক Dr Win ernitz এর মতে তাই—

"It is only in a very restricted sen-e that we may speak of the Mahabharata as an 'epic' and a 'poem." Indeed, in a certain sense the Mahabharata is not one poetic production of all, but rather a whole literature.

[Histoy of Indian literature P—316]

এই মহাগ্রন্থের সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে ব্রহ্মা করেছেন ভবিষ্যদ্‌বাণী। তিনি বলেছেন—পরবর্তী কবিকুলের বিষয়বস্তু এবং ভাবের অবলম্বন হবে এই মহাগ্রন্থ। মেঘ যেমন জলবর্ষণের দ্বারা শস্যোৎপাদনের মাধ্যমে, জীবজগতের অবলম্বন, তেমনি এই অক্ষয় ভারতবৃক্ষ পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কবিদের হবে পরমাশ্রয়।

"সর্বেষাং কবিমুখ্যানামুপজীব্যো ভবিষ্যতি।
পর্জন্য ইব ভূতানামক্ষয়ো ভারতদ্রুমঃ॥"

[ঐ—১২]

তাই দেখি, শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় মহাভারতীয় কাহিনীকে অবলম্বন করে সুদূর অতীতকাল হ'তে আজ পর্যন্ত কত কাব্য-নাটক-গল্প-সঙ্গীত-উপন্যাসের সৃষ্টিধারা অব্যাহতভাবে প্রবাহিত।

যখন দ্রুতগামী যানবাহন এবং মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হয় নি, তখনই দেখি, সুদূর গ্রীক, মঙ্গোলিয়া হ'তে কাম্বোডিয়া পর্যন্ত এই মহাগ্রন্থের প্রসার। ঐতিহাসিক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বলেছেন,—

"It is the biggest of the worlo's epics......The heroes of this great poem find prominent mention in the works of grammarians, theologians, political thinkers, poets and dramatists, almost uninterruptedly, from about the fifth century B. C. Precepts called from it are quoted by a gre t envoy as early as the second century B. C. while the powers of its principal heroes is mentioned with admiration by royal personages in the Deccan already in the second century A.D. The whole poem is known to have been recited in temples in far off Cambodia as early as the six h century A. D. In the next century, we find the Turks of Mongolia reading in their own idiom thrilling episodes like the Hidimbavadha. The work (Mahabharata) was translated into their own vernacular by the people of Java before the end of the eleventh century A. D. [The Cultural Heritage of India-Vol III P—71]

কাশীরামদাসের মহাভারত হ'তে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদাদি হয়ে সুবোধ ঘোষের 'ভারত প্রেমকথা', বুদ্ধদেব বসুর রচনা পর্যন্ত এই বাংলা ভাষাতেই এই মহাগ্রন্থের বিচিত্র উন্মেষ সন্ধান করলে বিস্মিত হ'তে হয়।

এই পুণ্যময় ইতিহাসে ধর্ম ও অর্থ নিঃশেষে উপদিষ্ট হয়েছে। এর শ্রবণে বুদ্ধি হয় পরিশীলিত।

যাহা নাই ভারতে (মহাভারতে)
তাহা নাই ভারতে (ভারতদেশে)

এই প্রবাদ এই গ্রন্থে যথার্থই প্রমূর্ত।

অস্মিন্নর্থশ্চ ধর্মশ্চ নিখিলে চোপদিশ্যতে।
ইতিহাসে মহাপুণ্যে বুদ্ধিশ্চ পরিনৈষ্ঠিকী॥
ধর্মশাস্ত্রমিদং পুণ্যমর্থশাস্ত্রমিদং পরম্।
মোক্ষশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা ॥ ২০ ॥
ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ ॥ ২৪ ॥

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্"—এর সাধক ভারতীয় ঋষি ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তমের বর্ণনায় ছিলেন সমভাবে কুশলী। তাই, এই সুবিশাল মহাগ্রন্থের লক্ষ শ্লোকাত্মক কাহিনীকে মহর্ষি দুটিমাত্র শ্লোকে আবার সূত্রাকারে উপনিবদ্ধ করেছেন। দুর্যোধন একটি ক্রোধময় দুর্ধর্ষ বৃক্ষ। এই বৃক্ষের স্কন্ধ হলেন কর্ণ, শাখা শকুনি, বিকশিত পুষ্প ও পরিণত ফল হ'ল দুঃশাসন এবং অবিবেকী রাজা ধৃতরাষ্ট্র হলেন মূল।

পক্ষান্তরে, যুধিষ্ঠির ছিলেন একটি ধর্মময় উৎকৃষ্ট বৃক্ষ। অর্জুন হলেন এই বৃক্ষের স্কন্ধ, ভীম হলেন শাখা, বিকশিত ফুল ও পরিণত ফল হলেন নকুল ও সহদেব এবং শ্রীকৃষ্ণ, বেদ ও ব্রাহ্মণেরা ছিলেন এই বৃক্ষের মূল।

দুর্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখাঃ।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী ॥
যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধোঽর্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখাঃ।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ ॥

[মহাভারত—আ—১-১-১১০, ১১১]

মনীষী দার্শনিক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সামগ্রিক ভারতীয় জীবনচর্যার দর্পণ রূপে এই মহাগ্রন্থকে চিহ্নিত করেছেন।

"It is a criticism of life, manners and customs and of

changing ideals. It is free definite and decisive. The entire life of ancient India is reflected in it as in a mirror."

[A History of Sans. Literature—I]

প্রগতিবাদী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের মতে এই মহাভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থাই হ'ল আদর্শ, যা আজো অনুসরণের যোগ্য। অনবদ্যভাষায় বিশ্লেষণ ক'রে তিনি বলেছেন,

"The internal conflicts between righteousness and filian affection in the mind of the god-fearing, yet feeble old blind king Dhritarashtra ; the majestic character of the grandsire Bhishma ; the noble and virtuous nature of the royal Yudhisthira and of other four brothers as mighty in valour as in devotion and loyalty ; the peerless character of Krishna, unsurpassed in human wisdom ; and not less brilliant, the character of the women—the stately queen Gandhari, the loving mother Kunti, the ever devoted and all suffering Draupadi—these and hundreds of other characters of this epic have been the cherished heritage of the whole Hindu world for the last several thousands of years and from the basis of their thoughts and of their moral and ethical ideas. In fact, the Ramayana and the Mahabharata are the two encyclopaedias of the ancient Aryan life and wisdom, portraying an ideal civilisation which humanity has yet to aspire after."

[Swami Vivekananda—The complete works Vol—IV, P-100]

এহেন মহাগ্রন্থের সম্প্রচার লোকহিতার্থে একান্ত অপেক্ষিত। নানা ঐতিহাসিক কারণে এবং দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক পরাধীনতার জন্যে ভারতীয় সংস্কৃতির ধাত্রী মহাভারতের ভাষা সংস্কৃতের সঙ্গে বঙ্গভাষী জনগণের সংযোগ শিথিল হয়ে পড়েছে। অথচ এই মহাগ্রন্থের প্রয়োজন ও জনপ্রিয়তা অপরিসীম। সেইজন্য পুণ্যশ্লোক কাশীরামদাস স্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদ এবং ঈষৎ পরিবর্তন ও সংযোজনের মাধ্যমে বহু পূর্বে এই গ্রন্থের প্রচারে প্রবৃত্ত হন। তারপর ১৭৮০ শকাব্দে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রথমে সাতজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্যে ,আক্ষরিক অনুবাদে অগ্রসর হন এবং ১৭৮১ শকাব্দে প্রথম খণ্ডের প্রকাশ করেন। পরে আরও কয়েকজনে বিদগ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে অনুবাদকমণ্ডলীতে গ্রহণ করেন। গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে কেউ কেউ পরলোক

গমন করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ ভূমিকা এবং উপসংহারে কয়েকজনের নাম প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেন কিন্তু সকলের নাম ও পরিচয় সুষ্ঠুভাবে প্রদান করেননি। সেই অনুল্লিখিত পণ্ডিতমণ্ডলীকেও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন। মহাত্মা সিংহের নেতৃত্বে এই অনুবাদ বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। যার ফলে আজ ১৯০৮ শকাব্দে ১২৭ বৎসর পরেও এই গ্রন্থের আবেদন বাঙালীর সংস্কৃতিনিষ্ঠ মনের কাছে অবসিত হয়ে যায়নি। বরং, পৌরাণিক তথা ক্ল্যাসিক্যাল গ্রন্থের পরিচয় লাভের জন্য আগ্রহ কৃষ্টি-ঋদ্ধ, পরিশীলিত-রুচির আজকের বাঙালীর এক শুভ লক্ষণ। বঙ্গভাষীর মানস-ভোজ্য পরিবেশনে মহাভারতের পরমান্ন অতিশয় প্রীতিপ্রদ। গৃহে গৃহে মহাভারত পাঠের মাধ্যমে আরম্ভ হোক অভিনব সারস্বত যজ্ঞ। সেই মহাযজ্ঞের প্রথমেই নারায়ণ (বিষ্ণু), নর (ব্রহ্মা), নরোত্তম (প্রজাপতি) দেবী (দুর্গা) এবং সরস্বতীকে প্রণাম জানিয়ে 'জয়' নামে পরিচিত মহাভারত পাঠে আমরা যেন প্রবৃত্ত হই।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

স্মরণ করি এই মহাভারতোক্ত হরিবংশেরই 'মহাভারত মহিমা'—

"ভারতং শৃণুয়ান্নিত্যং ভারতং পরিকীর্তয়েৎ।
ভারতং ভবনে যস্য তস্য হস্তগতো জয়ঃ ॥
ভারতং পরমং পুণ্যং ভারতে বিবিধাঃ কথাঃ।
ভারতং সেব্যতে দেবৈর্ভারতং পরমং পদম্ ॥
ভারতং সর্বশাস্ত্রাণামুত্তমম্ ভরতর্ষভ।
ভারতাৎ প্রাপ্যতে মোক্ষস্তত্ত্বমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥
মহাভারতমাখ্যানং ক্ষিতিং গাঞ্চ সংস্বতীম্।
ব্রাহ্মণান্ কেশবঞ্চৈব কীর্তয়ন্ নাবসীদতি ॥
বেদে রামায়ণে পুণ্যে ভারতে ভরতর্ষভ।
আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে ॥
যত্র বিষ্ণুকথা দিব্যাঃ শ্রুতয়শ্চ সনাতনাঃ।
তচ্ছ্রোতব্যং মনুষ্যেণ পরং পদমিহেচ্ছতা ॥
এতৎ পবিত্রং পরমমেতদ্ ধর্মনিদর্শনম্।
এতৎ সর্বগুণোপেতং শ্রোতব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥"

পাঠের ফলশ্রুতিতে আমাদের প্রার্থনা হোক্—

ধর্মো বিজয়তাং নিত্যং
সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ
মহাভারত— পাঠেন
সজ্জনাঃ সন্তু নির্ভয়াঃ ॥

রাষ্ট্র সাধনায় গীতা

শাশ্বত ভারতীয় প্রজ্ঞার অতুলনীয় নির্যাস শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। সর্বজনীন এবং সার্বকালিক গ্রন্থরূপে গীতা হল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণসাহিত্য। পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, যুবক বৃদ্ধ, শ্রমিক সৈনিক, যোগী ভোগী, সকলেই গীতা থেকে আহরণ করেন তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবনের পরম পাথেয়। কিশোর বালক হতে মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই গীতায় পেতে পারেন শান্তির সন্ধান। ইহলোকে জীবনে চলার পথে গতি এবং পরলোকে মুক্তির সন্ধান গীতা হতেই সুষ্ঠুভাবে মেলে। মানব সভ্যতায় ভারতের শ্রেষ্ঠ দান এই সদ্‌গ্রন্থ। দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক পরাধীনতায় ভারত যখন দুর্দশাগ্রস্ত, শাসন, শোষণ নিপীড়নে নির্যাতিত, তখনো বিশ্বের দেশে দেশে গীতার বিজয় যাত্রা অব্যাহত। বিখ্যাত ইংরাজ মনীষী কার্লাইল প্রখ্যাত মার্কিন মনীষী এমার্সনের সঙ্গে সৌহৃদ্য দৃঢ় করার জন্য সেই সুদূর অতীতে উপহার দিচ্ছেন একটি ভগবদ্‌-গীতা গ্রন্থ। জার্মান, ফরাসী, ইংরাজী, রুশ, আরবী, পার্সি, চৈনিক, জাপানী প্রভৃতি পৃথিবীর সকল প্রচলিত ভাষায় সরকারী এবং সংস্থাগত আনুকূল্য ব্যতীতই এই পর্যন্ত গীতার প্রায় তিন সহস্র সংস্করণ হয়েছে। ১৭৮৫-তে লণ্ডনে গীতার প্রথম ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এখনো দেশে গীতার নিত্যনূতন ভাষ্য প্রকাশিত হচ্ছে। তার কারণ হল—নির্জন গুহাবাসী নিষ্কিঞ্চন তপস্বী হতে রাজপ্রাসাদবাসী ধনী, সর্বকর্মত্যাগী সাধু হতে সদা-কর্মচঞ্চল রাজনৈতিক নেতা পর্যন্ত সকলেই স্বকীয় জীবনের পাথেয় গীতা হতে পেয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাগ্রজ মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে গীতা হল ভারতের কুটীরে বিনা তৈলে দীর্ঘকালের অনির্বাণ প্রদীপ। মহাত্মা গান্ধীর মতে গীতা হচ্ছে শক্তি ও শান্তিপ্রদায়িনী মাতা। অধ্যাত্ম জগতে গীতার অবিসংবাদী স্থান সম্বন্ধে সকলেই প্রায় অবহিত। বাইবেল, কোরাণ, ত্রিপিটক, গ্রন্থসাহেব প্রভৃতি ধর্ম গ্রন্থও বহুমানুষকে অধ্যাত্ম জীবনে অনুপ্রাণিত করে। গীতা কিন্তু এই শ্রেণীরই একটি মহান ধর্মগ্রন্থ মাত্রই নয়, বিশ্বের রাষ্ট্র সাধনায় গীতার অনন্যসাধারণ স্থান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। পূর্বোক্ত অন্য গ্রন্থসমূহ কোথাও জাতীয় রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামে গীতার মতো ব্যবহৃত হয়নি—এইটি ঐতিহাসিক সত্য। ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তি সংগ্রামে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মৈত্রী সাধনায় গীতার প্রয়োগ একটা বাস্তব সত্য।

বস্তুতঃ, রাজনৈতিক যুদ্ধে রাষ্ট্রসাধনার রণাঙ্গনেই তো গীতার আবির্ভাব। সুদূর অতীতে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে যুদ্ধের প্রাঙ্‌মুহূর্তে বিষণ্ণ সেনাপতি অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে ভগবান পার্থসারথির কণ্ঠে গীতামৃতের

আবির্ভাব। সেই অমৃত পান করে মোহাচ্ছন্ন অবসন্ন সেনাপতি অর্জুন হলেন সঞ্জীবিত। অবশেষে স্বীকৃতি এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা। ত্বৎ প্রসাদান্ ময়াচ্যুত।"
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।।"
"তোমারি কৃপায় আমার মোহ অপগত হয়েছে।
চৈতন্য লাভ করেছি, স্থিত হয়েছি, সন্দেহ দূরে হয়েছে।
তোমার আদেশই এখন পালন করব।"

বেঞ্জামিন ডিজ্‌রেলী বলেছিলেন—

"The youths of a nation are the trustees of posterity".—ভারতের তরুণ বিপ্লবীদের জীবন তারই নিদর্শন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মুক্তিপাগল সেনানীরা সকলেই সেদিন গীতার বাণীতে ছিলেন উদ্বুদ্ধ। "বন্দে মাতরম্"-মন্ত্র, শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা গ্রন্থ, স্বামী বিবেকানন্দের বীরবাণী এবং পরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীত ও ব্রহ্মসঙ্গীত সংগ্রামীদের মধ্যে ত্যাগ-বৈরাগ্য, উৎসাহ ও বীর্যের সঞ্চার করেছিল। গীতার প্রভাব ছিল সর্বাধিক। আর কোনো ধর্মগ্রন্থকে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা এইভাবে অনুপ্রাণিত হন্‌নি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুটি বিশিষ্ট ধারা—অহিংস সশস্ত্র বিপ্লব এবং অহিংস সত্যাগ্রহ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পথের, চিন্তার এবং কখনো কখনো লক্ষ্যেরও পার্থক্য উভয় পথের পথিকদের মধ্যে থাকলেও প্রেরণার উৎস ছিল কিন্তু একটিই। সেটি হ'ল ভগবদ্‌গীতা। গীতার সর্বজনীনতার এও একটি প্রমাণ।

ভারতের প্রতিটি বিপ্লবীর গীতা ছিল অবশ্যপাঠ্যগ্রন্থ। প্রসিদ্ধ বিপ্লবী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের ভাষায় গীতা হচ্ছে বিপ্লবীর হাতে একটি জ্বলন্ত তরবারি। তিনি লিখেছেন—

"বর্ণমালা না প'ড়ে যেমন ভাষার মন্দিরে প্রবেশ করা যায় না, গীতা না পড়েও তেমনি বিপ্লবীর রাজ্যে সেযুগে প্রবেশ করা যেত না। বিপ্লব দলে তখন বালক বয়সে বা প্রথম কৈশোরেই বিপ্লবীদের প্রথম প্রবেশ ঘটত। প্রায় চার পাঁচ বৎসরের শিক্ষালাভের পর বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিতে ঢুকতে হত গীতা স্পর্শ করে শপথ নিয়ে। গীতা ছিল জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী। বালক বিপ্লবীর কাছে যে গীতা ছিল একটি অবশ্যপঠনীয় পুস্তকমাত্র, সেই গীতাই তরুণ বিপ্লবীর হাতে হয়ে উঠ্‌তো একটি জ্বলন্ত তরবারি। অর্জুনের গাণ্ডীব হয়ে গীতা বিপ্লবীর কাছে আসতো। দুর্গম পথের যাত্রায় শক্তি দিত গীতার বাণী—বিশেষ করে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রত্যেকটি সূত্র, প্রত্যেকটি অক্ষর।" (রাখাল বেণু—১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা)

১৮৯৮ সালের ঘটনা। কিশোর বিপ্লবী বালক দামোদর চাপেকারের ফাঁসির আদেশ হ'ল আদালতে। বালক হেসে বলে—"এইটুকুই? আর কিছু না?"

পুণায় যারবেদা জেলে বালক হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করলো। হাতে আছে একটি ভগবদ্‌গীতা। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক বন্দী বালককে আশীর্বাদস্বরূপ এই গীতাটি পাঠিয়েছিলেন। জেলে এই গীতাই ছিল তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। ফাঁসির রজ্জুর টানে বন্দীর নিষ্প্রাণ দেহ ঝুলে পড়লো। কিন্তু ঐ গীতাটি তাঁর হস্ত হতে স্খলিত হয়নি। মহারাষ্ট্রের তিনটি ব্রাহ্মণ বালক দামোদর বালকৃষ্ণ, এবং বাসুদেব চাপেকার গীতার বাণীকেই অবলম্বন ক'রে পর পর কৈশোরেই মৃত্যুকে বরণ করে নিল। আবার এই তিনজনই ছিল সহোদর ভ্রাতা।

শ্রদ্ধেয় ভূপেনবাবু লিখছেন—

"বিপ্লবের কর্মীকে এক একটি অর্জুন হতে হবে—কুরুক্ষেত্রের অর্জুন। গীতার বাণী মর্ম দিয়ে উপলব্ধি না করতে পারলে সেই অর্জুন বা সব্যসাচী হওয়া যায় না। বিপ্লবের কর্মী শুনলেন—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্‌ যুধ্যস্ব ভারত॥"

অর্থাৎ—"প্রিয়বস্তুর 'প্রাপ্তিতে' হর্ষ অথবা 'অভাবে' বিষাদ, এই দুটি বস্তুই ত্যাগ করতে হবে। অসদ্‌ বস্তুর স্থায়িত্ব নেই। সদ্‌ বস্তুর বিনাশ নেই। যাঁরা তত্ত্বদর্শী, তাঁরা সদসৎ উভয় বস্তুরই স্বরূপ উপলব্ধি করেন।"

অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্‌ যুধ্যস্ব ভারত॥

পার্থকে বলছেন পার্থসারথি—'আত্মা যে দেহে বাস করেন সেই দেহ নশ্বর। কিন্তু আত্মা অবিনাশী ও নিত্য এবং স্বপ্রকাশিত। অতএব হে অর্জুন যুদ্ধ কর।'

গীতার 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌' বাক্যটি বিপ্লবীদের একটি প্রতিজ্ঞা হয়ে গিয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ তাই গীতা গ্রন্থকে গ্রহণ করেছিলেন মর্ম গ্রন্থরূপে, জীবনবাণী রূপে। গীতা ছিল বিপ্লবীদের কাছে রণসাজে সজ্জিত হওয়ার বিশিষ্ট আভরণ।"

লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক ছিলেন কংগ্রেসের চরমপন্থী অংশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা। মান্দালয় জেলে বসে সম্পূর্ণ স্মৃতি থেকে ২৬টি পূর্ব পূর্ব গীতাভাষ্যকে খণ্ডন করে তিনি রচনা করলেন গীতার এক অভিনব ভাষ্য—"কর্মযোগ রহস্য"। ৮০০ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ বিশ্বের বিস্ময়। সম্পূর্ণ গীতা এবং তার প্রচলিত ভাষ্যাবলী এই মহান্‌ রাজনৈতিক নেতা কি ভাবে অধিগত ক'রেছিলেন ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। বিপ্লবী যোগী শ্রীঅরবিন্দেরও মর্মগ্রন্থ ছিল এই ভগবদ্‌গীতা। তিনি ক'রেছেন তার যৌগিক ব্যাখ্যা। নেতাজী সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেলে বাসকালে তাঁর দাদাকে লিখ্‌ছেন মান্দালয় জেল-বাস তাঁর তীর্থবাস। কারণ তিলক মহারাজ এখানে

বসে গীতার ভাষ্য রচনা করেছিলেন। চন্দননগরের মহাবিপ্লবী মতিলাল রায় তরুণদের নিয়ে প্রবর্তক সংঘের প্রতিষ্ঠা করে গীতাপাঠে অনুগামীদের উদ্বুদ্ধ করেন, নিজে রচনা করেন গীতার আর একটি ভাষ্য। বিপ্লবী কানাইলাল প্রমুখ তরুণেরা গীতাকে পকেটে নিয়ে অস্ত্র সাধনায় এগিয়ে যেতেন। বিপ্লবী বাঘা যতীন তথা যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় "কিশোর বয়স থেকে গীতা কণ্ঠস্থ ক'রেছেন, আর গীতা থেকে পেয়েছেন জ্ঞান-ভক্তি আর কর্মের সমন্বয়ে সত্যসন্ধানের স্পৃহা।" (দেশ-১লা ডিসেম্বর, ১৯৭২, পৃঃ-৪৯)

বালেশ্বরে অজ্ঞাত বাসকালের স্মৃতিতে সঙ্গী আর এক বিপ্লবী নলিনী-কান্ত সরকার লিখেছেন—"গীতাই ছিল তাঁর (বাঘা যতীনের) জীবনাদর্শ"। মহল ডিহার শালবনের বিজনে প্রকৃতি দেবীর বিছানো শিলাসনে উপবিষ্ট হ'য়ে উদাত্ত কণ্ঠে তিনি যখন গীতা পাঠ করতেন, তখন তাঁর ধ্যানগম্ভীর মুখমণ্ডল হ'তে এক অপূর্ব জ্যোতির্ময় আভা বিকীর্ণ হ'তে থাক্‌ত।"

বিনয়-বাদল-দীনেশ গীতার আদর্শেই জীবন সমর্পণ ক'রেছিলেন। ২৪ বৎসরের তরুণ দীনেশের মৃত্যুর প্রতীক্ষায় কারাগারে কাটাবার চিত্র হ'ল—"দীনেশ নিশ্চিন্ত নির্বিকার। জেলের নির্জন কক্ষে অধিকাংশ সময় তাঁর কাট্‌তে লাগ্‌লো গীতা আর রবীন্দ্র কাব্য নিয়ে।" (আমি সুভাষ বল্‌ছি—পৃঃ—২৫৫) আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হ'তে দীনেশ গুপ্ত মাতৃসমা বৌদিকে পত্র লিখ্‌ছেন—৩০/৩/৩১ এ, যাতে গীতার আত্মতত্ত্ব এবং আত্মসমর্পণ যোগের কথাই শুধু উল্লিখিত হ'চ্ছে।—

"মরণকে আমাদের ভয় না করিয়া নির্ভয় প্রশান্ত চিত্তে বরণ করিয়া লইতে হইবে। আমরা জানি, মরণ আমাদের হয় না, হয় এই নশ্বর দেহের। আত্মা অবিনশ্বর, সেই আত্মাই আমি—আর সেই আত্মাই ভগবান। মানুষের যখন সেই উপলব্ধি হয়, তখনই সে বলিতে পারে "আমিই সে।' আগুন আমাকে পোড়াতে পারে না, বায়ু আমাকে শুষ্ক করিতে পারে না, আমি অজর, অমর, অব্যয়। গীতা বলিয়াছেন—'শস্ত্রসকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দহন করিতে পারে না, জল ভিজাইতে পারে না, বায়ুতে শুষ্ক করিতে পারে না। আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বব্যাপী।" তিনি আরো লিখ্‌ছেন—"...মন শান্ত করিবার একমাত্র উপায় ভগবানে আত্মসমর্পণ, ফাঁসির পূর্বে স্নানান্তে তাঁর অত্যাশ্চর্য নির্ভীকতায় বিস্মিত সার্জেণ্ট্‌কে দীনেশ

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবাণি গৃহ্নাতি নরো'হপরাণি,
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যাণি সংযাতি নবানি দেহী"

ব'লে মৃত্যুর রহস্য বুঝিয়ে দিলেন। বিনয় বসু এবং বাদল গুপ্তও গীতা পাঠ কর্‌তেন নিয়মিত ভাবে এবং গীতার আদর্শেই জীবন পরিচালনা

ক'রেছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই ফলাসক্তি বর্জন ক'রে, সিদ্ধি ও বিফলতা তুল্য জ্ঞান করে কর্মে নিযুক্ত হ'য়েছিলেন। আত্মার অবিনশ্বর অস্তিত্বে বিশ্বাসী হ'য়ে নিষ্কাম আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ভগবানের সাক্ষাৎলাভে প্রত্যয়নিষ্ঠ গীতাধ্যায়ী দীনেশ মাতাকে কারাগার হ'তে পত্র লিখ্ছেন—"তিনি (ভগবান) যাকে বরণ করেন, মরণ মালা তারই গলায় পরিয়ে দেন। সে মালা কি সহজ? —যে খবর না দিয়া আসিত, সে খবর দিয়া আসিল বলিয়াই কি আমরা তাহাকে পরম শত্রু মনে করিব? ভুল ভুল।"

মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস হত্যা মামলার আসামী কিশোর বালক প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ১৯৩২ এর ২২শে নবেম্বর কারাগর হ'তে তাঁর বৌদিকে সান্ত্বনা দিয়ে লিখেছেন—

"পুনর্জন্মে মৃত্যুর পর অন্য দেহ পরিগ্রহে বিশ্বাস তো আছে; এবং শ্রীগীতাতে আছে শ্রীকৃষ্ণের—'নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।" কারাগারে তাঁর সময় কাটছে—"শুধু পড়া আর পড়া। গীতা আর রবীন্দ্রনাথ" (আমি সুভাষ বল্ছি—৩২১) "ফাঁসির পূর্বে প্রদ্যোৎ ভোর বেলা স্নান করে। স্নান করিবার পর সে গীতা পাঠ করিতেছিল। এমন সময় মঞ্চের দিকে যাইবার জন্য তাহাকে ডাকা হয়।" ১৯৩৩-এর ১২ই জানুয়ারী। ভোর পাঁচটা! ডাকতে গিয়ে রক্ষীদল অবাক। আশ্চর্য, স্নান-পুজো সম্পন্ন ক'রে কপালে চন্দন তিলক এঁকে এর মধ্যেই প্রদ্যোৎ প্রস্তুত। মুখে তার প্রশান্ত হাসি। ঠিক যেন প্রাচীন ভারতের কোন ঋষিপুত্র এইমাত্র যজ্ঞশেষ ক'রে উঠে গেছেন। (ঐ-পৃঃ-৩২০)

১৯৩৪-এর ২রা অক্টোবর বার্জ নিধনে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত বালক রামকৃষ্ণ রায় মাতাকে লিখছেন—"আপনার কোল হতে চিরবিদায় নিয়ে চললাম। গীতাটি দিয়ে গেলাম।" ঐ মামলারই অপর শহীদ ব্রজকিশোর চক্রবর্তী কারাকক্ষ হতে ১৯৩৪ এর ২রা অক্টোবর পিতাকে লিখছেন—"গীতা পুস্তকটি আপনার করকমলে দিয়ে গেলাম। বিপ্লবী মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী "গীতায় স্বরাজ" বলে গ্রন্থ লিখে নিজের বিপ্লবী জীবনের উৎস বলে গীতাকে চিহ্নিত করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদা সূর্য সেন ১১ই জানুয়ারী, ১৯৩৪-এ সন্ধ্যা ৭টায় ইহ জীবনের শেষ পত্র লিখছেন—

"Ideal and unity is my fare-well message. Rope is hanging over my head. Death is knocking at my door. Mind is soaring towards Eternity. This is the time for Sadhana. This is the time for preparation to embrace death as a friend and this is time to recall lights of other days.... God bless you."

তাঁর সহকর্মী কালীকিঙ্কর দে লিখছেন—"মাষ্টারদা, তারকেশ্বরদা দুজনই সকলকে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন—'আমরা জীবনের শেষ উপাসনা করতে

যাচ্ছি।' এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সারা জেল নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সবাই শুনলেন মাষ্টারদা গীতা পাঠ করছেন। তারপরে তারকেশ্বরদা গাইলেন একটি গান— জীবনে যত পূজো হল না সারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হারা……।''. কিছুক্ষণ পরেই মাষ্টারদা চিৎকার করে বললেন আমাদের ফাঁসির মঞ্চে নিতে এসেছে এই বলেই তাঁরা বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু "বন্দে" বলার পর "মাতরম্" আর কেউ বলতে পারলেন না। জোর করে কেউ তাঁদের টুঁটি টিপে মারতে চেষ্টা করছে, এমন শব্দ কয়েক বার শুনলাম।" (বসুমতী—২৮শে পৌষ, ১৩৮৭ বাং)

বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় লিখছেন—

"কানাই-ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকী-সত্যেন বসু-নলিনী বাগচী-প্রীতিলতা-ধিংড়া-আসফাকউল্লা-বসন্ত বিশ্বাস-বিনয়-বাদল দীনেশ-ব্রজকিশোর-অনাথ-পাঁজা প্রদ্যোৎ-মৃগেন-যতীন দাস-মতি মল্লিক-ভবানী-উধম সিং-রামকৃষ্ণ-নির্মল সেন দীনেশ মজুমদার-ভগৎসিং প্রমুখ অসংখ্য শহীদের সেই যুগে প্রেরণার উৎস হল গীতা।"

বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বাল্যকাল হতেই গভীর ভাবনায় ছিলেন উদ্বুদ্ধ। কংগ্রেস নেতা হিসেবে যখন তিনি সুদূর মান্দালয় জেলের বিসদৃশ পরিবেশে আবদ্ধ, তখন সেই কারাবাস তাঁর কাছে তীর্থসাধনায় উন্নীত। কারণ, ঐখানেই লোকমান্য তিলক গীতার ভাষ্য রচনা করেছিলেন। এই বিষয়ে সুভাষচন্দ্র ২০.৮/২-৫এ ঐ কারাগার হতে শ্রীযুক্ত এন্-সি-কেলকারকে পত্রে লিখছেন—

"…এখানে আসবার পূর্ব মুহূর্তে পর্যন্তও আমি ভাবতে পারিনি যে, এই জেলের চার-দেওয়ালের মধ্যেই নানা প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও স্বর্গত লোকমান্য তাঁর বিখ্যাত গীতাভাষ্য লিখেছিলেন, যা আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় তাঁকে শঙ্কর রামানুজের মত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে একাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।…এটি আমার কাছে একটি পবিত্র তীর্থস্থান।… জেলের মধ্যে লোকমান্য নীরবে যে কষ্ট সহ্য করেছেন, তার কতটুকুই বা আমরা জানি।… গীতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন বলেই হয়ত তিনি এ সব যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন এবং এ সম্বন্ধে কখনো তিনি কাউকে কিছু বলেন্‌নি।…এই যন্ত্রণা ও পরাধীনতার মধ্যেও কারাবাসের অমানুষিক প্রতিক্রিয়া তুচ্ছ করা এবং মানসিক স্থৈর্য বজায় রেখে গীতাভাষ্যের মত একটি বিরাট যুগসৃষ্টিকারী গ্রন্থ রচনা—এ শুধু লোকমান্যের মতন অসাধারণ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন একজন দার্শনিকের পক্ষেই সম্ভব।…যদি কেউ জানতে ইচ্ছুক হন যে, এই রকম প্রতিকূল, ক্লান্তিকর ও নিরুৎসাহজনক পরিস্থিতির মধ্যও লোকমান্যের গীতা-ভাষ্যের মত একটি বিরল ও মহদ্ গ্রন্থ রচনা করতে হলে পাণ্ডিত্য ছাড়াও কি পরিমাণ ইচ্ছাশক্তি, গভীর সাধনা ও সহনশীলতার প্রয়োজন তা হলে তাঁর কিছুদিন জেলে বাস করা

উচিত। আমি আমার নিজের কথা বলতে পারি, এ বিষয়ে যতই আমি চিন্তা করি ততই শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে অভিভূত হয়ে যাই। আশা করি দেশবাসী লোকমান্যের মহত্ত্বের পরিমাপ করবার সময় এ সব বিষয় মনে রাখবেন। তিনি বহুমূত্রের রোগী হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘকাল ব্যাপী কারাবাসের সেই দুঃসহ মুহূর্তগুলিতে নিজ প্রতিভা ও অবিচল সংগ্রামের আদর্শের দ্বারা মাতৃভূমিকে এই রকম একটি অমূল্য উপহার দিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের প্রথম সারিতে স্থান পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন ...।"

(শ্রী সুভাষচন্দ্র বসুর সমগ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড পৃঃ-১৬)

এই মহাবিপ্লবী যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে রণাঙ্গনে, তখনো চতুর্দিকের কর্মান্দোলন এবং বোমাবর্ষণের মধ্যে তিনি নিয়মিত গীতা পাঠ করে দিনের কাজ আরম্ভ করতেন। তাঁর তৎকালীন প্রচার-সচিব এস্‌-এ-আয়ার "Memoirs of Netaji" গ্রন্থে লিখছেন নেতাজী, "সকালে ঘুম ভাঙার পরে কিছুক্ষণ গীতা পড়তেন। তারপর জপ করতেন তুলসীর মালা হাতে নিয়ে।" রণাঙ্গনেও তাঁর সঙ্গে সর্বদাই থাকত একটি ছোট গীতা গ্রন্থ, তুলসীর মালিকা এবং মাতা কালিকার একটি ছোট পটচিত্র। কোন কোন দিন গভীর রাত্রে ব্রহ্মচারী কৈলাসকে নিয়ে আসার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনে গাড়ী পাঠাতেন। স্বামীজীর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলাপে নিরত থাকতেন। কোন কোনদিন গরদের ধুতি পরে নিজেই আশ্রমে চলে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকতেন। তাঁর আত্মসমাহিত মূর্তি দেখে বুদ্ধের কথা মনে হত।

[আমি সুভাষ বলছি—৩য়]

স্বামী ভাস্করানন্দ "স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র" গ্রন্থে সাক্ষ্য দিচ্ছেন—"সিঙ্গাপুরে ১৯৪৩এ মাতা শ্রীশ্রী সারদা দেবীর জন্ম উৎসবে এসে ঠাকুর ঘরে আধ ঘণ্টা ধ্যানাবিষ্ট থেকে পূজান্তে প্রসাদ নিলেন। একঘণ্টা আলোচনার পর চণ্ডীর জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় স্বামীজী নিজের চণ্ডীটি তাঁকে দান করায় তিনি অতিশয় আনন্দিত হলেন।"

রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা মনীষী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রাঁচি "শান্তিধাম" হতে ১৩৩০-এর ৭ই পৌষ তিলকের গীতা রহস্যের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় যে আশা প্রকাশ করেছিলেন, তা এই বিপ্লবী মহানায়কের জীবনে মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল—"পরিশেষে বক্তব্য গীতা রহস্যের এই বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া এই রাষ্ট্রনৈতিক চাঞ্চল্যের দিনে যদি কাহারো স্থির প্রজ্ঞা লাভ হয়, যদি কাহারো অন্তরে অচলা ধর্ম বুদ্ধি, নিষ্কাম কর্মবুদ্ধি জাগ্রত হয়, তাহা হইলে আমাদের শ্রম সার্থক হইবে।"

ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবী দধীচিবৃন্দের জীবনে গীতার প্রভাব যেমন দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় অহিংস সত্যাগ্রহীদের জীবনে ও কর্মে। পথের পার্থক্য পাথেয়ের পরিবর্তন করেনি। গীতার ক্ষেত্রে এ এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। মহাত্মা গান্ধী বিশ্বের রাজনৈতিক সংগ্রামে এক অনন্যসাধারণ মহানায়ক

অহিংস সত্যাগ্রহের পথিকৃৎ। বাল্যকাল হ'তেই তিনি গীতার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ। লন্ডনে ছাত্রাবস্থায় তরুণ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তাঁর বাসকক্ষে গীতার শ্লোকগুলি বিভিন্ন কাগজে লিখে চার দেওয়ালে ক্যালেন্ডারের মতো ঝুলিয়ে রাখতেন যাতে যে দিকেই তাকান্ না কেন গীতার শ্লোকে দৃষ্টি পড়বে। তাহ'লে তার ভাবে উদ্বুদ্ধ থাকায় বিদেশের ভোগ-বিলাসে ভেসে যাবার বিরুদ্ধে তাঁর চিত্ত সচেতন থাক্‌বে। সত্যিই এই তরুণকে সেদিন গীতা মাতা রক্ষাকবচের ন্যায় রক্ষা ক'রেছিলেন। পরবর্তীকালে দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রামে তাঁকে শক্তি যুগিয়ে ছিল এই গীতা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও গীতাই ছিল তাঁর অবলম্বন। তিনি নিত্য গীতা পাঠ ক'রতেন। গীতার অভিনব ভাষ্য রচনা ক'রেছিলেন। তিনি বলছেন তাঁর মাতা দুজন— গীতা এবং গর্ভধারিণী। তবে জন্মদাত্রী একদিন তো পার্থিব নিয়মে দেহত্যাগ করবেনই। কিন্তু, গীতা মাতা তো সর্বদিনই তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁকে শক্তি ও শান্তি যুগিয়েই যাবে। তাই, গীতামাতার গুরুত্ব সর্বাধিক।

তাঁরই অনুগত আর এক মনস্বী আচার্য বিনোবা ভাবে। ভারতের রাজনৈতিক চঞ্চল জীবনে কারাগারে স্থিতধী কর্মযোগী মনীষী বিনোবা ভাবের দিব্যকণ্ঠে আবির্ভূত হল "গীতা-প্রবচন।" এ এক ঐতিহাসিক অধ্যাত্ম ঘটনা। গীতাকে অবলম্বন করেই এই প্রকৃষ্ট বচন লোক-কল্যাণে গীতোক্ত "লোক সংগ্রহে" নিবেদিত হ'ল। কারাগারে বসে কয়েকজন শুশ্রূষুর সামনে ১৮ সপ্তাহ ধরে গীতার আঠারোটি অধ্যায় ভাবাবিষ্ট হ'য়ে পূজ্য বিনোবাজী পরিবেশন কর্‌লেন। সঙ্গী সানে গুরুজী কর্‌লেন তার অনুলিখন। পরে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে লক্ষ লক্ষ পুস্তকাকারে লক্ষ লক্ষ মানুষের হাতে গিয়ে পেঁছে এই গীতা প্রবচনের পরমান্ন। বিংশ শতাব্দীর অপরাহ্নে ভোগচঞ্চল, ঈশারিক্ত, কামনিষ্ঠ, অশান্ত, বিষণ্ণ মানুষেরও প্রশান্তির পথ এই গীতা—তাও এর দ্বারা প্রমাণিত হ'চ্ছে। ভারতের অগণিত অহিংস সংগ্রামী আজো গীতার বাণীকেই অবলম্বন করে লোকলোচনের অন্তরালে নীরবে দেশমাতৃকার সেবা এবং জনকল্যাণে সাংগঠনিক কর্মে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেই নিরত। বস্তুতঃ সর্বোদয় এবং ভূদান আন্দোলন তো গীতাপাঠেরই ফলশ্রুতি।

পূর্বোক্ত সহিংস এবং অহিংস রাষ্ট্রসাধকেরা ছিলেন গীতার প্রভাবে নিষ্কাম কর্মযজ্ঞে দীক্ষিত। তাঁদের রাজনৈতিক আন্দোলন ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীবিশেষের প্রশাসনিক প্রভুত্বের কামনায় কখনো পরিচালিত হয়নি। পাওয়ার এবং পাইয়ে দেবার প্রলোভনের দ্বারা মানুষকে তাঁরা প্রলুব্ধ করতে চাননি। তাঁরা দৃঢ়-ভাবেই জানতেন যে তাঁদের জীবদ্দশায় স্বাধীনতা কখনো আসবে না। দৈহিক নির্যাতন এবং মৃত্যু অবধারিত জেনেই তাঁরা স্বেচ্ছায় দুর্গম পথের যাত্রী হয়েছিলেন গীতার শিক্ষাতেই। ক্ষমতা দখল নয়, আত্মদানই ছিল তাঁদের লক্ষ্য।

আত্মার অবিনশ্বর অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পণ যোগে আস্থাই তাঁদের এই পথে অবিচল রেখেছিল। সবচেয়ে বড় ভয় মৃত্যুভয় এবং সবচেয়ে বড় লোভ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিদায়ক বস্তুর প্রতি। তাঁরা জানতেন গীতার শিক্ষাতে দেহ এবং দেহী পৃথক্। দেহের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। দেহী তথা আত্মা অবিনশ্বর। শত নির্যাতনেও আত্মার বিনাশ হয় না। তাই, তাঁরা হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাইতে পেরেছিলেন। কিশোর, ভরা যৌবনের অধিকারী এই তরুণদের প্রভূত প্রলোভনেও বিদেশী সরকার পথচ্যুত করতে পারেনি। কারণ গীতার শিক্ষাতেই তাঁরা জানতেন ইন্দ্রিয়ের এবং ভোগ্য-বস্তুর ক্ষণস্থায়িত্ব, ভোগের পরিণামে অশান্তি এবং অতৃপ্তি, ফলে অব্যাহত দুঃখ। তাঁরা জানতেন শাস্ত্রের ভাষায় মানুষের দুর্লভ জীবন—'ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে"-"তুচ্ছ ভোগের জন্য নয়"—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য এবং সেই প্রাপ্তি হয়, জীবনে আদর্শের জন্য, সত্যের জন্য পরিপূর্ণ "আত্মসমর্পণে"র দ্বারা। গীতা এই "আত্মসমর্পণ যোগই" তাঁদের শিক্ষা দিয়েছিল। জীবনে বহু প্রলোভন এবং ভয় আসবেই। তাতে অবিচলিত থেকে স্থিতপ্রজ্ঞের সাধনা করতে হবে। গীতা এই স্থিতপ্রজ্ঞত্বেরই দীক্ষা দিয়ে মানুষকে উন্নত জীবনের অধিকারী করে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আহ্বান গীতাধ্যায়ী বিপ্লবীর জীবনেই সার্থক হয়ে উঠেছিল—

"বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে—জীবন সর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে? জানি না, কে? চিনি নাই তারে—
শুধু এটুকু জানি তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানব-যাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সংকট-আবর্ত-মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে;

সর্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জেলেছে সে হোমহুতাশন।
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্ত পদ্ম—অর্ঘ্য উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ। শুনিয়াছি, তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞ জনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অপরিচিত অবজ্ঞায়— গেছে সে করিয়া ক্ষমা
... .
....শুধু জানি,
বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি—
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্কতিলক। তাহারে অন্তরে রাখি
জীবনকণ্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী
সুখে দুঃখে ধৈর্য ধরি, বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,
প্রতি দিবসের কর্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি
সুখী করি সর্বজনে : তার পরে দীর্ঘ পথ শেষে
জীবযাত্রা-অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে। (চিত্রা—এবার ফিরাও মোরে)

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হতেই মহর্ষি পিতার দীক্ষায় ও শিক্ষায় গীতার অধ্যয়নে এবং মর্মানুধ্যানে ছিলেন নিবিষ্ট। তাঁর বিপুল রচনা-সম্ভারে গীতার উল্লেখ যে ভাবে হয়েছে, তাই ভারতের দীর্ঘকালের রাষ্ট্রসাধনায় হয়েছে রূপায়িত। "সমাজ" গ্রন্থে তিনি বলছেন—

"গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্মকে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহার কারণ কী? তাহার কারণ এই যে, কর্মেই মনুষ্যের কর্তৃশক্তি বা আধ্যাত্মিকতার বলবৃদ্ধি হয়। কর্মেই মনুষ্যের সমুদয় প্রবৃত্তি পরিচালনা করিতে হয় এবং সংযতও করিতে হয়।...প্রবৃত্তির সাহায্যে কর্মের সাধন এবং কর্মের দ্বারা প্রবৃত্তির দমনই সর্বোৎকৃষ্ট।"

গীতাকে ভারতীয় চিন্তা ও চর্যার সংহত মূর্তিতে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন "জাভা যাত্রীর পত্র-৫"এ।—"শক্তির রূপ আর মুক্তির রূপ অবিচ্ছিন্ন এক।

এতেই শান্তি, এতেই সৌন্দর্য, জীবনের মধ্যে এই মিলটিতো খুঁজি—কবার চিরবহমান নদীধারার আর হওয়ার চিরগম্ভীর মহাসমুদ্রে মিলন। এই আত্মতৃপ্তির মিলনটিকে লক্ষ্য করেই গীতা বলেছেন—"কর্ম করো, ফল চেয়ো না"। "পরিচয়" গ্রন্থে "ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা" প্রবন্ধে গীতার স্বরূপ সম্বন্ধে কবির উক্তি হল—

"আতস-কাচের এক পিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আর একপিঠে যেমন তাহারই সংহত দীপ্তি রশ্মি, মহাভারতেও তেমনি একদিকে ব্যাপক জনশ্রুতি-রাশি আর একদিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি—সেই জ্যোতিটি ভগবদ্গীতা। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির যে সমন্বয় তাহাই সমস্ত ভারত-ইতিহাসের চরম তত্ত্ব।" রণক্ষেত্রের কোলাহলেও ভারত স্থিরচিত্তে গীতা শুনতে পারে। তাই রাষ্ট্রসাধনায় বারবার গীতাই সৈনিকদের বলাধান করিয়াছে। "প্রাচীন সাহিত্যের" "কাদম্বরী চিত্রে" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্য কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু, যখন কুরুক্ষেত্রের তুমুল যুদ্ধ আসন্ন তখন সমস্ত ভগবদ্গীতা অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতে পারে, ভারতবর্ষ ছাড়া এমন দেশ জগতে নাই।"

ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রজীবনে যুদ্ধ আছে এবং থাকবেই। তাই তার মধ্যেই ধর্মস্থাপনের জন্য গীতার প্রেরণাতে যুদ্ধ করতেই হবে। সামগ্রিক জীবনের সমন্বয়তত্ত্বকে তথ্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনা ভারতের সাধনা। ভারতের রাষ্ট্রকর্মীরা সেই সাধনাই করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ "মহাত্মা গান্ধী" প্রবন্ধে বলছেন—"উদার কাব্যপরিধির মধ্যে, ভারতের চিত্তভূমির মাঝখানে এই তত্ত্বকথার অবতারণা করার প্রয়োজন ছিল। মহাভারতের মাঝখানে গীতা প্রাচীনের সেই সমন্বয়তত্ত্বকে উজ্জ্বল করে।" "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" প্রবন্ধে মহাকবি বলছেন—"অনেকে মনে করে পথের ইতিহাসই ইতিহাস, মূলে অভিপ্রায় ও চরম গম্যস্থান বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু, ভারতবর্ষ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের একটি চরম তত্ত্বকে দেখিয়াছিল।… মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোকটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে। তাই গীতা। মহাভারতের এই গীতার মধ্যে লজিকের ঐক্যতত্ত্ব সম্পূর্ণ না থাকিতেও পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে বৃহৎ একটি জাতীয় জীবনের অনির্বচনীয় ঐক্যতত্ত্ব আছে।"

গীতার ভাবে উদ্বুদ্ধ বলেই ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তিসংগ্রাম অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করার নির্বিবেক কর্মান্দোলনের পরিবর্তে নীতি এবং মূল্যবোধের মাধ্যমে মানবমুক্তির মহতী সাধনায় পরিণতি লাভ করেছিল। স্বাধীনোত্তর ভারত সেই পথ হতে বিচ্যুত। তাই এত দুর্গতি। বর্তমান ভারতে ক্ষমতাশীল এবং ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক দলগুলি ভারতীয় অধ্যাত্ম জীবনাদর্শকে ত্যাগ করে প্রতীচ্যের ভোগবাদী গণতান্ত্রিক এবং সমাজ-

তাত্ত্বিক কম্যুনিস্ট মতাদর্শকেই গ্রহণ করেছে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতার্জনের নির্লজ্জ প্রতিযোগিতাই আজ রাজনৈতিক কর্মধারা। উগ্র ভোগাসক্তি সকাম কর্মে অনুপ্রাণিত ক'রে রাজনৈতিক নেতা এবং তাঁদের অনুগামীদের হিংস্র মানুষে পরিবর্তিত করেছে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাহীনতা তাঁদের নির্লজ্জ এবং নিষ্ঠুর করে তুলেছে। ব্যক্তিগত আপাত সুযোগের লালসা যে কোনো সময়ে মত এবং দল বদলে তাঁদের প্ররোচিত করে। পথের পার্থক্যে অপরকে শ্রেণীশত্রু, গণশত্রু কাফেরাদি চিহ্নে চিহ্নিত করে নির্বিচার নরহত্যায় তাঁদের উল্লসিত করেছে। আত্মার অবিনশ্বর অস্তিত্বে অবিশ্বাস এবং দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের আসক্তি তাঁদের করেছে অধঃপতিত। আদর্শের জন্য ত্যাগের পরিবর্তে ভোগে তাঁদের জীবনকে করেছে কলুষিত, সাময়িক ক্ষমতায় মদান্ধ করে আত্মম্ভরিতায় করেছে স্ফীত। গীতার—"অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে' তাঁদের জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সঙ্গ তথা বিষয়াসক্তি পরম্পরাক্রমে মানুষের জীবনে বিনাশকেই ত্বরান্বিত করে। গীতার ভাষাতেই—

"সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধো' ভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

কামনিষ্ঠ ঈশরিক্ত রাজনৈতিক ভোগবাদ গীতার ভাষাতেই পরিত্যজ্য।—

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামক্রোধস্তথালোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ।"

ভারতের রাষ্ট্রসাধনায় জাতির মুক্তি-সংগ্রামে গীতা ছিল প্রেরণার উৎস, কাম-ক্রোধ লোভ নয়। তাই ছিল সেটা ত্যাগোজ্জ্বল গৌরবের দিন। স্বাধীনতার পর জাতিগঠনে গীতা বিস্মৃত হওয়াতেই জাতীয় জীবনে এসেছে বিষণ্ণতার অভিশাপ। প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মীর গীতা অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। তাহলেই হবে তাঁদের চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং মানসিক শান্তি। জাতির তথা রাষ্ট্র এবং বিশ্বের কল্যাণেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গীতার অনুশীলন ও প্রয়োগ একান্ত অপেক্ষিত।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রসাধনায় মানব-কল্যাণের জন্য গীতার বাণীর অনুসরণের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। রক্তস্নাতা পাপম্লানা ধরিত্রীতে শান্তির প্রতিষ্ঠায়, বিশ্ব জাতি সংঘের কল্যাণ যজ্ঞে মানবের সার্বিক কল্যাণে গীতার ভূমিকা নানাভাবেই চিন্তাশীল মনীষীরা প্রার্থনা করছেন! সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্র-সংকট নিরসনে গীতা অপরিহার্য গ্রন্থ। বিশ্বশান্তি এবং কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রসংঘ বা U. N. O-এর প্রতিষ্ঠা। তার বহু প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণের জন্য গীতার বাণীই তার কর্ম সাধনার প্রেরণার উৎস বলে রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব স্বর্গত দ্যাগ্ হ্যামারশিল্ড্—"ফলাকাঙ্ক্ষা ক'রে কর্ম করা অপেক্ষা ফলের আশা ত্যাগ করে কর্ম করা অনেক ভালো। এই

উপদেশ সকল যুগের সকল দর্শনের চূড়ান্ত কথা। রাষ্ট্রসংঘের সকল প্রচেষ্টায় আমরা যদি গীতার এই উপদেশ অনুসরণ করে চলতে পারি তবেই আমরা সুখী হব—"

"The Bhagavadgita echoes an experience of all ages and all philosophies when it says—work with anxiety about results is far inferior to work without such anxiety in calm self-surrender. These words expressed deep faith and we will be happy if we can make that faith in all our effort."

জার্মেনীতে আণবিক বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করে লব্ধ আণবিক গবেষণার ফল ঘোষণা করেন। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক আলডাস হাক্সলি গীতার অনুবাদ করেন। বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের অন্যের সঙ্গে অবিরোধী কল্যাণে, আজ আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের শংকার মধ্যে বিশ্ব-ধর্ম-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সভ্যতার নূতন কুরুক্ষেত্রে ধর্মক্ষেত্র রচনার জন্য গীতার অনুসরণই রাষ্ট্রসাধনার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা।

"নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে'য়নায়।

হিন্দু বিবাহের কল্যাণ-রূপ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় হিন্দু বিবাহের শাস্ত্রীয় বিধানের কল্যাণ রূপটি অনুভব ক'রে "কল্পনা" কাব্যের "বিবাহ-মঙ্গল" কবিতায় নবদম্পতিকে আশীর্বাদ জানাচ্ছেন—

"দুইটি হৃদয়ে একটি আসন
পাতিয়া বসো হে হৃদয়-নাথ।
কল্যাণ করে মঙ্গল ডোরে
বাঁধিয়া রাখো হে দোঁহার হাত।
প্রাণেশ, তোমারি প্রেম অনন্ত
জাগাক জীবনে নব বসন্ত,
যুগল প্রাণের নবীন মিলনে
করো হে করুণ নয়নপাত।
সংসারপথ দীর্ঘ দারুণ,
বাহিরিবে দুটি পান্থ তরুণ,
আজিকে তোমারি প্রসাদ অরুণ
করুক উদয় নব প্রভাত।
তব মঙ্গল তব মহত্ত্ব
তোমারি মাধুরী তোমারি সত্য
দোঁহের চিত্তে রহুক নিত্য
নব নব রূপে দিবস-রাত।"

জীবন ও জগতের অন্তরালে সচ্চিদানন্দময় এক কল্যাণকর শক্তিমান সত্তার অস্তিত্ব প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের আবিষ্কার। তাঁরই চরণে শরণ নিয়ে তাঁরই প্রবর্তিত ছন্দে জীবনকে পরিচালিত ক'রে শান্তি, শক্তি ও আনন্দের সন্ধানে ছিল তাঁদের প্রত্যয়। সভ্যতার অগ্রগতিতে এবং সমাজের সামূহিক বিকাশে সেই ছন্দেরই অনুবর্তন অপেক্ষিত। প্রকৃতি পুরুষের মঙ্গল-মিলনে বিশ্বের সৃষ্টি। মানবজীবনের মূলেও রয়েছে সেই দুইটি সত্তার মধুর সংযোগ। বিশ্বশান্তির ভিত্তি হ'ল গোষ্ঠীগত জীবনের ক্ষুদ্রতম একক তথা Unit এর প্রশান্তি। সেই ক্ষুদ্রতম একক হ'ল একটি নর এবং একটি নারীর সম্মিলিত, সংযত, সুষম ও সুস্থ দাম্পত্য জীবন। সামাজিক শান্তির পূর্ব সর্তই হল পারিবারিক প্রশান্তি। সমাজ বিজ্ঞানী Lecky র মতে "The family is the centre and the

archtype of the state and happiness and goodness of the society depend on the parity of domestic life." নর-নারীর মিলিত জীবনের মহিমাতেই পারিবারিক জীবন হয় মহিমান্বিত। আর, বিবাহই হ'ল নর-নারীর যৌথ জীবনের মঙ্গল-বন্ধন। ব্যক্তিগত আনন্দময় জীবন এবং ভবিষ্যৎ সুস্থ প্রজাতির জন্য বিবাহের গুরুত্ব সমধিক। ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়জ ক্ষণিক তৃপ্তি বা উত্তেজনার পরিবর্তে পূর্ণতার জন্য পারস্পরিক নির্ভরতা এবং সু-সন্তান সৃষ্টির দ্বারা সমাজের হিতসাধন বিবাহের লক্ষ্য। ব্যক্তিগত স্বাভাবিক ভোগ-স্পৃহাকে মহত্তর আদর্শের পথে পরিচালিত ক'রে উন্নততর জীবনের প্রতিষ্ঠাই হিন্দু বিবাহের লক্ষ্য। বিবাহের উদ্দেশ্য পাঁচ প্রকার। কামেচ্ছার তৃপ্তি, প্রেম, সুপ্রজনন, সহ-ধর্মাচরণ ও বংশের বৈশিষ্ট্যরক্ষণ। এই পাঁচটির মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধন হিন্দু বিবাহের লক্ষ্য। তাই, শাস্ত্রীয় বিবাহের নানা বিধি-বিধান এবং অনুষ্ঠান-পরম্পরা সনাতন হিন্দু জীবনের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমানের ধর্মনেতা শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নির্দেশ স্মরণীয়ঃ

উন্নয়ন আর সুপ্রজনন
এই তো বিয়ের মূল,
যেমনি তেমনি ক'রে বিয়ে
করিস্ না কো ভুল।

ভারতীয় ঋষিরা মনে করতেন মানুষের জীবনে দুটো দিক—ব্যক্তিগত ও সমাজগত। শাস্ত্রীয় বিবাহ এই উভয় দিক্‌কেই তুল্যমূল্য দিয়ে এক সুসমঞ্জস জীবনের জয়গান গেয়েছে। তাই ফরাসী মনীষী রমঁ্যা রলঁ্যা শাস্ত্রশাসিত ভারতীয় সমাজের বিশ্লেষণে বলছেন—

"India's calm and ample metaphysics, her conception of the universe, her social organisation, the solution she has given to the problem of women, the family, love and marriage and the magnificent revelation of her art are indeed great."

রুশ বিপ্লবের পর দ্রুত গতিতে দেশোন্নয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পরিকল্পনা পদ্ধতির প্রয়োগ আজকের দিনে সর্বত্র সমাদৃত একটি সদুপায়। ফলে, অর্থনৈতিক, সৃষ্টিভিত্তিক এবং প্রযুক্তি ও শিল্পগত পরিকল্পনা থেকে শুরু ক'রে পরিবার পরিকল্পনা পর্যন্ত এই পদ্ধতির প্রয়োগ আজ প্রসারিত। সকল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য যেই মানুষের কল্যাণ, সেই মানুষের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে পরিকল্পনা পদ্ধতির প্রয়োগ কিন্তু আজো পর্যন্ত কোথাও দেখা যায় নি। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা অন্যান্য বহু ক্ষেত্রের ন্যায় এই বিষয়েও পথিকৃৎ। তাঁরা মনে করতেন "Charity begins at home" এর মতো ব্যক্তি ও পারিবারিক

জীবনেই প্রথমে পরিকল্পনা পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে। সুসংযত জীবন ও সুপরিকল্পিত সমাজ গঠন ব্যতীত বিশ্ব জীবনের শান্তি ও সমৃদ্ধি আদৌ সম্ভব নয়। ভারতীয় সমাজশাস্ত্রের "বর্ণাশ্রম" ব্যবস্থা তারই ফলশ্রুতি। ব্যক্তিগত জীবনের সুষ্ঠু সমন্বয়নে চতুরাশ্রম এবং সমষ্টিগত জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে চাতুর্বর্ণ্য বিধান ভারতীয় ঋষিদের অনন্যসাধারণ আবিষ্কার। চতুর্বর্গ, চাতুর্বর্ণ্য এবং চতুরাশ্রমের ওপরই ভারতীয় সনাতন সমাজসৌধের অবস্থান। সেই চতুরাশ্রমেরই অন্যতম হল "গার্হস্থ্য" আশ্রম। বিবাহ পদ্ধতির দ্বারাই সেই "গার্হস্থ্য" আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। জন্মের পর হ'তেই মানব শাস্ত্রীয় দশবিধ সংস্কারের মাধ্যমে ক্রমিক উন্নতির পথে চলতে শুরু করে। শাস্ত্রীয় রীতিতে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র পাঠের দ্বারা যেই দশটি কর্ম আমাদের জীবনকে সংস্কৃত এবং পর্যায়ে ক্রমে সমুন্নত করার জন্য সম্পাদন করা হয় সেইগুলিই হল দশবিধ সংস্কার। তাদের নাম হ'ল—বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও সমাবর্তন। বিবাহ তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সু-বিবাহের উপরই নির্ভর করে অন্য নয়টি সংস্কারের অবকাশ। বিচ্ছিন্ন দুটি নর-নারী বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসারে প্রবেশ করেন, রচনা করেন একটি পরিবার। পজিটিভ্ এবং নেগেটিভ্ দুটি তারের মিলনেই যেমন বিদ্যুদ্-বিকাশ, তেমনি একটি নর ও আর একটি নারীর মিলনেই হয় নূতন জীবন ও প্রাণের সৃষ্টি। সৃষ্টিধারার অব্যাহত গতি এই বিবাহপদ্ধতির উপরই নির্ভরশীল। সেই মিলনযজ্ঞে যদি ত্রুটি থাকে তা সুদূর-প্রসারী অকল্যাণই সৃষ্টি করবে। তাই, বিবাহ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার।

"বিবাহ" শব্দের পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে—ভার্যাত্ব-সম্পাদন-গ্রহণং বিবাহঃ —শাস্ত্রীয় বিধানে ভার্যারূপে পরিগ্রহণই হল বিবাহ। "বি" পূর্বক "বহ্" ধাতুর উত্তর "ঘঞ্" প্রত্যয় করে "বিবাহ" শব্দ নিষ্পন্ন। বিশেষ ব্রতকে বহন ক'রে চলা হ'ল "বিবাহ" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। যদৃচ্ছা যৌন-সম্ভোগের অনুমোদন হিন্দু বিবাহের লক্ষ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু বিবাহের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বলছেন—

"বিবাহ প্রাত্যহিক সংসারের ভূমিকা। তাহা নিয়মবন্ধ সমাজের অঙ্গ। বিবাহ এমন একটি পথ নির্দেশ করে যাহার লক্ষ্য একমাত্র ও সরল এবং যাহাতে প্রবল প্রবৃত্তি দস্যুতা করিতে প্রবল নিষেধ প্রাপ্ত হয়। ......যে অন্ধ প্রেম-সম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকার-প্রমত্ত করে, তাহা ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত, ঋষি-শাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে। ...... যে উন্মত্ত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর সমস্তই বিস্মৃত হয়, তাহা সমস্ত বিশ্ব-নীতিকে তাহার প্রতিকূল করিয়া তোলে। সেইজন্য সে প্রেম অল্প দিনের মধ্যেই দুর্ভর হইয়া উঠে, সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি আর সে বহন

করিয়া উঠিতে পারে না। যে আত্মসম্বৃত প্রেম সমস্ত সংসারের অনুকূল, যাহা আপনার চারিদিকের ছোটো এবং বড়ো, আত্মীয় এবং পর কাহাকেও ভোলে না, যাহা প্রিয়জনকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া বিশ্বপরিধির মধ্যে নিজের মঙ্গল-মাধুর্য বিকীর্ণ করে, তাহার ধ্রুবত্বে দেবে মানবে কেহ আঘাত করে না। আঘাত করিলেও সে তাহাতে বিচলিত হয় না। কিন্তু যাহা যতির তপোবনে তপোভঙ্গরূপে, গৃহীর গৃহপ্রাঙ্গণে সংসার ধর্মের অকস্মাৎ পরাভবরূপে আবির্ভূত হয়, তাহা ঝঞ্জার মতো অন্যকে নষ্ট করে বটে, কিন্তু নিজের বিনাশকেও বহন করিয়া আনে।······উন্মত্ততার উজ্জ্বল উন্মেষ ক্ষণকালের জন্যই হয়। তাহার পর অবসাদের, অপমানের, বিস্মৃতির অন্ধকার আসিয়া আক্রমণ করে। ইহা চিরকালের বিধান। ······ললিত দেহের সৌন্দর্যই নারীর পরম গৌরব, চরম সৌন্দর্য নহে। ······ধর্ম যেখানে দুই হৃদয়কে একত্র করে সেখানে মদনের সহিত কাহারও কোনো বিরোধ নাই। সে যখন ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বাধাইতে চায়, তখনই বিপ্লব উপস্থিত হয়, তখনই প্রেমের মধ্যে ধ্রুবত্ব এবং সৌন্দর্যের মধ্যে শান্তি থাকে না। কিন্তু, ধর্মের অধীনে তাহার যে স্থান আছে, সেখানে সেও পরিপূর্ণতার একটি অঙ্গস্বরূপ। সেখানে থাকিয়া সে সুষমা ভঙ্গ করে না। কারণ, ধর্মের অর্থই সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্য সৌন্দর্যকেও রক্ষা করে, মঙ্গলকেও রক্ষা করে এবং সৌন্দর্য ও মঙ্গলকে অভেদ করিয়া উভয়কে একটি আনন্দময় সম্পূর্ণতা দান করে। ·····শান্তির মধ্যেই সৌন্দর্যের পূর্ণতা, বিরোধের মধ্যে নহে।······সংপত্নীই সমস্ত ধর্ম-কার্যের মূল কারণ—কারণ—ক্রিয়াণাং খলু ধর্ম্যাণাং সৎপত্ন্যো মূল কারণম্। পতিব্রতার মুখচ্ছবিতে বিবাহিতা রমণীর যে গৌরবশ্রী অঙ্কিত আছে তাহা নিয়ত-আচরিতে কল্যাণ কর্মের স্থির সৌন্দর্য। ······জননীপদ আমাদের দেশে নারীর প্রধান পদ। সন্তানের জন্ম আমাদের দেশে একটি পবিত্র মঙ্গল ব্যাপার। সেইজন্য মনু রমণীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ—তাঁহারা সন্তানকে জন্ম দেন বলিয়া মহাভাগা, পূজনীয়া ও গৃহের দীপ্তিস্বরূপা। ·········ধর্ম যে সৌন্দর্যকে ধারণ করিয়া রাখে তাহাই ধ্রুব, এবং প্রেমের শান্ত সংযত কল্যাণ রূপই শ্রেষ্ঠ রূপ। ·········বন্ধনে যথার্থ শ্রী এবং উচ্ছৃংখলতায় সৌন্দর্যের আশু বিকৃতি। ·· ···নর নারীর প্রেম সুন্দর নহে, স্থায়ী নহে যদি তাহা বন্ধ হয়, যদি তাহা আপনার মধ্যেই সংকীর্ণ হইয়া থাকে, কল্যাণকে জন্ম দান না করে এবং সংসারে পুত্র-কন্যা-আপন প্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্র সৌভাগ্য রূপে ব্যাপ্ত হইয়া না যায়। একদিকে গৃহ-ধর্মের কল্যাণ বন্ধন, অন্যদিকে নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধন-মোচন, এই দুইই ভারত-বর্ষের বিশেষ ভাব। সংসারের মধ্যে ভারতবর্ষ বহু লোকের সহিত বহু সম্বন্ধে জড়িত, কাহাকেও সে পরিত্যাগ করিতে পারে না। ······ভারতবর্ষীয় সংহিতায় নরনারীর সংযত সম্বন্ধ কঠিন অনুশাসনের আকারে আদিষ্ট।"

······[রবীন্দ্র রচনাবলী –১৩শ –৬৬২]

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—চারভাগে জীবনকে বিভক্ত করে পর্যায়ক্রমে জীবনের এক একভাগ এক এক আশ্রমে বাস করতে হবে। এই হল সনাতন হিন্দুর পরিকল্পিত জীবন ব্যবস্থা। তার মধ্যে গার্হস্থ্যের গুরুত্বই সর্বাধিক। কারণ, অন্য তিনটি আশ্রমের অস্তিত্ব নির্ভর করে গার্হস্থ্যাশ্রমী তথা সদ্‌গৃহস্থেরই আনুকূল্যের উপর। তাই, মনু বলছেন—"যেমন প্রায় বায়ুকেই আশ্রয় করে সকল প্রাণী বেঁচে আছে, সেইরকম গৃহস্থকেই আশ্রয় করে অন্য আশ্রমবাসিগণ জীবন ধারণ করেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও ভিক্ষুরা যেহেতু গৃহস্থেরই বেদজ্ঞান ও অন্নদ্বারা প্রতিপালিত হন, এইজন্য গৃহস্থাশ্রমই সকল আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ।"

"যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব আশ্রমাঃ॥
যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥

(মঃ সঃ—৩/৭৭, ৭৮)

পরকালে অক্ষয় স্বর্গ ও ইহকালে সুখ সম্ভোগ যাঁরা ইচ্ছা করেন, অতি যত্নের সঙ্গে তাঁদের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করতে হবে, অসংযমে ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল হয়ে গেলে গার্হস্থ্যাশ্রম যথার্থভাবে পালন করা যায় না। তাই, সম্ভোগের সুখের জন্যও সংযমের একান্ত প্রয়োজন। জীব বিজ্ঞানের এই সত্য সনাতন শাস্ত্রে বিধৃত—

স সন্ধার্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা
সুখঞ্চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ॥

(মঃ সঃ—৩/৭৯)

যথোচিত বিদ্যার্জ্জনের পরই গুরুর অনুমতি নিয়ে বিবাহের বিধি। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা প্রয়োজন, প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষা ছিল তখন অবৈতনিক এবং আবাসিক, ফলে সার্বজনীন। তাই সকলের পক্ষেই বিদ্যাগ্রহণ ও তদনন্তর বিবাহে কোন অন্তরায় ছিল না। নিজের বর্ণের মধ্যেই সুলক্ষণা কন্যাকে বিবাহ করতে হবে। সেই কন্যাকে হতে হবে মায়ের অসপিণ্ডা ও পিতার অ-সগোত্রা।

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধিঃ।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্॥
অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥

(মঃ সঃ—৩/৪, ৫)

পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রমুখের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে যথাকাল কন্যাকে যোগ্যপাত্রে সমর্পণ, যদি যোগ্য অভিভাবক না থাকেন তাহলে কন্যা নিজেই

পতি নির্বাচন করে গ্রহণ করবে। তবে সেই স্বয়ংবরে শাস্ত্রনির্দেশ বর্ণ গোত্রাদি রক্ষা করেই পতি নির্বাচন করতে হবে। নিজের সুবিধার জন্য বা কন্যার স্বার্থে স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের জন্য কন্যার বিবাহে অনবধানতা শাস্ত্রানুমোদিত নয়। উদ্বাহতত্ত্বে বলা হচ্ছে—

"পরতন্ত্রভাবে দাতৃণাং কন্যা কুর্যাৎ স্বয়ংবরম্—গম্যং
সবর্ণত্বাদিনা স্বপ্রাপণার্হং বরং স্বপ্রদানেন পতিং
কুর্যাদিত্যর্থঃ"। (উদ্বাহতত্ত্ব—৪৬৯)

রক্তের ও সংস্কারের বিশুদ্ধি রক্ষা ক'রেই বিবাহের বিধি। নির্বিচার রক্তের মিশ্রণে দম্পতির বিবিধ মানসিক ও দৈহিক রোগ, আকাঙ্ক্ষীণতা এবং ত্রুটিযুক্ত সন্তানের জন্ম জীবজগতে পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে বর্ত্তমান জীববিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন। বর্ত্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান রক্তেরও চতুর্বিধ শ্রেণী আবিষ্কার করেছেন। যে কোন রক্ত যে কোন দেহে দেওয়া যায় না। সমশ্রেণীর রক্তের পরিবর্ত্তে লাল বলেই যে কোন রক্ত যে কোন দেহে দিলে রোগীর মৃত্যু অবধারিত। স্থূলে রক্ত প্রয়োগেও এত সাবধানতা। আরো সূক্ষ্ম এবং ব্যাপকভাবে ব্যক্তি ও সমাজের ভাল-মন্দ যে বিবাহের উপর নির্ভর করছে তার সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিরা আরো সাবধানতা অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছেন। ভোগের উন্মাদনায়, প্রবৃত্তির তাড়নায়, বন্ধনহীন জীবনের কামনায় এবং দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার বাসনায় এই বিধি বিধানকে অগ্রাহ্য এবং অমান্য করার জন্য নানা কূটযুক্তির অবতারণা করা হলেও পরিণাম যে শুভপ্রদ নয়, তা স্বতঃপ্রমাণ। দু চারটা ব্যতিক্রম দেখা গেলেও তা বিধিকেই সুদৃঢ় করে। এই বিষয়ে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের দুটি সাক্ষ্য আলোচ্য।

"The blending of races is regarded as the most destructive agency in the downfall of Rome. Under the shelter of Roman peace they mingled and the result was the unlimited hybridisation of types destroying the many finer types which had existed. It gave rise to instability of disposition and culture"

(Heredity and Eugenics)

"When two races are diverse, it is found that the offspring are unfertile. (Sir Isaac Taylor)

বৈজ্ঞানিক Darwin এর মতে পুরুষের ধর্ম হল নূতন গুণোৎপাদন এবং স্ত্রীর ধর্ম হল বংশক্রমাগত গুণের সংক্রমণ।

"Among females the law of heredity prevails most and among males that of originality."

এই দৃষ্টিতেই হিন্দু বিবাহ উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। শাস্ত্রে যাঁর পক্ষে যে ধরণের

কন্যা বিবাহযোগ্যা বলা হয়েছে, তার বাইরে যাঁরা আছেন, তাঁরা যে বর্ণেরই হোন্ না কেন, তাঁরা সেই বরের অগম্যা, মাতৃতুল্যা। বিবাহেও স্বামী বিবেকানন্দের সেই বীরবাণী হিন্দু সন্তানের স্মরণের ও অনুসরণের যোগ্য। ভারতীয় সমাজ জীবনের সেই তো আদর্শ—"হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারী জাতির আদর্শ, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, তোমার বিবাহ তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে।"

অসবর্ণ বিবাহের ফলে হয় বর্ণসঙ্কর। গীতায় বলা হয়েছে বিবাহের দ্বারা যে বর্ণসাঙ্কর্য হয় তাতে বিবাহকারীদের পরলোকে হয় নরকে গমন, পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদির যোগ্যতা তাদের চলে যায়। জলপিণ্ড লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় পিতৃপুরুষেরা স্বর্গ হতে তাদের অভিশাপ দেন—

"সংকরো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥"

(গীতা ১-৪১)

সামাজিক অবস্থা এবং প্রবৃত্তির বৈচিত্র্যের জন্য আট রকমের বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রে স্বীকৃত—

তার মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্যই হ'ল প্রশস্ত যা আজো সামান্য ইতর বিশেষে ভারতীয় হিন্দু সমাজে অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্যা ও সদাচার সম্পন্ন বরকে কন্যাকর্তা স্বয়ং আমন্ত্রণ ক'রে বর-কন্যাকে যথাসাধ্য সুন্দর বস্ত্র ও অলংকারে ভূষিত করে যে বিবাহ দান করেন তাই হ'ল সর্বজনসমাদৃত কল্যাণময় ব্রাহ্ম বিবাহ।

"আচ্ছাদ্য চার্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়াঃ ব্রাহ্মো ধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ॥"

[মনু-সং—৩—২৭]

অন্যসব মিলে গেলেও গুণহীনকে কন্যাদান কখনো করা যাবে না। নির্গুণকে কন্যাদান না করে কন্যাকে আইবুড়ো করে রাখাও ভালো বলে মনু মনে করেন—

"কামম্ আমরণাৎ তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্তুমত্যপি।
ন চৈবেনাং প্রযচ্ছেৎ তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥"

বিবাহে অল্পমাত্র পণ গ্রহণ করাও হিন্দু শাস্ত্রমতে গর্হিত অপরাধ: যিনি পণ গ্রহণ করেন, তিনি অপত্য বিক্রয়ের অপরাধে অপরাধী। গোহত্যা ও অপত্যবিক্রয় শাস্ত্রমতে তুল্যদোষ বিশিষ্ট উপপাতক। যাঁরা পণ গ্রহণ করেন তাঁরা পতিত হয়ে যান। শুদ্ধ হতে হলে তাঁদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। পণের অর্থ এবং সম্পদ স্ত্রীধনেই পরিণত হয়। বধূর স্ত্রীধনের ব্যবহার শ্বশুরালয়ের যে শ্বশুর, বর এবং পরিজনেরা করেন সেই পাপমতি পুরুষেরা হিন্দুশাস্ত্রমতে অধোগতিপ্রাপ্ত হয়। কনের বাড়ী থেকে লব্ধ পণের টাকায় বরের বাড়ীতে

আজকাল বৌ ভাত করার যে প্রবণতা ধার্মিক এবং ধর্মবিরোধী গৃহাদিতে দেখা যায় তা একান্তই হিন্দু শাস্ত্রবিরুদ্ধ। (মনু-৩/৫১-৫২)

শুল্কগ্রহণকারীকে আত্মবিক্রয়ী এবং মহাঋণী বলা হয়েছে। যারা পণ গ্রহণ এবং দান করে তারা অধস্তম সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত নরকে পতিত হয়। শাস্ত্রের বাণী হচ্ছে—

"শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্বসুতাং লোভমোহিতাঃ।
আত্মবিক্রয়িনঃ পাপা মহাকিল্বিষহারিণঃ॥
পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তি চাসপ্তমং কুলম্॥" (রঘুনন্দন)

বর্ত্তমানে শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রমের বলিষ্ঠ প্রবক্তা শ্রীমৎ সীতারামদাস ওঁকারনাথদেব পণগ্রহণের বিরুদ্ধে সমাজকে সচকিত করে বলেছেন—"ওরে তোরা ছেলে বেচিস্ না।"

বিবাহিতা নারীকে শ্বশুরালয়ে সমাদর করার স্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছেন হিন্দুশাস্ত্র। বধুকে উপেক্ষা নয়, সমাদরে ভোজন ও ভূষণদান কল্যাণকামী পিতা, ভ্রাতা, পতি ও দেবরদের কর্তব্য বিশেষ। পণ গ্রহণ বা প্রদানের পরিবর্তে যথাসাধ্যভাবে নারীদের সমাদর-বিধান শাস্ত্রীয় কর্তব্য। নারীদের সমাদরে দেবতারা প্রসন্ন হন। যে গৃহে নারীদের পূজা নেই, সেখানে যাগযজ্ঞ সবই নিষ্ফল। নারীরা যে কুলে দুঃখ পান, সেই কুল অচিরেই ধ্বংস হয়। তাই শ্রীবৃদ্ধি যাঁরা কামনা করেন, স্ত্রীলোকের সমাদর তাঁদের একান্ত কর্তব্য।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সন্তুষ্টির ওপরই কুলের কল্যাণ নির্ভর করে। বসন-ভূষণাদির দ্বারা স্ত্রীকে প্রীত করা স্বামীর কর্তব্য। আবার স্ত্রীরও কর্তব্য হচ্ছে প্রিয় আচরণের দ্বারা স্বামীর প্রীতি-বিধান। গৃহে স্ত্রীলোকদের বসন-ভূষণে সজ্জিতা না রাখলে সমগ্র-কুলই শোভাহীন হয়ে যায়।

"যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতে" বলা হয়েছে যে পুত্রপৌত্রাদিসহ অনন্ত স্বর্গ-প্রাপ্তির জন্যও পত্নীকে সেবা, ভরণপোষণ ও সুরক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। পত্নীকে উপেক্ষা করতে হিন্দুশাস্ত্র কখনো বলেননি—

"লোকানন্ত্যং দিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রকৈঃ।
যস্মাৎ তস্মাৎ স্ত্রিয়ঃ সেব্যাঃ ভর্তব্যাশ্চ সুরক্ষিতাঃ॥"

আবার প্রয়োজনে বৈধ পথে অর্থোপার্জন এবং তার সদ্ব্যয়ে পত্নীর অধিকার হিন্দু শাস্ত্রে স্বীকৃত। "উদ্বাহ তত্ত্বে" বলা হয়েছে—

"অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিযোজয়েৎ"। অপরিহার্য প্রয়োজনে আধুনিক কর্মরত কুলবধুদের শাস্ত্রীয় স্বীকৃতি লক্ষণীয়।

স্ত্রীলোকের আত্মা নেই বলে কোন কোন ধর্মে বলা হয়েছে। আবার কোথাও স্ত্রীলোকের সত্তায় অপরিণতির কথা উদ্ঘোষিত। ফলে নানাবিষয়ে প্রগতিশীল হয়েও প্রতীচ্যের বহু দেশে নারীর ভোটাধিকার ছিল না। আবার

প্রাচ্য দেশোদ্ভূত কোন কোন ধর্মের মানুষেরা অন্য ধর্মের নারীকে নির্বিচারে উপভোগের সামগ্রী এবং স্বীয় ধর্মেরও বিবাহিতা পত্নীকে উচ্ছিষ্ট মৃৎপাত্রের মতো ছুতোনাতায় পরিত্যাগে এবং একই সঙ্গে একাধিক নারীকে বিবাহ এবং যদৃচ্ছ উপভোগ ধর্মীয় কর্তব্য ও অধিকার বলে মনে করেন। ফলে নারীর তথা পত্নীর আত্মিক সত্তা এবং মর্যাদার অস্বীকৃতিই এতে প্রমাণিত হয়। বিংশ শতাব্দীর অপরাহ্নে স্বাধীন ভারতে "শাহবানু মামলা" এবং তার পরিণতিতে তথাকথিত অনেক আধুনিকমনা ব্যক্তির রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতায় কলংকিত এবং অমানবিক মুসলিম বিবাহ সংক্রান্ত বিল পাশ এক কলংকজনক ঘটনা। লেডিজ ফার্‌স্ট্‌-এর পরিবর্তে আপাত নানা বিধি-বিধানে নরনারীর জীবনকে হিন্দুশাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত করলেও নারীর মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব এবং দিব্য মাতৃত্বের দর্শনে মানুষকে করেছে প্রত্যয়নিষ্ঠ।

শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার লোপ, বেদাদি শাস্ত্রের অনধ্যায় এবং ব্রাহ্মণের অমর্যাদার সঙ্গে "কু-বিবাহ"ও শ্রেষ্ঠ বংশের ধ্বংসের কারণ।

"কু-বিবাহৈঃ ক্রিয়া-লোপৈর্বেদানধ্যয়নেন চ।
কুলান্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ॥" (মঃ-সং ৩ ৬৩)

বিবাহ হল ধর্মীয় জীবন-চর্যা।

ব্যাকরণের সূত্রানুসারে পতির ধর্মকর্মের সহকারিণী তথা যজ্ঞের সহধর্মচারিণী বলে "পতি" শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে "পত্নী" শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। যে ধর্মীয় জীবনচর্যাই হল হিন্দুশাস্ত্রমতে মনুষ্য-জীবনের মুখ্য কর্ম, তাতে পত্নীর অপরিহার্যতা শাস্ত্রে সমুদ্দিষ্ট। তাই, বিবাহিতা নারী কেবল বিলাস-সঙ্গিনী নন, "সহধর্মিণী"। মহাকবি কালিদাসের ভাষায় তিনি "গৃহিণী সচিবঃ সখী প্রিয়-শিষ্যা ললিতকলাবিধৌ।" সহধর্মিণীহীন পুরুষের যজ্ঞে অধিকার নেই। তাই, শ্রীরামচন্দ্রকে অশ্বমেধযজ্ঞকালে সীতাদেবী কাছে না থাকায় সহধর্মিণী সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি পাশে স্থাপন করতে হয়েছিল।

আবার পত্নীরও কর্তব্য হচ্ছে—পিতা বা ভ্রাতা যাঁর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন সেই পতির জীবিতকাল পর্যন্ত শুশ্রূষা ও পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হ'লে মৃত্যুর পরও তাঁকে উল্লংঘন না করা।—

"যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লংঘয়েৎ॥"

(মঃ-সঃ – ৫/১৫১)

এই গুরুত্বপূর্ণ বিবাহ কর্মটি হিন্দু সমাজে কতকগুলি মঙ্গলানুষ্ঠানের মাধ্যমেই সুসম্পন্ন হয়। প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশ্যে হোম ও পুণ্যাহ বাচনাদি স্বস্ত্যয়ন বর এবং বধূ উভয়েরই কল্যাণার্থে সম্পাদিত হয়।

"মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেঃ।
প্রযুজ্যেত বিবাহে তু প্রদানাৎ স্বাম্যকারণম্॥" (মঃ সঃ—৫/১৫২)

সৃষ্টিধারা অব্যাহত রাখার উৎসরও এই বিবাহ। তাই, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে তথা প্রজাপতিকে বন্দনা করে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বর্তমানের বিবাহ-লিপিতে মুদ্রিত পতঙ্গ প্রজাপতি নয়, প্রজাপতি ব্রহ্মাই এখানে উদ্দিষ্ট। বিবাহের মাধ্যমেই মানুষ গৃহস্থ হয়। সদ্‌গৃহস্থই অন্য সকলের ধারক বলে সমাজে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। "সকল নদ-নদীর যেমন পরম আশ্রয় সাগর, তেমনি সকল আশ্রমেরই পরম গতি হলেন গৃহস্থ।"

এই গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের যে অনুষ্ঠান তাই হ'ল বিবাহ। সেই বিবাহের আবার রয়েছে বহুবিধ অঙ্গ। প্রথম হ'ল আশীর্বাদ বা পাকা দেখা। নির্বাচিত বর এবং কন্যাকে উভয় পক্ষের অভিভাবকবর্গ, গুরু এবং পুরোহিত সহ গিয়ে প্রাচীনকালের বাগ্‌দানের আধুনিক সংস্করণ "আশীর্বাদ" করে থাকেন বিশেষ পুণ্য সময়ে। মন্ত্রের দ্বারা কামনা করেন বর-কনের দীর্ঘ আয়ু, কল্যাণ, শান্তি, পুষ্টি ও তুষ্টি—"ওঁ দীর্ঘায়ুঃ শ্রেয়ঃ শান্তিঃ পুষ্টিস্তুষ্টি-শ্চাস্তু।" কেবল দুটি নর-নারীর মিলন নয়, দুটি বংশের মিলনে হিন্দু বিবাহ মহিমান্বিত। ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টি চেতনাকে মর্যাদা দিয়ে হিন্দু বিবাহ প্রকৃতই সমাজতন্ত্রকেই রূপায়িত করে থাকে। বিবাহ দিনে "জ্ঞাতিকর্মের" দ্বারা আত্মীয়েরা এসে মঙ্গলমন্ত্রে কন্যাকে স্নান করাবেন। তারপর উভয়পক্ষই স্ব স্ব গৃহে স্ব স্ব পূর্ব-পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নবদম্পতির কল্যাণে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে "বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ" করবেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুষ্ঠেয় এই কর্মকে বলা হয় শ্রাদ্ধ। শুধু জীবিত নয়, স্বর্গতদের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা-নিবেদন হিন্দুর বৈশিষ্ট্য। আনন্দোৎসবেও প্রয়াত পিতৃপুরুষের আশীর্বাদ তাঁদের কাম্য। অভ্যুদয়ের জন্য অনুষ্ঠিত হয় বলে এই শ্রাদ্ধকে বলা হয় "আভ্যুদায়িক"।

সন্ধ্যায় হবে সম্প্রদান। দেবতা নারায়ণ, গুরু, পুরোহিত, আত্মীয় এবং আমন্ত্রিত সামাজিক বর্গকে সাক্ষী রেখে হবে এই অনুষ্ঠান। তাতে মঙ্গলমন্ত্রের উচ্চারণ, মঙ্গলবাদ্য, উলুধ্বনি, মাঙ্গলিক দ্রব্যাদির সমাবেশ এবং সর্বজনের আপ্যায়নে আনন্দের হিল্লোল বয়ে চলে। জামাতা সেদিন বর তথা শ্রেষ্ঠ, তথা দেবতা-স্বরূপ। কন্যাও সেদিন দেবীরূপা। উভয়কুলের পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহের নাম উল্লেখ ক'রে হয় সম্প্রদান তথা সম্যগ্‌ভাবে দান। এ যে দুটি নর-নারীকে কেন্দ্র করে দুটি বংশেরই মিলন। তাঁদের মিলন-সঞ্জাত সন্তান উভয়কুলেরই পিতৃপুরুষকে পরবর্তীকালে শ্রাদ্ধ তর্পণে সন্তৃপ্ত করবে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে রয়েছে আনন্দজনক নানাবিধ স্ত্রী-আচার। বিবাহে স্ত্রী-আচারেরই প্রাধান্য। তারপর দেবপূজামন্ত্রে বরকে পাদ্য-অর্ঘ্য মধুপর্কাদির দ্বারা অর্চনান্তে তাঁর ডান হাতের ওপর কন্যার ডান হাত রেখে প্রার্থনা করা হয়—"ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, চন্দ্র, সূর্য, এবং অশ্বিনীদ্বয় যেন এই বর-বধূকে চিরকাল একসঙ্গে মঙ্গলসূত্রে বেঁধে রাখেন—

"ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ চন্দ্রার্কাবশ্বিনাবুভৌ।
তে ভবা গ্রন্থিনিলয়ং-দধতাং শাশ্বতীঃ সমাঃ॥"

মন্ত্রের দ্বারা সম্প্রদানান্তে হবে যজ্ঞ। এই যজ্ঞীয় অগ্নির নাম হ'ল "যোজক"। অগ্নিদেব এখানে বরবধূর মিলনকে সম্পূর্ণ করেন বলে, বর এবং বধূকে যুক্ত করেন বলে—"বিবাহে যোজকঃ স্মৃতঃ"। বিবাহ হোমের পর হয় লাজ-হোম। বধূকে নিয়ে সম্মুখস্থিত শিলায় আরোহণ ক'রে বর মন্ত্রপাঠ করে দুজনে মিলিত ভাবে ঘৃত এবং লাজ তথা খৈ যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেবেন। বধূ বলবেন—আমার পতি দীর্ঘায়ু হ'য়ে শতবর্ষ বেঁচে থাকুন। জ্ঞাতিরা আমায় স্নেহ করুন।—

"ইয়ং নারী উপব্রূতে অগ্নৌ লাজান্ আবহন্তী।
দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতিঃ, শতং বর্ষাণি জীবতু
এধন্তাং জ্ঞাতয়ো মম স্বাহা।"

পতি বলবেন—"তুমি শিলায় আরোহণ করে শিলার মত সহিষ্ণু হও"। তারপর হবে সপ্তপদী গমন। মন্ত্রের অর্থে সূচিত হবে বর-বধূর জীবন-পথের চিরন্তন সখ্য। বিবাহ-দর্শনে সমাগত সজ্জনদের আহ্বান করে বর বলবেন—"আমার মঙ্গলরূপিণী এই বধূকে আপনারা দেখুন। সৌভাগ্যের জন্য তাকে আশীর্বাদ করুন।"—

"ওঁ সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত।
সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বায়ার্থস্তাং বিপরেতেন।"

তারপর বর বধূর পাণিগ্রহণ করে নানা মন্ত্রের দ্বারা দেবগণের আশীর্বাদ প্রার্থনান্তে জীবনের এই নবীনা সঙ্গিনীকে বলবেন—"তুমি শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, ননদ এবং দেবরদের কাছে সাম্রাজ্ঞী হ'য়ে থেকো"—

"ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব।
ননান্দরি চ সম্রাজ্ঞী, ভব অধিদেবৃষু॥"

নবীন বর নবীনা বধূকে বলবেন—

"আমার জীবন ব্রতে তথা আদর্শের পথে তোমার হৃদয় দান করো, আমার চিত্তের অনুগামিনী তুমি হয়ো। আমরা যেন এক মনঃপ্রাণ হ'তে পারি। বৃহস্পতি তোমায় আমার সঙ্গে সর্বদাই নিযুক্ত রাখুন"—

"ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু, মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু
মমবাচমেকমনা জুষস্ব, বৃহস্পতিস্ত্বা নিযুনক্তু॥"

তারপর উভয়ে মিলে ধ্রুব দর্শন করে নিজেদের মিলনের ধ্রুবত্বসূচক মন্ত্রপাঠ করবেন। তারপর শুদ্ধ হবিষ্যান্ন ভোজনান্তে বলবেন—"অন্ন, প্রাণ, মন এবং সত্যের গ্রন্থিতে তোমায় আজ আমার সঙ্গে যুক্ত ক'রে নিলাম।"—

"ওঁ অন্নপাশেন মণিনাং প্রাণসূত্রেণ গ্রন্থিনা।
বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ং চ তে॥"

"তোমার এই হৃদয় আমার হোক্, আমার হৃদয় হোক্ তোমার।"

"যদেতদ্ হৃদয়ং এব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব॥"

যোগ্য বংশধর কামনা করে বলবেন—।

"জীববৎসা ভব ত্বং হি সুপুত্রোৎপত্তিহেতবে।
তস্মাৎ ত্বং ভব কল্যাণি অবিঘ্ন-গর্ভধারিণী।
দীর্ঘায়ু-বংশধরং পুত্রং জনয় সুব্রতে॥"

এই ভাবে আরো আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান ও মন্ত্র এই বিবাহ অনুষ্ঠানে রয়েছে। ঋষি, ছন্দ ও দেবতা উল্লেখ করে এই বৈদিক মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করা হয়।

ধর্মকেন্দ্রিক ঐহিক ও পারত্রিক আনন্দময় জীবনের ব্রত হ'ল হিন্দু বিবাহ। আহার নিদ্রা ভয়-মৈথুনকে স্বীকার ক'রে নিয়ে ধর্মের সঙ্গে তাকে যুক্ত ক'রে জান্তব জীবনের ঊর্ধ্বে উন্নয়নের মাধ্যমে শুধু মানবিক স্তরে নয় ক্রমশঃ দিব্য জীবন প্রতিষ্ঠাই হ'ল হিন্দু বিবাহের লক্ষ্য। প্রবৃত্তিকে পরিশীলিত করে আচারে-বিচারে সুনিয়ন্ত্রিত করে, সামাজিক মূল্য বোধে সংযত ক'রে মনুষ্য-জীবনের সমন্বয়ন শাস্ত্রীয় বিবাহের বৈশিষ্ট্য। গৃহীর আদর্শ হ'ল—

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"

পশুর মত ভোগনিষ্ঠ নয়, কামনিষ্ঠ নয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ, তত্ত্বজ্ঞানী, নিষ্কাম কর্মযোগী গৃহীরই সৃষ্টি হত শাস্ত্রীয় অনুশাসনে। ব্যতিক্রম বহু দেখা গেলেও সেটা আদর্শ নয়, অনুসরণ যোগ্যও নয়। এই প্রসঙ্গে ক্রান্তদর্শী কল্যাণদর্শী মুক্তমনা রবীন্দ্রনাথের কথাই স্মরণ করি—

"কিন্তু, তবু একথা স্বীকার করা উচিত যে, কোনো ধর্ম সাধনার অর্থ যদি দেশের কোনো বিশেষ শাস্ত্র বা সাধকের মধ্যে কথিত বা জীবিত থাকে তবে তাকে সম্মান করা কর্তব্য। এমন কি, ভূরিপরিমিত প্রচলিত ব্যবহারের চেয়েও তাকে বড়ো ব'লে জানা চাই। ধর্মকে পরিমাণের দ্বারা বিচার না করে তার উৎকর্ষের দ্বারা বিচার করাই শ্রেয়ঃ।

স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"।

[কালান্তর—শক্তিপূজা—১৬১]
কার্ত্তিক—১৩২৬

ঈশ-বিস্মৃতি এবং উগ্র ভোগাসক্তির দ্বারা উন্নত বিজ্ঞানের সাহচর্যে দায়িত্ব-হীন ভাবে যদৃচ্ছ ইন্দ্রিয় উপভোগের প্রমত্ততায় শিশ্নোদরপরায়ণতাকে জীবন-সর্বস্ব বলে মনে ক'রে প্রগতির নামে মানুষ যখন উন্মাদ হ'য়ে ছুটে আজ দেশে দেশে অশান্ত, তখন শাস্ত্রশাসিত সনাতন ভারতের বিবাহ-মঙ্গল আমাদের শুভ বুদ্ধিকে জাগ্রত করুক—

"স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু"।

উনবিংশ শতকের নব জাগরণে দ্বিতবী মনীষী

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

উনিশ শতকে বঙ্গ-ভারতের জাতীয় জীবনে এক যুগসন্ধিতে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী (১১ই ফাল্গুন, ১৮৪৮ শক) মহাত্মা ভূদেবের আবির্ভাব ; আর তিরোভাব হ'ল ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে। এই সময়টি ছিল বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে একদিকে ভাঙার এবং আর একদিকে গড়ার যুগ। এই ভাঙাগড়ার খেলার মধ্য দিয়েই তখন বাংলার বুকে জেগে উঠলো এক নতুন সাংস্কৃতিক চেতনা, যার জন্যে এই যুগকে বলা হয় নব জাগরণের যুগ—Age of Reneissance। মুসলমান রাজত্বের অবসানে নবাগত ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গেই সাগরপারের নূতন ভাবাদর্শ বাঙালী জীবনে এনেছিল আত্মবিস্মৃতি ও পরানুকরণের এক বাঁধাভাঙ্গা জোয়ার। সেই স্রোতের প্রবল টানে নব্যশিক্ষিত তরুণদল বহু দূরে ভেসে গিয়ে জাতীয় জীবন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প'ড়ল। অনুকরণের চোরাবালির ওপর সাংস্কৃতিক জীবনের নূতন বনিয়াদ গ'ড়ে তোলাই হ'ল তখন তাদের একমাত্র লক্ষ্য। রাজনৈতিক পরাধীনতার বিষময় ফল সাংস্কৃতিক পরাধীনতার নাগপাশে শৃঙ্খলিত হ'য়ে নব্য বাংলার চিন্তাশক্তি পঙ্গু হ'য়ে প'ড়লো। নিজেদের সভ্যতা সংস্কৃতি ধর্ম সম্বন্ধে একটা আত্মশ্লাঘাপূর্ণ ধারণা (inferiority complex) পোষণ ক'রতে লাগলো সেদিনের শিক্ষিত বাঙালী। বাংলার তখনকার দিনের বহু মনীষীও এই প্লাবনকে পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে পারেন নি, নিস্তার পান নি লোনা জলের বান থেকে। এই এক যুগমানবই তখন বাংলার সংস্কৃতি-গগনে ধ্রুবনক্ষত্রের মত একক অথচ প্রোজ্জ্বলভাবে উদিত হ'য়ে দিশেহারা বাঙালীকে মুক্তির নিশানা দিয়ে গেলেন। তখনকার সেই প্রবল প্রতিরোধের মধ্যেও অচল অটল হিমাচলের মতই আত্মস্থ হ'য়ে অবিচলচিত্তে উন্নতশীর্ষে দাঁড়িয়েছিলেন একমাত্র পুরুষোত্তম ভূদেব।

এর কারণ হ'চ্ছে ভূদেব ছিলেন সত্যিকারের বুদ্ধিজীবী বা intellectual। কেবল চিন্তার বিলাস নয়, সামাজিক জীব হিসেবে সক্রিয় সমাজ-চিন্তা করাই বুদ্ধিজীবীর প্রধান ধর্ম। সমাজবিজ্ঞানের এনসাইক্লোপিডিয়ায় রবার্টো মিসলেস ব'লছেন যে প্রকৃত বিদ্বান ও বুদ্ধিজীবী তাঁরাই, যাঁরা সাধারণ লোকের মত প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়াধীন জ্ঞানের ওপর নির্ভর না ক'রে নিজেদের কাজকর্মে ও বিচার বিশ্লেষণে চিন্তার ও মননের পরিচয় দেন বেশী। বুদ্ধিজীবীর গুণপনা বিশ্লেষণ ক'রতে গিয়ে তিনি ব'লছেন—"Those who have merely accumulated knowledge are not true intellectuals. The

scholar must possesses priestly qualities and fulfil priestly functions including political activity. His knowledge should be truly applied for society's use" এই হিসেবে ভূদেবই ছিলেন তখনকার দিনের সত্যিকারের 'ইন্টেলেক্‌চুয়াল'। Priestly qualities যে রকম ভূদেবের ছিল এবং priestly functionsও তিনি যেভাবে সম্পাদিত ক'রেছেন তার তুলনা নেই বললেই চলে। তাঁর সাহিত্যকৃতি নিয়ে আলোচনা করার সময় এই বিষয়ে বিশদ ক'রে বলা যাবে।

এই সুপ্রচীন দেশের সংস্কৃতির মূল্যায়নে, শিক্ষা ও সাহিত্যের নবরূপায়ণে এবং চরিত্রগঠনে এই যুগন্ধর মনস্বীর দান অপরিমেয়। একদিকে যুগ যুগান্ত-সঞ্চিত পুঞ্জীভূত অন্ধসংস্কারের অচলায়তন; অন্যদিকে, যা নতুন, তারি পদতলে নির্বিচারের আত্মবিসর্জনের অত্যুগ্র উৎসাহ—জাতীয় প্রগতির এই দুই বিরাট বাধাকে তিনি অবলীলাক্রমে অপসারিত ক'রেছেন। অকল্যাণের অন্ধ তমসা ভেদ ক'রে আত্মপ্রকাশ ক'রেছেন তিনি জ্যোতির্ময় সূর্যের মত, গেয়ে গেছেন ভারতের অন্তর-লোকের অভিনন্দন গান। সাংস্কৃতিক পরাধীনতা এবং পরানুকরণের কুহেলিকা উদ্‌ঘাটন ক'রে মুক্তিদূতের মত তিনি এনেছেন মুক্ত প্রাণের বার্তা। সর্বতোমুখী বুদ্ধি ও সর্বত্রপ্রসারিত হৃদয় নিয়ে অসংখ্য প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনিই সেদিন সমগ্র জীবন দিয়ে পালন ক'রেছেন এবং প্রচার ক'রেছেন ভারতীয় সাধনার সেই চিরপ্রাচীন ও চিরনূতন মর্মবাণী—"আত্মানং বিদ্ধি"।

সেই সংকটকালে আমাদের আর্থিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণতম, দৃষ্টি-শক্তি মোহাবৃত এবং সৃষ্টিশক্তি পঙ্গু। বর্তমান যুগ ও জীবনের নবোত্থিত জিজ্ঞাসার নতুন উত্তর দেবার মত বাণী আমরা তখন হারিয়ে ফেলেছি। অষ্টাদশ শতকের শিল্পবিপ্লবে পাশ্চাত্য জীবনে যে বিরাট আলোড়ন এবং পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, ঊনবিংশ শতকে ইয়োরোপ কালস্রোতে সেই নবীনকে আত্মস্থ ক'রে নিয়ে সুস্থ হ'য়ে উঠলো। কিন্তু আমাদের অবস্থা তখন ত্রিশঙ্কুর মত। প্রাচীনকে নির্বিচারে পরিত্যাগ ক'রেছি; কিন্তু, পশ্চিমকেও আত্মস্থ ক'রতে পারিনি। পশ্চিমের সুকৃতির পরিবর্তে বিকৃতিকে গ্রহণ ক'রে ঘরে বাইরে আমরা লাঞ্ছিত এবং ধিক্কৃত হয়েও মোহবশতঃ তাকেই প্রশস্তি ব'লে মনে ক'রে আত্মসন্তুষ্টির আস্ফালনে আমরা মত্ত। এমন কি, নিজের চিত্তদৈন্য সম্বন্ধে লজ্জা করার মত চেতনাও তখন আমাদের বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। সমাজের উঁচুর তলার লোকদের চিত্তও তখন এই ভাবধারায় অনেকটা বিকৃত হ'তে চলেছে। মানুষ যত মহানই হোন না কেন, কিছু কিছু দোষ তাঁদেরও থাকে। তখনকার অনেক যুগন্ধর মনীষীকল্প ইংরেজীশিক্ষিত সংস্কারকদেরও বহুবিধ গুণের সঙ্গে দুয়েকটি দোষও ছিল; যা হয়তো তাঁদের বেলায় বলা চলে "তেজীয়সাং ন দোষায়"। কিন্তু, সাধারণ নব্যশিক্ষিতের দল তাঁদের

গুণগুলোকে বর্জন ক'রে দোষগুলোকেই সাগ্রহে এবং সোৎসাহে অনুকরণ ক'রতে লাগলো। যেমন, সুরাপান, নাস্তিকতা, অসংযম এবং উচ্ছৃঙ্খলতাই সংস্কারের নামে প্রশ্রয় এবং আশ্রয় পেলো তথাকথিত আলোকপ্রাপ্তদের কাছে। ইংরেজীশিক্ষিত মনীষী ও সংস্কারক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" গ্রন্থে তখনকার দিনের সমাজের অবস্থা বিশ্লেষণে এই বিষয়েই বহু সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। তিনি বলছেন—

"সে সময়ে সুরাপান করা কুসংস্কার ভঞ্জনে একটা প্রধান উপায়স্বরূপ ছিল। যিনি শাস্ত্র ও লোকাচারের বাধা অতিক্রমপূর্বক প্রকাশ্যভাবে সুরাপান করিতে পারিতেন, তিনি সংস্কারকদলের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইতেন। স্বয়ং রাজা রামমোহন রায় পরোক্ষভাবে সুরাপান বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন। ···রাজা বোধ হয় একথাটা চিন্তা করিয়া দেখেন নাই যে, যাহা তাঁহার পক্ষে পরিমিত সীমার মধ্যে রক্ষা করা সুসাধ্য ছিল, তাহা অপরের পক্ষে সর্বনাশের কারণ হইতে পারে। পরবর্তী সময়ে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই সুরাপান—নিবন্ধন আমরা অনেক ভাল ভাল লোক অকালে হারাইয়াছি। যাহা হউক, যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় সুরাপান করা সুসংস্কারহীন সংস্কারকদিগের একটা প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"

(পৃঃ ৮৬)

"এই দিকে এই সময়ে দেশের শিক্ষিত সমাজের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল। ডিরোজিও যে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এই সময়ে বঙ্গসমাজে পূর্ণমাত্রায় কাজ করিতেছিল। শিক্ষিত দলের মধ্যে সুরাপানটা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু কলেজের ষোলো সতেরো বৎসরের বালকেরা সুরাপানকে শ্লাঘার বিষয় বলিয়া মনে করিত। বঙ্গের অমর কবি মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি এই সময়ে হিন্দু কলেজে পাঠ করিতেছিলেন। সে সময়কার লোকের মুখে শুনিয়াছি যে কলেজের বালকেরা গোলদিঘীর মধ্যে প্রকাশ্য স্থানে বসিয়া মাধব দত্তের বাজারের নিকটস্থ মুসলমান দোকানদারের দোকান হইতে কাবাব মাংস কিনিয়া আনিয়া দশজনে মিলিয়া আহার করিত ও সুরাপান করিতে। যে যত অসমসাহসিকতা দেখাইতে পারিত তাহার তত বাহাদুরি হইত; সেই তত সংস্কারক বলিয়া পরিগণিত হইত।"

কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁর "আত্মজীবন চরিত" এ লিখছেন—

"আমাদের দেশে বহুকাল হইতে সুরাপান বিশেষ দোষকর ও পাপজনক বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে; এবং মদ্য স্পর্শ করিলে শরীর অপবিত্র হয়, এইরূপ বিশ্বাস এদেশস্থ লোকের মনে জন্মিয়াছে। কিন্তু, আমাদের মনে এই স্থির হইল যে, যখন এমন বুদ্ধিমান, বিদ্বান ও সভ্যজাতীয়েরা ইহা আদরপূর্বক ব্যবহার করিতেছেন, তখন ইহা অহিতজনক কখনই নহে। অতএব ইহা

পান না করিলে, সভ্যতাই বা কিরূপে হইবে আর পূর্বসংস্কারই বা কিরূপে যাইবে? হিন্দু কলেজের শিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা এদেশের সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুরাপান করিতেন।"

বাংলায় নব্যশিক্ষার প্রধান তীর্থকেন্দ্র ছিল হিন্দু কলেজ। রিচার্ডসন এবং ডিরোজিও নামক দুইজন ইংরেজ শিক্ষক তাঁদের অতুলনীয় সাহিত্যপ্রতিভা এবং অপরিসীম ছাত্রপ্রীতির দ্বারা অচিরেই তরুণ ছাত্রদের হৃদয় হরণ ক'রে নিয়েছিলেন। বিশেষ ক'রে ডিরোজিওর অতুলনীয় পাণ্ডিত্যে, সুগভীর মনীষায়, অপূর্ব যুক্তিনিষ্ঠায় এবং আশ্চর্য আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে ছাত্রসমাজ অচিরেই তাঁর ভাবশিষ্যে পরিণত হ'ল। এই মনীষী ছিলেন বহুবিধ সদ্‌গুণের সঙ্গে আবার নাস্তিকতা ও স্বাধীন চিন্তার প্রবল সমর্থক ও উগ্র প্রচারক। ফলে এই ছাত্রপ্রিয় আচার্যের শিক্ষায় ও দীক্ষায় নব্যশিক্ষিত তরুণ দল অনেক ক্ষেত্রে গুরুকেও ছাড়িয়ে গেলেন। তাঁর শিষ্যেরা "Athenium" নামে একটি ইংরেজী মাসিকপত্র বের করেন। প্রচলিত হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করাই ছিল এই পত্রের প্রধান কাজ। মাধবচন্দ্র মল্লিক নামে একজন ছাত্র এই পত্রে লিখলেন—

"If there is anything that we have hated from the bottom of our heart, it is Hindusim."

('রামতানু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' : পৃঃ ৮৭;)

ডিরোজিওর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত "Academic Association" নামক সমিতির প্রতিটি অধিবেশনে স্বাধীন চিন্তাদি বিষয়ের সঙ্গে বহু গুরুত্বের ক্ষতিকর বিষয়েরও যথেষ্ট আলোচনা হ'ত। হরমোহন চট্টোপাধ্যায় তার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখছেন—

"The principles and practices of Hindu Religion were openly ridiculed and condemned, and angry disputes were held on moral subjects,...The Hindu religion was denounced as vile and corrupt and unworthy of the regard of rational beings. ('রামতনুজ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' : পৃঃ ১০২)

দেশের এমনি এক পরম দুর্গতির দিনে ভূদেবের মত এই অতন্দ্র, আত্মনিষ্ঠ সাধকের আবির্ভাব। ভূদেবও ছিলেন ডিরোজিওর ভাবপ্লাবিত হিন্দু কলেজের বিখ্যাত ছাত্র এবং এই Young Bengal দলেরই অন্তরঙ্গ সতীর্থ। কী আশ্চর্য, অসাধারণ দৃঢ়তা, অনমনীয় ব্যক্তিত্ব এবং অলৌকিক মনীষা নিয়ে তিনি সকলের সঙ্গে থেকেও সকলের চেয়ে পৃথক্ এবং বিশিষ্ট হ'য়ে উঠলেন। মনে হয় "ভারত-ভাগ্য বিধাতার" করুণাঘন আশীঃপুঞ্জই যেন সংহত হ'য়ে আত্মপ্রকাশ ক'রেছিল ভূদেবের সৌম্যস্নিগ্ধ পবিত্র মূর্তিতে। আচার্যের মত তিনি প্রদর্শন ক'রেছেন—আমাদের দেশের অন্তরাত্মার মধ্যেই কোথায় আছে বিশুদ্ধ জ্ঞানের চিরপুরাতন, চিরনূতন প্রতিষ্ঠা, কোন্ খাতে প্রবাহিত হ'চ্ছে

জাতীয়োন্নতির সঞ্জীবনী ধারা। মনের স্বাস্থ্যকে সুস্থ, চিত্তের কান্তিকে উজ্জ্বল এবং আত্মার শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে ভারতের একান্ত আপন যে সাধন সম্পদের ভান্ডার, তাঁরি দ্বার তিনি ক'রেছেন উন্মুক্ত। ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম পথেই নির্ভয়ে ক'রেছেন তিনি পরিক্রমা। গতানুগতিকতার আনুগত্য ক'রতে গিয়ে হননি তিনি আত্মঘাতী। শিক্ষিত সমাজ যখন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে ধর্ম এবং আচারের স্বদেশীয় রূপকে রক্ষা করা সংকীর্ণতা ব'লে মনে ক'রত; যখন তাঁরা মনে ক'রেছিল বিদেশীয় ইতিহাসের ফল ভারতীয় তরুশাখায় ফলিয়ে তোলা সম্ভব, তখন তিনিই একমাত্র সার্বভৌম এবং সর্বজনীন হিন্দুধর্ম ও আচারের স্বদেশীয় প্রকৃতিকে বিমিশ্রিত একাকারত্বের মাঝে বিসর্জন দিতে স্বীকার করেননি। সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে আমাদের সনাতন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি নীতিকে তিনি যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে নিয়ে বিশ্লেষণ ক'রেছেন তার যথার্থতা ও প্রয়োজনীয়তা। প্রচলিত অকল্যাণকর ভাবধারার বিরুদ্ধে সরব বিদ্রোহই যদি বিপ্লবীর লক্ষণ ব'লে নিরূপিত হয়, তাহ'লে ভূদেবও একজন আদর্শ বিপ্লবী। তখনকার আত্মবিস্মৃত শিক্ষিত সমাজের প্রচলিত চিন্তা ও কর্মধারার বিরুদ্ধে জীবনব্যাপী একক এবং অখন্ড সংগ্রামের দ্বারা ভূদেব প্রদর্শন ক'রেছেন বিপ্লবী জীবনের সার্থকতা। যদিও নাটকীয়ভাবে হঠাৎ রোমাঞ্চকর তিনি কিছুই ক'রে ব'সেননি। আত্মস্থ ও শিক্ষিত বাঙালীর মনের কাঠামো গঠনে তথা চরিত্র ও চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণে ভূদেবের প্রচারিত ভাব ও আদর্শ একটি বিরাট স্থান অধিকার ক'রে র'য়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীরা তো একরকম ভূদেবেরই মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। এমন কি, তাঁর অন্যতম প্রিয়বন্ধু, মনীষী রাজানারায়ণ বসুর মধ্যেও দেখি হিন্দু ব'লে গৌরববোধ। ডিরোজিও শিষ্য, এককালের যুক্তিবাদী ব্রাহ্ম, Young Bengal এই মনীষীই পরে মদ্যপানাদি সকল উচ্ছৃংখলতার নিবারণে আত্মনিয়োগ করেন। যে ব্রাহ্মদের একদল নিজেদের হিন্দু ব'লে অস্বীকার ক'রেছিলেন, তাঁদেরই অন্যতম মনীষী রাজনারায়ণ "হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা" প্রতিপাদনের জন্য বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ ক'রেছিলেন। ভূদেবের জীবনাদর্শ এবং আর্যোচিত আচার-নিষ্ঠার প্রভাব বন্ধুর মানসিক পরিবর্তনে কাজ ক'রেছে কিনা, ভাববার বিষয়। রাজনারায়ণবাবু ভূদেবের মত "কদাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ" —এই বাক্যটি সমর্থন ক'রতেন। ভূদেবেরই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে রাজনারায়ণবাবু তখনকার সমাজচিত্র অংকন ক'রতে গিয়ে লিখছেন—

"যখন আমরা শারীরিক বলবীর্য হারাইতেছি, যখন দেশীয় সুমহৎ সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রের চর্চা হ্রাস হইতেছে, যখন দেশীয় সাহিত্য ইংরেজী অনুকরণে পরিপূর্ণ, যখন দেশের শিক্ষাপ্রণালী এত অপকৃষ্ট যে, তদ্দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ না হইয়া, কেবল স্মৃতিশক্তির বিকাশ হইতেছে, যখন বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে না······যখন চতুর্দিকে পানদোষ, অসরলতা,

"স্বার্থপরতা ও সুখপ্রিয়তা প্রবল, যখন আমাদের রাজ্যসম্বন্ধীয় অবস্থা শোচনীয় বিশেষতঃ, যখন ধর্মের অবস্থা অত্যন্ত হীন, তখন গড়ে আমাদিগের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, তাহা মহাশয়েরা বিবেচনা করুন।" (আত্মচরিত, পৃঃ—১৩২) ঐই অবস্থা দেখেই ভূদেব "পুষ্পাঞ্জলি"র একাদশ অধ্যায়ের শেষের দিখে লিখছেন—

"কপিলদেবপ্রিয়া ন্যায়শাস্ত্র প্রসূতি, তন্ত্রশাস্ত্রজননী বঙ্গমাতা আর কতকাল আত্মবিস্মৃতা হইয়া নীচানুকরণরতা থাকিবেন ?"

ভূদেবের কৈশোরেই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রবল আক্রমণে বঙ্গভারতের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি বিধ্বস্তপ্রায়। শিক্ষিত সম্প্রদায় তখন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অন্তর্নিহিত আদর্শের কাছে যতটা না হোক্, তাদের বহিরঙ্গ রীতিনীতির কাছেই আত্মবিক্রয়ে উন্মুখ। আর, অনুকরণের জন্য চোখের সামনে তাঁরা বিখ্যাত ইংরেজ মনীষিদের পেতো না। প্রতিভা এবং বিদ্যার ঊনতার জন্য স্বদেশে ইংলণ্ডে যাদের ঠাঁই হয়নি, ভাগ্যান্বেষণে সাগরপাড়ি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বিবেকবুদ্ধি সততাকে জলাঞ্জলি দিয়ে ছলে-বলে-কৌশলে অর্থোপার্জন এবং ভোগবিলাসকেই জীবনের চরম কাম্য ব'লে মনে ক'রেছিল যারা, সেই সব আদর্শভ্রষ্ট চরিত্রহীন, পরজাতিবিদ্বেষী এবং মনুষ্যত্বশূন্য ইংরেজগুলোকেই বেশীরভাগ সামনে দেখতে পেতো। ডেভিড্ হেয়ার, উইলিয়াম জোন্স্, উইল্সন্, বেথুন, লং প্রভৃতি মনীষী ছিলেন তো অঙ্গুলিমেয়। শাসক সম্প্রদায় নতুন যে শিক্ষাধারা প্রবর্তন ক'রলেন, তা'তে আমাদের সনাতন সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হ'ল এক দিকে। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বে বৃটিশ শাসনের গোড়ার দিকেও বাংলা ও বিহারে একলক্ষ বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছেন স্যার উইলিয়াম এ্যাডাম তাঁর প্রথম রিপোর্টে। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অনাদর অবহেলা ও প্রতিকূলতায় ঐ পুরাণো ধরণের বিদ্যালয়গুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল। অথচ তার স্থানে সেই সংখ্যায় ইংরেজী বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হ'ল না। ফলে, শিক্ষা হ'ল সংকুচিত। অধিকাংশ লোক শিক্ষার আশীর্বাদ হ'তে বঞ্চিত হ'ল। আরেক দিকে, যে নগণ্যসংখ্যক তরুণ নানা অসুবিধা অতিক্রম ক'রে এই নিতান্ত বিদেশী, বিজাতীয় শিক্ষা গ্রহণ ক'রতে লাগলো, তাদেরো আত্মবিস্মৃতির পথটি হ'ল প্রশস্ত। এই দেশের মাটির সঙ্গে তার নেই কোন সংযোগ। ফলে, শিক্ষিত লোক হারিয়ে ফেললো তার দেশদেখা-চোখ। মানুষকে জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত করার পরিবর্তে শাসনকার্যের নিম্নপদস্থ কর্মচারী করার যোগ্যতা জন্মানোই ছিল এই শিক্ষার মুখ্য লক্ষ্য। গৌণ লক্ষ্য ছিল পাশ্চাত্ত্য বিদ্যায় দীক্ষিত ও শিক্ষিত ক'রে তুলে নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্মবোধ ভুলিয়ে দেওয়া। তাই, ভারতের ইতিহাস, ভারতের ভাষার কোন স্থানই রইল না নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায়। সামঞ্জস্যহীন, অদ্ভুত শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাজনীতির শিক্ষায় বাঙালী যেমন

হ'য়েছিল নতুন আশার উদ্দীপ্ত ও নবীন মোহে মুগ্ধ তেমনি নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতারজন্য ক্রমশ হারিয়ে ফেলছিল আত্মবিশ্বাস এবং চিন্তার স্বাধীনতা। আরো আশ্চর্যের বিষয়, তাঁরা মনে ক'রতেন, এইভাবে পরানুকরণ এবং আত্মবিস্মৃতির দ্বারাই দেশোন্নতি সাধন এবং দেশসেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ক'রছেন তাঁরা। ক্রান্তদর্শী রবীন্দ্রনাথ এই অবস্থা পর্যালোচনা ক'রে বলছেন—

"মাতালের পক্ষে মদ্য যেরূপ খাদ্যের অপেক্ষা প্রিয় হয়, আমাদের পক্ষেও দেশহিতৈষণার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড়ো হইয়া উঠিয়াছিল। যে দেশ প্রত্যক্ষ, তাহার ভাষাকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান করিয়া, তাহার সুখ-দুঃখকে নিজের জীবনযাত্রা হইতে বহুদূরে রাখিয়াও আমরা দেশহিতৈষী সাজিতেছিলাম।"

ফলে, নিজের জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা আত্মলাঘবপূর্ণ ধারণায় (inferiority complex) পরিচালিত হ'য়ে অধিকাংশ ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী তখন পরিণত হ'য়েছিল সংস্কৃতিগত দাসে, যাকে ইংরেজীতে বলা চলে cultural slaves। সত্যকার মনুষ্যত্ব অর্জন এবং জাতীয়োন্নতির পথে এই সাংস্কৃতিক পরাধীনতা একটি অন্তরায় বিশেষ এবং রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার চেয়েও অধিকতর ক্ষতিকর। তাই, ভারতীয় হিন্দুর মত একটি সুসভ্য ও সমুন্নত জাতির যুবকেরা সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য ক'রতে না পেরে মেরুদণ্ডহীন হ'য়ে আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক আত্মহত্যার দিকে তখন ছুটে চলছিল। ইংরেজী শিক্ষার কাটাখালে বহুমূল্য পণ্যসম্ভারের সঙ্গে সঙ্গে কুমীরও সেদিন হানা দিয়েছিল বাঙালীর মনের ঘাটে। সেই হিংস্র কুমীরের দংশনক্ষত আজ স্বাধীনতার পরেও আমাদের সমাজদেহ হ'তে সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যায়নি। একমাত্র ভূদেবই তখন আমাদের পরম্পরাগত সভ্যতার অনুশীলন ও সমাজগত নৈষ্ঠিকতাকে আশ্রয় ক'রে ছিলেন ব'লে বাহিরাগত এই ভাববন্যায় অবগাহন ক'রেও কুলভ্রষ্ট হননি। প্রবল বন্যার প্রতিকূলে প্রত্যক্ষভাবে দাঁড়ালে ঐরাবতও বানের মুখে তৃণের মত ভেসে যায়। কিন্তু নানা খাল কেটে সুকৌশলে সেই উপচে-পড়া জলকে যদি নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তবে এই বন্যা অভিশাপের পরিবর্তে আশীর্বাদেই রূপান্তরিত হয়। ভূদেব পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাকে দূরে হ'তে পরিহার করেননি। সনাতন ধর্মের দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে এই নতুন ভাবধারার দূষিত অংশকে পরিহার ক'রে তার কল্যাণময় অংশকে ক'রেছেন গ্রহণ। তাতেই তাঁর জীবনে এবং কর্মে এই সুন্দর সুসমঞ্জস পরিণতি। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি লাভ ক'রেছেন প্রাচ্যের অতীত সাধনা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা। আর, প্রতীচির শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকগণের সঙ্গে পরিচিতি তাঁকে ক'রেছে কঠোর যুক্তিবাদী। ফলে, শ্রদ্ধা, মনীষা এবং দেশপ্রীতির ত্রিধারায় তাঁর মানসভূমি হ'য়েছে পরিষিক্ত। ভারতবর্ষে মোগলদের হাতে পাঠানদের পরাজয়ের একটি কারণ হচ্ছে যে

মোগলরাই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে যুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে। পাঠানদের অস্ত্র ছিল গতানুগতিক লাঠি, তরবারি, বল্লম, বর্শা প্রভৃতি। ফলে, হ'ল পরাজয়। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু যে অস্ত্র ব্যবহার করছে, জয়েপ্সুকে সেই অস্ত্রেও হ'তে হবে সজ্জিত। এই তত্ত্বটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন ভূদেব উপলব্ধি ক'রেছিলেন। তাই, পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রামশীল ভূদেব প্রতীচ্য বিদ্যায়ও ছিলেন পারঙ্গম এবং প্রতীচীর উৎসাহ, অনুসন্ধিৎসা, কর্মক্ষমতা এবং আত্মমর্যাদাবোধ প্রভৃতি বিবিধ সদগুণে ছিলেন বিভূষিত।

তাঁর জীবনবিকাশের মূলে ছিল ঋষিকল্প পিতার দৃঢ়তা, ঔদার্য, পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষাদান প্রণালী। নতুন যুগের হাওয়া তাঁরও জীবনে ভাবান্তর এনেছিল, যার ফলে সামান্য একটি কারণে সনাতন সংস্কৃতশিক্ষা ছেড়ে ইংরেজী স্কুলে তিনি জোর ক'রে পড়তে গেলেন। কিন্তু বংশমর্যাদাবোধ এবং পিতার চরিত্রের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিই তাঁকে অনেকটা রক্ষা ক'রেছিল। সৎপুত্র শুধুমাত্র পিতার ঐহিক সম্পদেরই উত্তরাধিকার লাভ করেন না, তাঁর গুণরাজিও লাভ করেন। প্রাপ্ত এবং অর্জিত কুলশীলের প্রভাবেই মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণের ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শ উপযুক্ত পুত্র ভূদেবের জীবনে সঞ্চারিত হয়েছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষায়—"পূর্যতে পিতুঃ প্রার্থনা ইতি পুত্রঃ"—পিতার প্রার্থনা যে পূরণ করে সেই তো পুত্র। ভূদেবও তাই। কালিদাসের কথায় বলা চলে "প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ"। বৈদিক যুগ হ'তে আজ পর্যন্ত কালে কালে বিভিন্ন রূপে বিদ্যমান ব্রহ্মণ্যের ভাবধারার মধ্যেই নিহিত হ'য়ে আছে ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনা ও নৈতিক আদর্শ। এই সাধনা এবং আদর্শের প্রভাবে ভারত একদিন নিখিল বিশ্বে উন্নতশীর্ষে দাঁড়িয়েছিল। ভূদেব নিজের জীবনে এই ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শই সম্যগ্‌ভাবে প্রতিফলিত ক'রেছেন এবং সমাজকেও প্রদর্শন ক'রেছেন কল্যাণের প্রকৃষ্টপন্থা। আধুনিককালে ইংরেজী শিক্ষিত, চাকুরীজীবি হিন্দুর গার্হস্থ্যজীবনে এই প্রাচীন আদর্শ কিভাবে প্রতিপালিত হ'তে পারে, তারি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হ'ল ভূদেবের শুচিসুন্দর জীবন। তিনি নিজেই শুধু ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহীর আদর্শ জীবন যাপন করেননি, সকল পরিজনকেও এই পথে পরিচালিত ক'রেছেন। এইখানেও রয়েছে তাঁর অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। চিন্তায় ও কর্মে এমন ঐক্য বড়ই দুর্লভ।

বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে ভূদেব বহুবিষয়ে পথিকৃৎ। সাহিত্যের দুইটি ধারা, গদ্য ও পদ্য। গদ্যসাহিত্যের দিগন্তপ্রসারী উন্মুক্ত নভোদেশে চ'লেছে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার। গদ্যরচনার ক্ষেত্রে ভূদেব আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। গীতিপ্রবণ বাঙ্গালীচিত্ত গদ্যকেও ভাবাভিশয্যে এবং অলংকার বাহুল্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কাব্যলক্ষণাক্রান্ত ক'রে তুলেছে। সত্যিকারের গদ্য হ'চ্ছে যুক্তির ভাষা—Language of reason। ভূদেবের রচনা পরিত্যাগ ক'রলে যুক্তি-

ধর্মী গদ্য বাংলাভাষার অপ্রতুল বললেও চলে। সামাজিক প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, বিবিধ প্রবন্ধ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি যে গদ্য রচনাশৈলীর প্রবর্তন ক'রেছেন, বাংলাভাষার তা এক পরম ঐশ্বর্য ব'ললে অত্যুক্তি করা হয় না। বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এত প্রবন্ধ বাংলায় বোধহয় আর কেউ রচনা করেননি। তাঁর রচনায় ভাষা স্পষ্ট, প্রাঞ্জল এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট, তাই, আদর্শ গদ্য। কেবল প্রকাশের এবং মননের গম্ভীরতায়, বিষয়বস্তুর গুরুত্বে ও নূতনত্বে ভূদেবের প্রবন্ধাবলী আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠনীয়। রয়াল্ এসিয়াটিক্ সোসাইটির ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক অধিবেশনে Sir Charles Elliot তাঁর "সামাজিক প্রবন্ধের" সমালোচনাকালে যা ব'লেছিলেন, তা বিশেষ ক'রে অনুধাবনযোগ্য।—

"Not a single volume in India contains so much wisdom and none shows such extensive reading. It is the result of the life-long study of a Brahmin of the old class in the formation of whose mind the eastern and western philosophy have had an equal share." (ভূ. চ-৩য়—৩৭৪)

প্রবন্ধের গোড়ার দিকে ভূদেবকে সত্যিকারের বুদ্ধিজীবিরূপে নির্দেশ করে তাঁর priestly functions এর উল্লেখ ক'রেছি। সমাজের সর্বাগ্রে সর্ববিধ হিতসাধন যিনি করেন তিনিই যথার্থ পুরোহিত। সমগ্র সাহিত্যসাধনায় এই পৌরোহিত্য কৃত্য যথাযথভাবে সম্পাদন ক'রেছেন ভূদেব। সূক্ষ্মদর্শী, স্থিতধী, তপঃশক্তিসম্পন্ন স্মার্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিধান অনুসারে একসময় আমাদের সমাজ এবং ব্যক্তিজীবন নিয়ন্ত্রিত হ'ত। সমাজশাস্ত্রী ভূদেব তাঁর "সামাজিক প্রবন্ধ", "পারিবারিক প্রবন্ধ", ও "আচার প্রবন্ধ" নামক গ্রন্থত্রয়ের দ্বারা নতুন পথে চলার বিধিনির্দেশ অতি সুন্দরভাবে দিয়েছেন। আমাদের সমাজ-বিজ্ঞানের ওপর এইরকম গ্রন্থ বাংলার আর একটিও রচিত হয়নি। তাঁর "সামাজিক প্রবন্ধ" নিয়ে পরবর্তীকালের সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক চিন্তানায়ক স্বর্গীয় বিনয়কুমার সরকার বলছেন—

"এই বইটা (সামাজিক প্রবন্ধ) বেশ কিছু বড় বইও বটে। তা'ছাড়া এটা সাময়িক ও অসংলগ্ন প্রবন্ধাবলীর সংগ্রহ পুস্তক নয়। চিন্তাগুলো পর পর গ'ড়ে উঠেছে। কোথাও আলোচ্য বিষয়ের ফাঁক চোখে পড়ে না। দশাননী চোখ নিয়ে ভূদেব এই বই রচনা করেছিলেন। খাপছাড়াভাবে কতকগুলো ভালো কথা খণ্ডন করা ভূদেবের মতলব ছিল না। একখানা ষোলোকলায় পরিপূর্ণ সমাজশাস্ত্রবিষয়ক বই খাড়া করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'য়েছেও। এই বইএর জুড়িদার বা পরিপূরক আর দুখানা বই তিনি লিখেছেন। একটা "পারিবারিক প্রবন্ধ", আর একটা "আচার প্রবন্ধ"। এই দুটিও সর্বাঙ্গসুন্দর

ষোলোকলায় পরিপূর্ণ বই। তিনখানা বই একত্রে দেখলে সমাজদার্শনিক ভূদেবকে দুনিয়ার সমাজশাস্ত্রীরা খুব উঁচু ঠাঁই দিতে বাধ্য হবে।... বই হিসাবে "সামাজিক প্রবন্ধ" বাঙালী মগজের অপূর্ব সৃষ্টি। বঙ্গ সাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল রত্নরূপে এর বিস্ময় দিন দিন বেড়ে চ'লবে।" ('বিনয় সরকারের বৈঠকে'—২য়-৬৮) চূড়ান্ত প্রগতিবাদী এই মনীষীই সনাতনী ভূদেবের চরিত্র বিশ্লেষণে শ্রদ্ধাসহকারে বলছেন—

"এক কথায় বলি ভূদেব চৌকোস লোক। স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠায় তাঁর নজর ছিল। বিদেশে লোক পাঠিয়ে আধুনিক কলকব্জা ও যন্ত্রপাতিতে আর কলাবিজ্ঞানে ওস্তাদ তৈরী করানো তাঁর পাঁতির অন্তর্গত। অথচ লোকটা চরমভাবে "সনাতনী" গোঁড়া হিন্দু।...সামাজিক প্রবন্ধ আজও যুবক বাংলার পড়বার উপযুক্ত বই। এটা ক্লাসিকভাবে শিকেয় তুলে রাখা উচিত নয়।... ভূদেবের সঙ্গে আমার প্রাণে প্রাণে মিল আছে। তাঁকে আমি খাঁটি স্বদেশ-সেবক, স্বাধীনতার পূজারী, স্বরাজসাধক বিবেচনা করি। ভূদেব চিরকাল আমার প্রণম্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে কোন বাঙালীর পক্ষে যতদূর চরমপন্থী হওয়া সম্ভব ভূদেব প্রায় ততদূরে গিয়েছিলেন। বিবেকানন্দকেও আমি ভূদেবের কোঠায় ফেলি। সেই যুগের কোন বঙ্গ সন্তানকে এই দুজনের চেয়ে বড় বিবেচনা করা আজও আমার পক্ষে অসম্ভব। এই দুজনই আমার সমানভাবে পূজাস্থান।" ('বিনয় সরকারের বৈঠকে'—২য়—৬৮)

বাংলা ভাষায় গণিত এবং বিজ্ঞানের ওপর গ্রন্থরচনাও তিনিই প্রথম করেন। আধুনিক জড়বিজ্ঞান নিয়ে তাঁর প্রাঞ্জল গ্রন্থ "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের" ১ম ভাগ ১৮৫৮ সনে এবং ২য় ভাগ ১৮৫৯ সনে প্রকাশিত হয়। জ্যামিতির ওপর ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রকাশ করেন ১৮৬২ সনে।

সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস ছিল তাঁর নখদর্পণে। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি এবং জনপদের ইতিহাস নিয়ে তিনি রচনা করেন 'পুরাবৃত্তসার,' (১৮৫৮)। এ ছাড়া "ইংলণ্ডের ইতিহাস" (১৮৬২), "রোমের ইতিহাস" (১৮৬৩), বাংলার ইতিহাস ৩য় ভাগ" (১৯০৪) প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর ইতিহাস সচেতনতার সাক্ষ্য বহন ক'রে চলেছে। তাঁর মতে, "ভারতবর্ষের ইতিহাস দুটি পাপের ইতিহাস। একটি স্বজাতি বিদ্বেষ এবং অপরটি স্বধর্ম-বিদ্বেষ। তারই প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য ভগবান পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে স্বজাতিপ্রেমিক ইংরেজ এবং সবচেয়ে স্বধর্মপ্রেমিক মুসলমান জাতিকে ভারতের শাসকরূপে পাঠিয়েছেন।"

শিক্ষকদের জন্য তিনি রচনা করেন "শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব" (১৮৫৬)। "বিবিধ প্রবন্ধ" ১ম ভাগ ও ২য় ভাগে (১৮৯৫, ১৯০৫) প্রাচীন সাহিত্যের সমালোচনায় এবং আরো বহু বিচিত্র বিষয়ে তাঁর মনীষা এবং রসগ্রাহিতা পরিস্ফুট হ'য়ে আছে।

তাঁর "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" (১৮৯৫) "পুষ্পাঞ্জলি" (১৮৭৬)

এবং "ঐতিহাসিক উপন্যাসে" (১৮৫৭) ঔপন্যাসিক এবং সৃজনশীল সাহিত্যিক ভূদেবের কল্পনার প্রসারতায়, রসসৃষ্টির ক্ষমতায়, বর্ণনার নৈপুণ্যে এবং প্রকাশের মাধুর্যে বিস্মিত হ'তে হয়। পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুকরণে নির্লজ্জ কামায়নের অভিব্যক্তিতে তাঁর সাহিত্য কলুষিত হয়নি ব'লে তাঁর সাহিত্য-স্রোতস্বিনীতে অবগাহন করলে গঙ্গাস্নানের পবিত্রতা দেহ মনে সঞ্চারিত হয়। তাঁর পুণ্যকর্মরত অবসরবিহীন জীবনে নিছক সাহিত্য সাধনার অবকাশ সীমিত থাকায় এবং বহুবিধ ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ে জাতীয় গুরুরূপে জ্ঞান অর্জন ও বিতরণে ব্যস্ত থাকায় রসসাহিত্যের ক্ষেত্রে মাত্র সামান্য কয়েকটি অবদান তিনি রেখে গেলেও উৎকর্ষে তারা কিন্তু অসামান্য। এই গ্রন্থগুলো অনন্তকাল ধ'রে তাঁর সাহিত্য-সাধনার ধারাকে সঞ্জীবিত রাখবে। বাংলার তদানীন্তন কালের সাহিত্যিকগোষ্ঠীর যূথপতি ছিলেন ভূদেব। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের তিনি ছিলেন ভাবগুরু। ভূদেবের "ঐতিহাসিক উপন্যাসের" (১৮৫৭) আদর্শেই বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী" (১৮৬৫)। জন্মভূমির দেশমাতৃকারূপ-কল্পনা প্রথম ক'রেছিলেন ভূদেবই। "পুষ্পাঞ্জলিতে" (১৮৭৬) জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী "অধিভারতী"কে অন্নদানরতা অন্নপূর্ণার মূর্তিতে সার্থক তন্ত্রসাধক ভূদেব দিব্যদৃষ্টিতে দেখছেন এবং স্তুত ক'রছেন—

"মাতর্নমামি ভবতীং সতীদেহরূপাম্
মাতর্নমামি বসুধাতল পুণ্যতীর্থাম্।
মাতর্নমামি পদযুগ্মধৃতসমুদ্রাম্
মাতর্নমামি হিমগৌরকিরীটভূষাম্॥" (হিন্দুকণ্ঠহার)

"হেমাভা হরিদম্বরা পদতলে নীলাম্বুলীলাপ্লুতা,
স্নিগ্ধা স্নিগ্ধতরঙ্গিণী সুরধুনী পীযূষনিঃষ্যন্দিনী।
সূর্যেন্দু-প্রতিবিম্বিতাম্বরলসৎ প্রালেয়-মৌলিজ্বলা
সৌম্যা স্যা"দধিভারতী" ভয়হরা নিত্যান্নদা শান্তয়ে॥" (পুষ্পাঞ্জলি)

এই স্তোত্রেই রয়েছে "বন্দে মাতরম্" সংগীতের বীজ। ভূদেবের দিনলিপি পাঠে জানা যায় "বন্দে মাতরম্" সংগীত রচনা ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র মন্ত্রগুরু ভূদেবকেই দেখতে দেন। ভূদেবের উপদেশানুসারে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত রূপটিকেই আমরা বর্তমানে প্রচলিত দেখি। দেশমাতৃকার এই জগজ্জননীরূপ ভাবনার পশ্চাতে রয়েছে ভারতের চিরন্তন চেতনা—

"সর্বপ্রসূর্জন্মভূমিঃ জননী গৌঃ পয়স্বিনী।
মহাশক্তের্জগন্মাতুঃ প্রতিরূপা সুশোভনা॥"

ভূদেব ছিলেন তখনকার সকল সাহিত্যিকের কল্যাণগুরু। নীলদর্পণকার ৺দীনবন্ধু মিত্র "সুরধনী কাব্যে লিখছেন—

"সুভব্য ভূদেব বিজ্ঞ পণ্ডিত সুজন।
গুরুমহাশয়-গুরু শুভ দরশন॥

বঙ্গদেশে সাহিত্যের উন্নতি সাধক।
কাটিছেন সযতনে অজ্ঞান-কণ্টক॥"

হেমচন্দ্রেরও স্বদেশপ্রীতির মূলে এই ভূদেব। কাশীধামে ভূদেবপুত্র মুকুন্দদেবকে হেমচন্দ্র ব'লেছিলেন—

"তোমার বাবাই আমার জীবনের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহিত সংসর্গে এবং তাঁহার ফরমাইসেই 'ভারত সংগীত" এবং "ভারত বিলাপ"।" ("ভূদেব চরিত'—২য় খণ্ড—৩১২) বাল্যবন্ধু মাইকেল মধুসূদন তাঁর "হেক্টর বধ" কাব্য উৎসর্গ ক'রলেন সতীর্থ এবং সুরসিক সাহিত্যিক ভূদেবকে। তাঁর উৎসর্গপত্রে মাইকেল ভূদেবকে উদ্দেশ্য ক'রে লিখছেন—

"এই বঙ্গদেশে যে তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম, তাহার কোনই সন্দেহ নাই কেননা, তোমার পরিশ্রমে মাতৃভাষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। পরমেশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, এই প্রার্থনা করি। যে শিলায়, তুমি, ভাই, কীর্তিস্তম্ভ নির্মিতেছ তাহা কালও বিনষ্ট করিতে অক্ষম।"

বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল. রামগতি ন্যায়রত্ন প্রমুখ তৎকালীন সাহিত্যিকবৃন্দ ভূদেবের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত। চুঁচুড়ায় 'ভূদেব ভবনের" গঙ্গাতীরের অলিন্দটি বাংলার তৎকালীন সাহিত্যিক-বৃন্দের কলকণ্ঠে মুখরিত থাকতো। ভূদেব থাকতেন তাঁদের মধ্যমণি হ'য়ে। ভূদেবকে তাঁরা মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় সম্মান ক'রতেন।

বাংলাভাষায় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তিনি অন্যতম পুরোধা। জন-সাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও সংবাদ পরিবেশনের জন্য তিনি ১২৭১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে "শিক্ষা দর্পণ ও সংবাদসার" নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। তাঁর ঋষিকল্প পিতৃদেব বিশ্বনাথ তর্কভূষণের বাল্মীকি রামায়ণের অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা এবং তাঁর স্বলিখিত বাংলার ইতিহাসের কিছুটা অংশ এই পত্রে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া অন্য সব লেখাও প্রায় তাঁকেই লিখতে হ'ত। ১২৭৫ বাংলার মাঘ মাস পর্যন্ত এই পত্রটি প্রকাশিত হ'য়েছিল।

"এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ" ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর হ'তে তিনি সম্পাদনা করতে আরম্ভ করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে "বঙ্গদর্শন" ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সত্য সংবাদ ও সমুন্নত সাহিত্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক ঐতিহ্য সৃষ্টি ক'রলেন। নিজে পদস্থ সরকারী কর্মচারী হ'য়েও সরকারী আওতা থেকে মুক্ত ক'রে পত্রিকাটিকে তিনি নিজের ক'রে নিয়ে স্বাধীন মতামত প্রকাশের যোগ্য ক'রে তুললেন। সরকারী বেসরকারী নানাবিধ সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান, বাণিজ্য, দর্শন, শিল্প, মৌলিক সাহিত্য ও সাহিত্য-সমালোচনা নিয়ে এক "বঙ্গদর্শন" ছাড়া আর কোন পত্রিকাই "এডুকেশন

গেজেটের" সমপর্যায়ে উন্নীত হ'তে পারেনি। সত্য সংবাদ পরিবেশনে তিনি যে নিরপেক্ষতার আদর্শ অনুসরণ ক'রেছিলেন, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সর্বকালে সর্বদেশে তাই একমাত্র আদর্শ হওয়া উচিত। "এডুকেশন গেজেটের" ১ম সংখ্যাতেই তিনি লিখেছিলেন—

"কোন মত, কোন দল, কোন পক্ষ, অবলম্বন করার আমাদিগের ইচ্ছা নাই। সকল মতেই, সকল দলেই, সকল পক্ষেই, কিছু সত্য কিছু মিথ্যা থাকে কিছুতেই সত্য অথবা মিথ্যা সম্পূর্ণ অমিশ্রভাবে থাকে না। আমরা সত্যের দিকেই থাকিতে চেষ্টা করিব অসত্য ভিন্ন আর কিছুরই ভয় করিব না—কারণ আশৈশব আমাদিগের এই বাক্যে বিশ্বাস আছে 'সত্যমেব জয়তে'।"

উপনিষদের এই মহাবাক্যটিই যুগান্তরে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের আদর্শ রূপে গৃহীত হ'য়েছে, যদিও তার সার্থকতা কতটুকু রক্ষিত হ'চ্ছে ভাববার বিষয়। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হ'য়েও সরকারের বহু কর্মের তীব্র সমালোচনা তিনি এই পত্রে ক'রেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃত ও বাংলা-ভাষার যথাযোগ্য স্থান দানের জন্য তিনি ঐ পত্রে যথেষ্ট আলোচনা করেন। প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতের সরকারী শিক্ষা পরিচালনার গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে বহন করে এইরকম একটি সমুন্নত পত্রিকা-সম্পাদনা এবং নিত্যই নানা বিষয়ে অধ্যয়ন কী ক'রে তিনি করতেন ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। "আনন্দ" এই ছদ্মনামে তন্ত্রশাস্ত্র নিয়ে দীর্ঘকাল ধ'রে তিনি এই পত্রে সুগভীর আলোচনা করেন। তদুপরি ব্যবস্থা পরিষদের সক্রিয় ও প্রভাবশালী সদস্যরূপেও তখন তিনি কাজ ক'রে চ'লেছেন। দেশী বিদেশী, শাসক ও শাসিত সবাই তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ক'রতেন এবং তাঁর মতামত জানবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন। মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭।১।৯০ তারিখে ভূদেববাবুকে এক পত্রে লিখছেন —"···আপনার অভিপ্রায় কিরূপ, তাহা জানিবার জন্য আমি অতিশয় ব্যগ্র, যেহেতু আপনার দুই এক কথা একশো লোকের একশো কথা অপেক্ষা মূল্যে হিসাবে বড়।" ('ভূদেব চরিত' ৩য়—২৮১)

ইংরেজী রচনার ক্ষেত্রেতো তিনি একরকম অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর মত ইংরেজী রিপোর্ট রচনা সেকালে আর কেউ করেননি। সরকারী শিক্ষা সম্বন্ধে তৎকালীন যত রিপোর্ট স্বনামে এবং বেনামে সবই প্রায় ভূদেবের লেখনীপ্রসূত। অন্যান্য অনেকে এই বিষয়ে ভূদেবেরই শরণাপন্ন হতেন। এই স্বাজাত্যাভিমানী সনাতনী ব্রাহ্মণের সঙ্গে পদস্থ ইংরেজদের যে রকম মধুর এবং শ্রদ্ধার সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল, সেই রকম আর কোন ভারতীয়ের হ'য়েছে কিনা, ভাববার বিষয়। আরো নানা কারণের সঙ্গে তাঁর পরিণত ইংরেজী বিদ্যাও হয়তো এর মূলে কাজ ক'রেছে কিছুটা।

সংস্কৃত রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বার্ধক্যে পুত্রদের সঙ্গে তাঁর

সংস্কৃতেই পত্রালাপ হ'ত। পৌত্রাদির ক্রীড়াকৌতুক প্রভৃতি দৈনন্দিন আটপৌরে বিষয় নিয়েও সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক রচনা ক'রে তিনি পুত্রদের সঙ্গে সাংসারিক সংবাদাদির আদান-প্রদান ক'রতেন। শ্রীযুত রামস্বামী প্রভৃতি মনীষীর সঙ্গে সংস্কৃতেই তাঁর বহুবিধ বিষয়ে পত্রালাপ চ'লত। "ভূদেব চরিতের" ৩য় ভাগের শেষের দিকে প্রকাশিত ভূদেবরচিত বহু সংস্কৃত চিঠি-পত্রের রচনাসৌকর্য দেখে মনে হয় দেবভাষা দেবোপম ভূদেবের "বশ্যোবানু-বর্ত্ততে"। বারাণসীধামে আনন্দবাগে স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতীর যে প্রস্তর মূর্তি নিত্যপূজিত হয়, তার নীচে খোদিত ভূদেবেরই রচিত অপূর্ব শ্লোকটি তাঁর সংস্কৃত রচনাশক্তির সাক্ষ্য আজও বহন ক'রে চ'লেছে।—

"জাতো ব্রহ্মকুলে স্বতোহি পবিতঃ পূতঃ পুনর্বিদ্যয়া
জ্ঞানেন জ্বলিতস্তপোভির্রুদিতো ব্রাহ্মং মহো মূর্তিমৎ।
ভিত্ত্বা সন্তমসং প্রবোধ্য জগতীমানন্দয়ন্ প্রাণিনো
জ্ঞানপ্রেমময়োর্কচন্দ্র মিলিতঃ শ্রীভাস্করানন্দকঃ।"

শ্লোকটি ভূদেবের সম্বন্ধেও সার্থকভাবে প্রয়োগ করা চলে।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ভূদেবের সারস্বত সাধনা নিছক কল্পনাবিলাস বা আত্মসন্তুষ্টিতেই পর্যবসিত হয়নি। তাঁর সাহিত্যসাধনা নিয়োজিত হ'য়েছিল ভারতীয় আলংকারিকের ভাষায় "শিবেতরক্ষতয়ে"—অর্থাৎ অকল্যাণের বিনাশে।

আজীবন শিক্ষাব্রতী ভূদেবের শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ অবিস্মরণীয়। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম এবং পাঞ্জাবের বহুস্থানে বিদ্যালয় স্থাপনাদির জন্য তাঁর প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার উপযুক্ত পদ্ধতিনিরূপণেও ছিল তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য। শিক্ষাদান কার্যেও তাঁর কুশলতা অপরিমেয়। রাজকার্য উপলক্ষ্যেও শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা আদর্শ ব্রাহ্মণের মত দেশের হিত-সাধনেই তিনি নিরত ছিলেন। বিশেষতঃ, সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃত ও সনাতন শিক্ষা প্রচারের জন্য এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সন্তান আজীবনসঞ্চিত, স্বোপার্জিত একলক্ষ ষাটহাজার টাকা উৎসর্গ ক'রে যান। চুঁচুড়াতে পিতার নামে "বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী" নামক দাতব্য সংস্কৃত শিক্ষায়তন, এবং মাতার নামে "ব্রহ্মময়ী ভৈষজ্যালয়" নামে দাতব্য আয়ুর্বেদীয় ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। সারা ভারতের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও ছাত্রদের "বিশ্বনাথ বৃত্তি" দিয়ে সংস্কৃত পঠন-পাঠনে সহায়তা করার ব্যবস্থা করেন তিনি। এই সব দেখে তাঁকে যুগান্তরের দধীচি নামে আখ্যাত ক'রতে ইচ্ছে হয়। বিলাসিতা এবং স্বাচ্ছন্দ্যাদি বর্জন ক'রে কঠোর শ্রমে স্বোপার্জিত অর্থের এইভাবে সদ্ব্যয় সত্যি বিরল। দানের অহমিকা এবং নামের মোহ তাঁর কোনদিনই ছিল না। তাঁর মৃত্যুর চল্লিশ বৎসরের মধ্যে কোন স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান না করার জন্য তাঁর ছিল কঠোর নির্দেশ। যখন বেঁচে-থাকা-কালেই

স্বনামে এবং বেনামে নিজের জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান ক'রে বশংবদ ব্যক্তিদের দ্বারা নিজের কল্পিত মাহাত্ম্য উদ্‌ঘাটনে এবং প্রচারণে সামান্য প্রতিভা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও বিশেষভাবে উদগ্র হ'য়ে উঠেন, তখন ভূদেবের এই অপূর্ব আত্মপ্রচারবিমুখতা সমাজের এই অশোভন লালসাকে ধিক্কার দিচ্ছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে পরিজন পরিবৃত হ'য়ে ঈপ্সিত গঙ্গাতীরে ভীষ্মের মতই তিনি দেহরক্ষা করেন।

আত্মবিস্মৃত, লঘুচরিত্র, তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ আজ ভূদেবকে ভুলে যেতে ব'সেছে। আবার কেউ কেউ তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব, চিন্তা ও সাধনা সম্যগ্‌ভাগে অনুধাবন না করে তাঁকে প্রগতিবিমুখ ব'লে উপহাস করার অশোভন স্পর্ধাও প্রকাশ ক'রে থাকেন। মহাপুরুষকে না জানা অন্যায়; ভুল ক'রে জানা ততোধিক অন্যায়। ভূদেব প্রতিটি বিষয়কেই যুক্তির কষ্টিপাথরে ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ক'রে গ্রহণ বা বর্জন ক'রেছেন। উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পথে উদ্‌ভ্রান্ত পদক্ষেপ তিনি করেন্‌নি, কিংবা ভাবালুতার নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশে মোহগর্তেও তিনি কখনো পতিত হননি, অথবা ভাবপ্রবণতার আতিশয্যে চমকপ্রদ হঠকারিতাও কিছু ক'রে বসেননি। বিধবা-বিবাহ সমর্থন না করার জন্য কেউ কেউ তাঁকে দোষারোপ ক'রে থাকেন। ভাবপ্রবণ দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর মশাই যুক্তি এবং দূরপ্রসারী দৃষ্টির পরিবর্তে বেশী ক'রে দয়া-দাক্ষিণ্যাদি কারুণ্যের বশবর্তী হ'য়েই এই যুগান্তকারী আন্দোলনে নেমেছিলেন। ভারতীয় বিবাহের সমুচ্চ আদর্শ, নারীত্বের মহনীয় মাহাত্ম্য, দম্পতীর জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ প্রভৃতির কথা ভেবে ভূদেব বিধবাবিবাহকে আইনসিদ্ধ ক'রতে রাজী ছিলেন না। তিনি প্রসারিত ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে দেখেছিলেন পৃথিবীর কোন দেশেই, কোন সমাজেই এইটি প্রশংসনীয় কাজ ব'লে মনে করা হয় না! ত্যাগের মহনীয় আদর্শের অভাবে অন্য সমাজে এই ব্যবস্থা কিছুটা প্রচলিত আছে এবং আমাদের দেশেও নিম্নতম সমাজে এর প্রচলন র'য়েছে। তার জন্য আইনের প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে চিন্তাশীল উচ্চতর সমাজে এই ঘটনা স্থায়ী সমর্থন কখনো পাবে না। আজ, অনেকদিন পরেও বহুবিধ প্রগতিসত্ত্বেও ভারতীয় সমাজে কেউ এই ব্যাপারকে এখনো সম্মানজনক এবং মর্যাদাবর্ধক মনে করেন না এবং সাধারণ-ভাবে গ্রহণও করেন না। শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁর "কেশব চরিত" এ লিখলেন যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও বিধবা-বিবাহ পছন্দ ক'রতেন না।—

"Devendra, however could never reconcile himself to the idea of marrying widow.... Widow's marriage was to him a disagreeable thing."

তেজস্বী, প্রগতিবাদী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দও এই ব্যাপারটিকে সমর্থন করতে পারেন্‌নি। একান্ত পতিব্রতা সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীকেই ভারতীয়

নারীদের চিরন্তন আদর্শরূপে স্বামীজী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলছেন—

"I am asked again and again, what I think of the woman question ?···Who are you to solve woman's problems ? Are you the Lord God that you should rule over every widow and every woman ? Hands off ! They will solve their own problems.„ স্বামীজী আরো বলছেন, "কোন জাতির উন্নতি যদি সেই জাতির বিধবাদের স্বামীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে, তবে সেরূপ উন্নতিশীল জাতি আমি এখনো দেখিনি"—

"It the prosperity of a nation is to be gauzed by the number of husbands its widows get I am yet to see such a prosperous nation."

স্বামীজীর মানসকন্যা, বিদেশিনী বিদুষী, ভারতমাতার কৃতকপুত্রী ভগিনী নিবেদিতা নারীপ্রগতি সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের সীতা-সাবিত্রীকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেন। বিধবা-বিবাহ এবং পতিত্যাগ তিনিও অনুমোদন করেননি। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলনঅনুষ্ঠিত হয়, তাতে ভগিনী নিবেদিতা তাঁর সুচিন্তিত ভাষণে বলেন—

"Marriage in Hinduism is a sacrament and indissoluble. The notion of divorce is as impossble as the re-marriage of widow is abhorent. Eeven in orthodox Hinduism this last has been made legally possible by the life and labours of the Late Pandit Iswar Chandra Vidyasagar, an old Brahmanical scholar, who was one of the stoutest champions of individual freedom, as he conceived of it that the world ever saw. But, the common sentiment of the people remains as it was, unaffected by the changed legal status of the widow."

স্বাধীন ভারতে যখন নানাবিধ আইনের দ্বারা পাশ্চাত্ত্য আদর্শে নারী-প্রগতির নামে বিবাহ-বিচ্ছেদ, মাতৃত্বের অমর্যাদা, পাতিব্রত্যের অবমাননা, দাম্পত্যজীবনের পবিত্রতার অস্বীকৃতি এবং পাশবিক ভোগাসক্তি ও সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধিকেই উৎসাহিত করা হ'চ্ছে; সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের শান্তি ও সুষমাকে ধ্বংস ক'রে বহির্মুখ পতঙ্গের মত আমরা যখন উন্মত্ত হ'য়ে পাশ্চাত্ত্য সমাজের উন্মার্গগামিতার আদর্শের দিকে ছুটে চলেছি; যখন স্বাধীন ভারতের লোকসভায় "হিন্দু কোড বিলের" আলোচনাকালে ভারতীয়া নারী সদস্যা সুভদ্রা যোশী বলছেন—"Hindu marriage is nothing but prostitution"; তখন আবার সেই ভারতপ্রেমিক বিদেশিনী মনস্বিনীর কথাগুলোই স্মরণ ক'রতে ইচ্ছে হয়।—

"In India the sanctity and sweetness of family life have been raised to the rank of a great culture. *Wifehood is a religion, motherhood is a dream of perfection.*······The woman of the East is already embarked on a course of self-transformation which can only end by endowing her with a full measure of civic and intellectual personality. It is too much to hope as she has been content to quaff from our wells in this matter of the extension of personal schope, so we might be glad to refresh ourselves as hers, and gain therefrom a renewed sense of the sanctity of the family, and particularly of the inviolability of marriage." (Sister Nivedita—'The present position of woman'—a paper communicated to the First Universal Races Congress' in 1911.)

এই ব্যাপারে সনাতনী ভূদেবকে দোষী করতে গেলে, প্রগতিবাদী স্বামীজী এবং ভগিনীকেও দোষী সাব্যস্ত করতে হয়। প্রাচীন ভারতের মর্মানুধ্যানে, আদর্শের সন্ধানে এবং শাস্ত্র ও বুদ্ধিনিষ্ঠায় এঁদের তিনেরই হৃদয় একসূত্রে গাঁথা। ভূদেববাবু পুরুষের পক্ষেও দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের বিরুদ্ধে ছিলেন। প্রচলিত কুসংস্কারকে দেশীয় হ'লেও তিনি সমর্থন করেননি। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সদাচারপালন, মাতৃপিতৃভক্তি, পরোপকারিত্ব, তেজস্বিতা, সারল্য ও পাণ্ডিত্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত গুণের জন্য তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতি পোষণ করতেন। বিধবা-বিবাহে পরিণামে সমাজের ক্ষতির আশঙ্কাতেই তিনি তাঁকে সমর্থন করেননি। আবার সমাজের কল্যাণবোধেই সহবাস সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্যাসাগর মশাইকে প্রবলভাবে সমর্থন ক'রেছিলেন।

ভূদেব সংস্কারবিরোধী ছিলেন না মোটেই। তবে সংস্কারের নামে নির্বিচারে আত্মবিসর্জন করতে তিনি কখনো রাজী নন। এইক্ষেত্রে রাজা রামমোহন এবং স্বামী বিবেকানন্দকে ভূদেবের সঙ্গে একই ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করা চলে। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি সংস্কারকগণ ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে বিনষ্ট হতে দেখে ঊনিশ শতকে তাকে সংস্কৃত করে ব্যবহারযোগ্য করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য কোথাও বা রক্ষিত হয়েছে, কোথাও বা হয়নি। পাশ্চাত্তের অনুকরণমোহ পরাজিত জাতিকে স্বভাবতঃই তার ধর্ম ও সমাজসংস্কারে কৃত্রিম ও অসুস্থ উত্তেজনায় মাঝে মাঝে উত্তেজিত ক'রেছে। তাই, সমাজসংস্কারে কৃত্রিম উত্তেজনাপ্রসূত চাঞ্চল্যও দেখা গিয়েছে প্রচুর। এমনকি, অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও এই চাঞ্চল্য হতে পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারেননি। ব্রাহ্ম-সমাজের সংস্কার-আন্দোলনের তরঙ্গমালার পুরোভাগে বেদান্তের কলধ্বনি শোনা গেলেও দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দার্শনিক ভিত্তি যথাক্রমে ফরাসী, স্কটল্যাণ্ড, জার্মানী ও ইংলণ্ড হতে সংগ্রহ করা হয়েছে।

স্বদেশীয় সভ্যতার কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যকে রামমোহন অতীতকাল হতে নবযুগের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে পৌঁছে দিয়েছেন, সত্য। আবার কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য নানা কারণে তাঁর হাতে ক্ষুণ্ণও হয়েছে। কিন্তু, সনাতন ভারতের দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই তিনি বর্জন এবং গ্রহণ করেছেন। ভূদেবেরই মত দেশের অতীত ইতিহাস তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। ভূদেব, রামমোহন এবং বিবেকানন্দের ইতিহাস-সংশ্লিষ্ট মৌলিক গবেষণা অপরিসীম এবং অতুলনীয়। এই তিনজন ক্রান্তদর্শী মনীষীই মানব-সমাজের একটা জীবন ও গতি স্বীকার করেছেন এবং সেই গতিমুখে ভারতীয় সমাজ পৃথিবীর অন্যান্য জীবন্ত ও চলন্ত জাতিসমূহের সঙ্গে একযোগে যাতে উন্নতির পথে চলতে পারে, তার জন্য সারা জীবন ধরে সাধনা করে গেছেন। আমাদের সভ্যতা, ধর্ম ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে যাঁদের মনে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, তাঁদেরি কয়েকজন বিগত শতাব্দীতে নিজেদের সীমানা ছাড়িয়ে সমাজের বাইরে গিয়ে কিছুকালের জন্য একটা উচ্ছৃংখল উপদ্রব সৃষ্টি করেছিলেন। অবশ্য আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সৌভাগ্যবশতঃ তা স্থায়ী হয়নি আনন্দের বিষয় যে রামমোহন এবং বিবেকানন্দ কেউই আমাদিগকে স্বধর্মত্যাগী হতে পরামর্শ কখনো দেননি, যেমন দেননি ভূদেব। এই তিনজনই পাশ্চাত্যকে প্রকৃত সুসভ্য হিন্দুর মত বরণ করেছেন. ভালোটাকে গ্রহণ করেছেন; পাশ্চাত্যের মধ্যে আত্মবিসর্জনের নামে আত্মহত্যা করেননি। তাঁরা তিনজনেই গ্রহণের সঙ্গে দানও করেছেন· অনেক। এই দিক দিয়ে রাজা রামমোহন এবং পরবর্তী সংস্কারকদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে প্রচুর। মুক্তবুদ্ধি এবং যুক্তির নামে শাস্ত্র লঙ্ঘন করাই ছিল পরবর্তী সংস্কারদের মুখ্য লক্ষ্য। কিন্তু রামমোহন ছিলেন শাস্ত্রনিষ্ঠ, সংগঠনকামী সংস্কারক। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাবধারা নিষ্ঠাবান আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশই কেবল নানা প্রতিকূলতার মধ্যে সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর অগ্নিহোত্রীর মত রক্ষা করেন। কিন্তু, তাঁর পরবর্তীকালের অনুগামীরা তাঁর আদর্শ থেকে সরে গিয়েছিলেন অনেক দূরে। ফলে, এমনকি তাঁরা কেউ কেউ নিজেদের হিন্দু বলে অস্বীকার করেন। আমাদের সনাতন শাস্ত্ররাজি অনুশীলন না করায় এবং প্রবৃত্তির উদ্দামতাকে সংস্কারমুক্তির সোপান মনে করায় ঋষি মহর্ষির সত্যলব্ধ এই জ্ঞানের আকরগুলোকে শ্রদ্ধা করার মত মনোবৃত্তি তাঁরা হারিয়ে ফেলেছিলেন। রামমোহন শাস্ত্রমর্যাদা কোথাও লঙ্ঘন করেননি। তাঁর "The Brahmanical Magazine"এর রচনাগুলিতে উচ্চাধিকারীর জন্য নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা এবং নিম্নাধিকারীর জন্য সগুণ সাকার ব্রহ্মোপাসনার প্রয়োজন তিনি অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন এবং শাস্ত্রের দ্বারা এই মতবাদকে সমর্থনও করেছেন। বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে রামমোহনের যে অভিমত "তুহাফতুল মোহায়িদ্দিন" গ্রন্থের পর দেখা গিয়েছিল, তাঁর অনুবর্তীরা কেউ তা অনুকরণ করতে পারেননি। রামমোহন সনাতন

শাস্ত্ররাশি যেভাবে আলোচনা এবং ব্যাখ্যা করেছেন, অনুবর্তীরা প্রায়ই তার মর্যাদা রক্ষা করেননি। শাস্ত্রজ্ঞান লাভের জন্য রামমোহন প্রথমেই সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। পরে তিনি ইংরাজী ও ফার্সী শেখেন। রামমোহন ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রংপুর হতে চাকরি পরিত্যাগ করে এসে যখন ধর্মপ্রচারে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন, তখন তিনি কেবল যুক্তিকেই হাতিয়ার রূপে গ্রহণ করেননি, শাস্ত্রকেও নিয়েছিলেন। সব্যসাচীর মত ভূদেব এবং রামমোহন উভয়েই শাস্ত্র এবং যুক্তি দুইকেই গ্রহণ করেছিলেন; আর, এইটি আমাদেরই "বৃহস্পতি স্মৃতির" কথা—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।

যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।"

এবং "শ্রুতি স্মৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।" নবযুগে বঙ্গদেশে বেদালোচনা রামমোহনই প্রথম প্রবর্তন করেন। যেখানেই তিনি কিছু নির্দেশ করছেন, সেখানেই বলছেন "শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ" ইহা প্রমাণ হয়। ধর্ম, সমাজ—ব্যবহার ও রাষ্ট্রীয় সংস্কার যে পরস্পর সম্পৃক্ত, তা রামমোহন উপলব্ধি করলেও পরবর্তীরা করেননি। তাঁদের স্বকীয় প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য-গৌরব স্বীকার করেই বলা যেতে পারে কোথাও জ্ঞাতসারে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অজ্ঞাতসারে অকারণে রামমোহনকে তাঁরা এত বেশী পরিত্যাগ ক'রে গেছেন যে, তাঁদের রামমোহনপন্থী বললে রাজার প্রতি অবিচার করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ২য় ও ৩য় পাদে তথাকথিত রামমোহনপন্থীরা একমাত্র মূর্তি-পূজাকেই অস্বীকার ক'রেছেন। আর প্রায় সকল বিষয়েই রাজাকে উপেক্ষা করে অনেকটা বাইরের আঘাতজনিত উচ্ছৃংখল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পথে উদ্‌ভ্রান্ত পদক্ষেপে স্বেচ্ছাক্রমে বিচরণ করেছেন। এই সব বিষয়ে রামমোহনের চেয়ে ডিরোজিওর শিষ্যত্বই বেশী গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা। অনুগামীদের জন্য রামমোহনকেও অনেকে তাই ভুল বুঝেছেন। এই দিক থেকে মহারাষ্ট্র অনেকটা সুস্থ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে। সেখানে রাণাডে এবং তাঁর অনুগামীরা হিন্দুধর্ম সংস্কারের নামে হিন্দুধর্মকে বিধ্বস্ত এবং ধিকৃত করার চেষ্টা করেননি। রামমোহনের পর থেকে বাংলায় একটা পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুকরণের যুগ এসেছিল। পরবর্তী সকল মনীষীই পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুকরণ করেছেন একথা বলা না গেলেও সমাজে যে একটা অন্ধ অনুকরণের প্রবল মোহ এসেছিল, আত্মবিস্মৃতির এক বাঁধভাঙা ভাববন্যা বয়ে চলেছিল, তাঁকে অস্বীকার করা চলে না। গৃহী ভূদেব এবং সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এই যুগের প্রতিবাদে প্রবলভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। ফলে, নিজের জাতি, সভ্যতা ও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁদের স্বাভিমান সময় সময় অত্যন্ত তীব্র ও উগ্রভাব ধারণ ক'রেছে। তবে, মনে রাখতে হবে, সনাতন হিন্দু ধর্মের শিক্ষার প্রভাবেই পরধর্মের নিন্দা তাঁরা কখনো করেননি।

বিচারহীন আচার যেমন নিন্দনীয়, নির্বিচারে গ্রহণও তেমনি বর্জনীয়। ভূদেব গ্রহণে এবং বর্জনে কোথাও বিচারকে বিসর্জন দেননি। রামমোহনের পরবর্তীরা বিচারহীন আচারের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে পাশ্চমকে নির্বিচারেই গ্রহণ করতে লাগলেন। গ্রহণের বেলায়ও যে বিচার বিবেচনার প্রয়োজন, তা তাঁরা একেবারে ভুলে গেলেন। ভূদেব এবং বিবেকানন্দ তারই মূর্তিমান প্রতিবাদ।

প্রত্যেক জাতির একটা মূলভাব রয়েছে, যাকে বলা যেতে পারে সেই জাতির বৈশিষ্ট্য। সেই মূলভাবকে অবলম্বন করেই তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো শাখাভাবরূপে অবস্থান করে। ভারতের ইতিহাস আলোচনা করে ভূদেব এবং স্বামীজী দেখেছেন যে আমাদের জাতির মূলভাব ধর্ম। যদি, সেই মূলভাব জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত থাকে, অর্থাৎ জাতি যদি ধর্মকে রক্ষা করে, তবে রাষ্ট্রের অধিকার এবং সামাজিক সংস্কার স্বাভাবিক ভাবেই সাধিত হবে। যেমন, মূল স্বাস্থ্য ভালো থাকলে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ ও সবল হয়ে ওঠে ; তেমনি ভারতবর্ষে ধর্ম রক্ষিত হলে তার জাতীয় জীবনের পূর্ণ এবং সর্বাঙ্গসুন্দর বিকাশ সম্ভব হবে। ধর্মকে ধ্বংস করে ভারতের কোনোরকম উন্নতি কখনো সম্ভব নয়। এই ঐতিহাসিক আলোচনার ওপর নির্ভর করে স্বামীজী সংস্কারকেরা যে সমাজের কুরীতিগুলোকে পরিবর্তন করার জন্য ধর্মকে পর্যন্ত বিসর্জন দিতে উন্মুখ হয়েছিলেন, তারি প্রতিবাদে বলছেন—

"সংস্কারকগণ সমাজকে ভাঙিয়া চুরিয়া যেরূপে সমাজ সংস্কারের প্রণালী দেখাইলেন, তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পারিলেন না।······তাঁহাদের প্রণালী ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলা, আমার প্রণালী সংগঠন। আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নহি—আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী।"

"প্রায় বিগত এক শতাব্দী ধরিয়া দেশে এক সমাজ সংস্কারকগণ তাঁহাদের নানাবিধ সমাজ সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। কিন্তু, ইহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে এই শতবর্ষব্যাপী সমাজসংস্কার আন্দোলনের ফলে সমগ্র দেশের কোন স্থায়ী হিতসাধন হয় নাই। বক্তৃতামঞ্চ হইতে সহস্র সহস্র বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। হিন্দু সভ্যতার মস্তকে অজস্র নিন্দাবাদ ও অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে। কিন্তু, তথাপি বাস্তবিক সমাজের কোন উপকার হয় নাই। ইহার কারণ কি ? এই নিন্দাবাদ ও গালি বর্ষণই কারণ। প্রথমতঃ, আমি তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদিগকে আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু, দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে আমাদের অধিকাংশ আধুনিক সংস্কারই পাশ্চাত্ত্য কার্য প্রণালীর বিচারশূন্য অনুকরণ মাত্র। ভারতে ইহার দ্বারা কখনই কার্য হইবে না। এই কারণেই আমাদের বর্তমান সংস্কার আন্দোলন-সমূহ দ্বারা কোন ফল হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ,

কাহারও কল্যাণসাধন করিতে হইলে, নিন্দা বা গালি বর্ষণ দ্বারা কোন কার্য হয় না।...প্রায় শতবর্ষ ধরিয়া এই সংস্কার আন্দোলন চলিতেছে, কিন্তু তদ্দ্বারা অতিশয় নিন্দা ও বিদ্বেষপূর্ণ সাহিত্য বিশেষের সৃষ্টি ব্যতীত কি কল্যাণ হইয়াছে? ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা না হইলেই বড় ভাল ছিল। তাঁহারা প্রাচীন সমাজের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন; তাঁহাদের উপর যথাসাধ্য দোষারোপ করিয়াছেন, তাঁহাদের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। ফলে এই হইয়াছে যে সর্বপ্রকার দেশীয় ভাষায় এমন এক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে সমস্ত জাতির লজ্জিত হওয়া উচিত।"

স্বামীজী সংস্কারকদের লক্ষ্য করে আরো বলছেন—

"সেকেলে হিন্দু অজ্ঞ হইলেও, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইলেও তাহার একটা বিশ্বাস আছে, সেইজোরে সে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু, সাহেবীভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদণ্ডহীন। সে চারিদিক হইতে কতকগুলি এলোমেলো ভাব লইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, শৃঙ্খলা নাই, সেগুলিকে সে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই। কতকগুলি ভাবের বদহজম হইয়া খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছে।...সে যে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হয়, সে যে আমাদের কতকগুলি সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে, তাহার কারণ, ঐসকল আচার সাহেবদের মতবিরুদ্ধ। কেন আমাদের কতকগুলি প্রথা দোষাবহ? কারণ, সাহেবরা এরূপ বলিয়া থাকে, এরূপ ভাব আমি চাহি না। বরং নিজের যাহা আছে, তাহা লইয়া নিজের জোরের উপর থাকিয়া মরিয়া যাও।"

"তোমরা যখন একটা স্থায়ী সমাজ গঠন করিতে পারিবে, তখন তোমাদের কথা শুনিব। তোমরা দুদিন একটা ভাব ধারণ করিয়া থাকিতে পার না, বিবাদ করিয়া উহা ছাড়িয়া দাও।...অগ্রে আমাদের ন্যায় স্থায়ী সমাজ গঠন কর। প্রথমে এমন কতকগুলি সামাজিক নিয়ম ও প্রথার প্রবর্তন কর, যাহাদের শক্তি শতশতাব্দী ধরিয়া অব্যাহত থাকিতে পারে। তখন তোমাদের সহিত এবিষয়ে কথাবার্তা কহিবার সময় হইবে। কিন্তু, যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন তোমরা চঞ্চল বালকমাত্র।"

সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের নিষ্ফলতার একটি গুরুতর কারণ স্বামীজী স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। এই বিষয়টির বিশদভাবে আলোচনা এই পর্যন্ত হয়নি বললেই চলে; ভূদেব এবং স্বামীজীর মতে সংস্কারকগণ আমাদের সনাতন ধর্মশাস্ত্রগুলিকে বুদ্ধি, বিচার এবং ধৈর্য নিয়ে অধ্যয়ন করেননি; আর তাছাড়া, আমাদের গুরুপরম্পরানির্দিষ্ট সাধনপ্রণালীও অবলম্বন করেননি। ফলে, তাঁরা ভুল বুঝে ভুল পথেই চলেছেন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। তাতে স্বামীজীর কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠেছে—

"...সংস্কারকেরা বিফল মনোরথ হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? কারণ,

তাহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহাদের নিজের ধর্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন। আর তাঁহাদের একজনও "সকল ধর্মের প্রসূতি"কে বুঝিবার জন্য যে সাধনের প্রয়োজন, সেই সাধনের মধ্য দিয়া যান নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় আমি এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছি বলিয়া দাবী করি '

"আমি বলি হিন্দু সমাজের উন্নতির জন্য হিন্দুধর্মনাশের কোন প্রয়োজন নাই। এবং হিন্দুধর্ম প্রাচীন রীতিনীতি, আচার পদ্ধতি প্রভৃতি সমর্থন করিয়া রহিয়াছে বলিয়া সমাজের ঐ অবস্থা নহে। কিন্তু, ধর্মভাবসকলকে কল্যাণ ব্যাপারে যেরূপভাবে লাগানো উচিত, তাহা হয় নাই বলিয়া সমাজের এই অবস্থা।"

প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মিলনের কথা যাঁরা বলেন, তাঁদের উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন—"এই ভাববিনিময় কেবল দুইদল সমান ব্যক্তির ভিতর আশা করা যাইতে পারে।" সমানে সমানে মিলন হয়, দাসে এবং প্রভুতে নয়। অসমান অবস্থার জন্যই ভাব বিনিময়ের আবরণে সংস্কারের নামে দীর্ঘকাল ধরে এক ভয়াবহ পরধর্মের অন্ধ অনুকরণই প্রাধান্য লাভ করেছিল আমাদের দেশে। দরিদ্র যেমন কাঙালপনাকে আত্মীয়তার দাবীর আবরণে ঢেকে ধনীর প্রসাদ ভিক্ষা করে বেঁচে থাকতে চায়—এই নীতিও ঠিক তেমনি। তাই, স্বামীজী এই পরানুকরণের মোহ হতে মুক্ত হবার জন্যে জলদগম্ভীর স্বরে নির্দেশ দিচ্ছেন।—

"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা, এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? মূর্খ, অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না। অর্জন না করিলে কোন বস্তুই আপনার হয় না।"

যাঁরা "সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছেদে লজ্জাহীন বিদুষী নারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী লইয়া সমুপস্থিত দেখিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িতেছেন," তাঁদের স্বামীজী বজ্রনির্ঘোষে সতর্ক করে দিচ্ছেন—"বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান।" ভূদেব এবং স্বামীজী উভয়েই আমাদের সামাজিক আদর্শ এবং প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখে ভাববিনিময়ে আগ্রহী। শুধু গ্রহণ নয়, আমাদের সুকৃতি ও পাশ্চাত্ত্যকে দান করতে হবে। নৈলে জাতি হিসাবে, একটা বিশেষ সভ্যতার বংশধর রূপে আমাদের বেঁচে থাকার সার্থকতা কি? বিশিষ্টরকম দান না করে গ্রহণে তাঁরা নিষেধ করেছেন। রামমোহন, ভূদেব এবং বিবেকানন্দ ব্যতীত পাশ্চাত্ত্যকে দানের কথা তখন কেউ ভাবেননি, কল্পনাও করেননি। ঘরে বাইরে বহু প্রতিকূলতা সহ্য করে ভারতীয় জাতির বেঁচে থাকার সার্থকতা "আত্মনো মোক্ষার্থং, জগদ্ধিতায় চ"—এই সত্য ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন এই তিনজনই। ভূদেবের পুষ্পাঞ্জলি, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের

ইতিহাস এবং প্রবন্ধাবলী পাঠ করলে রামমোহন এবং বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সাধর্ম্য এবং সহধর্মিতা স্পষ্ট অনুভব করা যায়। সংস্কারবিমুখ, উন্নতিপরিপন্থী রক্ষণশীলরূপে তাঁকে চিত্রিত করা তাঁর রচনা এবং কর্মের সঙ্গে অপরিচিতিজনিত অজ্ঞতারই ফল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবীর মতে যা এককালে ছিল, বর্তমানে প্রসুপ্ত, তাকে জাগানোই পুনর্জাগরণ। জাগরণ এবং আনয়ন এক কথা নয়। ভারতীয় আদর্শের যে মহিমা বহুদিনের পরাধীনতার ফলে প্রসুপ্ত হয়ে পড়েছিল, রামমোহন, ভূদেব এবং বিবেকানন্দ তাকে আবার জাগিয়ে তোলেন। এই তিনজনই ভারতে পুনর্জাগরণের সত্যিকারের পথিকৃৎ। যাঁরা বাইরে থেকে নতুন ভাবধারার আমদানি করেছিলেন, তাঁরা নন।

ভূদেব-চরিত্রের মূল সূত্র হচ্ছে তাঁর মৌলিকতা। ব্রহ্মণ্যের অক্ষুণ্ণ আদর্শ, দৃঢ় আত্মমর্যাদাবোধ, স্বজাতিপ্রীতি, আচারনিষ্ঠতা, সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক দৃষ্টি ও যুক্তিনিষ্ঠাই ছিল ভূদেব-চরিত্রের মূল উপাদান। বৃদ্ধ জ্ঞান-তাপসের স্নিগ্ধ-কোমল কণ্ঠে আত্মবিস্মৃত জাতিকে তিনি জাগাতে চেয়েছেন। গীতার নিষ্কাম কর্মসাধনা রূপায়িত হয়েছিল তাঁর জীবনে ও কর্মে। বিস্মৃতি বা উপেক্ষার কুহেলিকা তাঁর স্মৃতিকে সাময়িক ভাবে আচ্ছন্ন করলেও অনাগত দিনে সেই আবরণ ভেদ করে ভূদেবের জ্যোতির্ময় মূর্তি বঙ্গবাসীর মানসপটে আবার উদিত হবে। তবেই সার্থক হয়ে উঠবে পার্থসারথির সেই পরম বাণী—

"যদ্‌ যদ্‌ আচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥"

একদিকে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল চাকচিক্য, অন্যদিকে স্বদেশীয় ধর্মশাস্ত্রের নির্বাণোন্মুখ বিকৃত বহিরালোক—ভূদেব উভয়কেই পরিহার করেছেন। প্রবীণ আচার্যের মত যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে উভয়ের অন্তর্নিহিত সার্বভৌম উদার আলোকে উভয়কে যথাযথ উপলব্ধি করে চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা নিজের গন্তব্যপথে তিনি করেছিলেন যাত্রা। তাঁর পুণ্যকর্মরত সুদীর্ঘ জীবন ও তার পরিণাম বাঙ্গালীর সর্বোত্তম আদর্শ। পরার্থপর অথচ আত্মস্থ, সংসারলিপ্ত অথচ নিষ্কাম এই তপস্বী মনীষীর কর্মসাধনা আজ আমাদের আত্মসমীক্ষার পথে পরিচালিত করুক। এই পুরুষোত্তমের চরিত্র-বিশ্লেষণে আজ বহুদিন পরে সেই পুরানো কথাগুলিই বারবার মনে পড়ে—

"মনস্বিসেব্যো ভূদেবো ভূদেবানাং শিরোমণিঃ।
স্বধর্ম-দেশ-সেবোৎস-প্রত্যগ্র-যুগ-সাধকঃ ॥" (হিন্দুকণ্ঠহার)

প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ

বিশ্বসাহিত্যের দরবারে ভারতীয় মনীষার অবিস্মরণীয় অবদান সংস্কৃত সাহিত্য। সংস্কৃত সাহিত্যের রসধারা আকণ্ঠ পান ক'রে নিখিল বিশ্বের নিরবধিকালের রসিকসমাজ আজও সন্তৃপ্ত। বিখ্যাত বিদেশী মনীষী আচার্য হোরেস্ হেম্যান উইলসনের সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে উক্তিটি বিশেষ স্মরণীয়—

'ন জানে বিদ্যতে কিং তন্ মাধুর্যমত্র সংস্কৃতে।
সর্বদৈব সমুন্মত্তা যেন বৈদেশিকা বয়ম্ ॥
যাবৎ ভারতবর্ষং স্যাদ্ যাবদ্ বিন্ধ্য-হিমাচলৌ।
যাবদ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্ ॥

সংস্কৃত আলংকারিকরা কাব্যকে দৃশ্য এবং শ্রব্যভেদে মোটামুটি দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই দৃশ্যকাব্যকেই আমরা সাধারণতঃ বাংলায় নাটক বলে চিহ্নিত করি। কাব্যতাত্ত্বিকদের ভাষায় দৃশ্যকাব্যকে বলা হয় রূপক। নায়ক-নায়িকা, বিষয়বস্তু এবং রসের পার্থক্য অনুসারে সংস্কৃতে দশপ্রকারের রূপক রয়েছে। নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অংক, বীথি এবং প্রহসন—যার অন্যতম হচ্ছে নাটক। অভিনয়ের মাধ্যমে ঘটনাকে রূপায়িত করে তোলার জন্যই দৃশ্যকাব্যকে বলা হয় রূপক—'রূপারোপাত্তু রূপকম্'—এই হল বিশ্বনাথের বিশ্লেষণ !

জীবনের জীবন্ত অনুকরণ বলেই নাটক শ্রেষ্ঠ কাব্য। আমাদের আলংকারিকরা বলেছেন—'অবস্থানুকৃতির্নাট্যম্', বলেছেন—'লোক-বৃত্তানুকরণম্'। নাটকের লক্ষ্য—চরিত্রের বিকাশ, যার আত্মপ্রকাশ হল আচরণে। সমাজে ও সংসারে নিজেকে সাধ্যমত সংযত করে রাখার চেষ্টা করে মানুষ। কিন্তু, সে স্বতন্ত্র হয়েও কোন্ এক অদৃশ্য দৈবশক্তির অধীন। স্বভাবের প্রেরণা, প্রবৃত্তির উত্তেজনা এবং রিপুর দুরন্ত আবেগ মানুষের সংযমের বাঁধকে যখন তৃণের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং বাইরের বাধায় প্রবলতর হয়ে ওঠে, চরিত্র তখনি হয় নাটকীয় বিকাশের উপযোগী। ঘটনাচক্রে মানুষ এমন বিষম সমস্যায় পতিত হয় যে, তার একটিমাত্র পদক্ষেপে সমগ্র জীবনের গতি নির্ধারিত হয়ে যায়। এই প্রথম পদক্ষেপেই নাটকের সূচনা। সমগ্র নাটকটি সেই এক মুহূর্তের পল্লবিত বিকাশ।

জীবনের কর্মক্ষেত্রে কর্মফল অলংঘনীয়। এই জগতে কার্য এবং কারণ দুশ্ছেদ্য শৃংখলে বাঁধা। বিনা উদ্দেশ্যে মানুষ কোনো কাজই করে না এবং শুভাশুভ আচরণে সে আপনার পরিণাম আপনিই ডেকে আনে। নাট্যকার

সংসারের এই চিত্রটিই অংকিত করেন। জটিল সমস্যায় সংকল্পে-বিকল্পে মনের নানা-আন্দোলন, উভয় সংকটে অন্তর্দ্বন্দ্ব, জীবনের সন্ধিস্থলে পথ-নির্বাচন, সংশয়ে নিশ্চয়-নিরূপণ, দ্বিধায় কর্তব্যবিমূঢ়তা, অবস্থায় এবং চরিত্রে এই রকমের দ্বন্দ্ব-সৃষ্টিই নাটকের মজ্জাগত প্রাণ। আশায়-নিরাশায়, ভয়ে-ভরসায়, হর্ষে-বিমর্ষে, অপূর্ব ছায়ালোক-সম্পাতে অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, পুরুষকারের প্রচেষ্টায়, দৈবের নির্বন্ধে, বিচিত্র ছন্দে নাটকীয় কাহিনীর বিকাশ। ঘটনার অনুকূল ও প্রতিকূল আচরণে নাটকীয় গল্পের সৃষ্টি, অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকীয় রসের পুষ্টি। কবিত্বে, ঘটনা-বৈচিত্র্যে, চরিত্রচিত্রে বিপরীত ও বিসদৃশের সমাবেশ ঘটিয়ে নাট্যকার দর্শকের কল্পনা, কৌতূহল এবং সহানুভূতি করেন উদ্রিক্ত। তখন, রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতো নকল আসলের সংগে সমভাবাপন্ন হ'য়ে ওঠে এবং সত্যের সংসারে যে নগ্নচিত্র সাধারণতঃ দর্শকের চিত্তকে আকর্ষণ করে না, কবিত্বের প্রভাবে, কল্পনার পরিচ্ছেদে রংগমঞ্চে তাই সুন্দরতররূপে প্রতীয়মান হয়।

দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে অভিনীত হওয়ার মাধ্যমেই নাটকের সার্থকতা। এই অভিনয় প্রদর্শনের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে প্রেক্ষাগৃহ ও রংগমঞ্চ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন প্রাচীন ভারতীয় মনীষার অতুলনীয় অবদান শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়, তেমনি এই প্রেক্ষাগৃহ এবং মঞ্চকল্পনার ক্ষেত্রেও তাঁদের সুগভীর চিন্তা এবং অভূতপূর্ব রসসৃষ্টি আজও বিস্ময়ের সঞ্চার করে। যদিও আমাদের আধুনিক রংগমঞ্চ তৈরি হয়েছে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, তবুও ভারতীয় রংগমঞ্চের ইতিহাস সুরু হয়েছে প্রায় স্মরণাতীতকাল থেকেই। কালের করাল আক্রমণে এবং বৈদেশিক আক্রমণকারীদের উন্মত্ত তাণ্ডবে প্রাচীন ভারতের বহু অমূল্য নিদর্শন ধ্বংস হয়ে গেছে। রাজপ্রাসাদ এবং দেবমন্দিরের সন্নিধানেই তৎকালে সাধারণতঃ রংগমঞ্চ নির্মিত হ'ত। আর রাজপ্রাসাদ ধ্বংস এবং দেব-মন্দির ধূলিসাৎ করার মধ্যেই এই বর্বর আক্রমণকারীরা পেতো সর্বাধিক আনন্দ। ফলে, সভ্যতার এই শত্রুদের নির্মম অত্যাচারে প্রাচীন ভারতের কোনো সুগঠিত রঙ্গমঞ্চের অস্তিত্ব বর্তমানকাল পর্যন্ত টিঁকে থাকতে পারে নি। মন্দিরে মন্দিরে তখন থাকতো সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। সেই সবও ভস্মীভূত করে তাঁরা অনুভব করেছেন পৈশাচিক আনন্দ। ফলে, ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির অগণিত গ্রন্থগত এবং বাস্তব নিদর্শন আজ বিলুপ্ত। তবুও এই সব বিপর্যয়ের হাত এড়িয়ে পল্লীতে-পল্লীতে বৈভবরিক্ত বিদ্যাব্যসনী যে সংস্কৃতপণ্ডিতবর্গ প্রাচীন বিদ্যার ধারাকে নিজেদের জীবনের বিনিময়ে রক্ষা করে চলেছিলেন, তাঁদেরি কাছে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থমালা আবিস্কৃত হয়েছে, প্রধানতঃ সেগুলোই ঘোষণা করছে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অতুলনীয় সমৃদ্ধির কথা।

নাট্যকলা নিয়ে বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ শারদাতনয়ের ভাবপ্রকাশ, নারদের সংগীতমকরন্দ, ভোজের সমরাংগনসূত্রধার, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, বাসবরাজের

শিবতত্ত্বরত্নাকর, ধনঞ্জয়ের দশরূপক, বিশ্বনাথের সাহিত্য-দর্পণ, মম্মটভট্টের কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থমালার মধ্যে একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ হচ্ছে আচার্য ভরত রচিত নাট্যশাস্ত্র। দৃশ্যকাব্য, শ্রব্য-কাব্য, সংগীত এবং নৃত্যসম্বন্ধে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-সমন্বিত এমন অপূর্ব একটি পূর্ণাংশ গ্রন্থ জগতে দুর্লভ। খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক হ'তে খৃষ্টীয় ৩য় শতকের মধ্যে এই গ্রন্থটি রচিত বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। এই গ্রন্থপাঠেই জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে সুপরিকল্পিত প্রেক্ষাগৃহ এবং সুপরিণত রংগমঞ্চ অভিনয়কালে ব্যবহৃত হত। নাট্যশাস্ত্রই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, প্রাচীন ভারতে নাট্যকলার যথাযথ অনুশীলন হত, নাট্যাভিনয়ের সমুন্নত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল এবং প্রেক্ষাগৃহ ও রংগমঞ্চের গঠনকৌশলে সাধিত হয়েছিল উৎকর্ষ। সুতরাং অন্তত দুই সহস্র বৎসর পূর্বের সমুন্নত ভারতীয় নাট্যকলার গৌরবময় উত্তরাধিকার আমরা বহন করে চলেছি। এইজন্যে আমরা যথার্থ গৌরব অনুভব করতে পারি। পরবর্তী কালে নাট্যকলার এই ধারা যথেষ্ট পরিপুষ্টি লাভ করেছিল, অবশ্য ভারত যতদিন স্বাধীন ছিল। নাট্য-শাস্ত্রকে অনুসরণ করে অসংখ্য অলংকার গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং তাদের অনেকখানি জুড়ে রয়েছে নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যকলার যথেষ্ট আলোচনা। সেই সব গ্রন্থে কোথাও কোথাও তত্ত্বগত মতভেদ থাকলেও সবাই মোটামুটি আচার্য ভরতপ্রবর্তিত পন্থাই কিন্তু অনুসরণ করেছেন।

তাই আচার্য ভরতপ্রোক্ত রংগমঞ্চের বিবরণেই বর্তমান আলোচনা অনেকটা সীমিত। মঞ্চাভিনেয় নাটককে ভারতীয় সমাজে যথেষ্ট সম্মান দান করা হ'য়েছিল; দান করা হ'য়েছিল সর্বজনমান্য বেদের মর্যাদা। আচার্য ভরতের মতানুসারে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য চতুর্বেদের জ্ঞান হ'তে বঞ্চিত জনসাধারণকে চতুর্বেদ-নিহিত জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ধর্মার্থযশস্কর, উপদেশ-সমন্বিত, সর্বশাস্ত্রার্থ সম্পন্ন এবং সর্বশিল্পপ্রবর্তক 'নাট্যবেদ' নামক পঞ্চমবেদ সৃষ্টি করেন।—

> 'ধর্মমর্থং যশস্যংচ সোপদেশ্যং সসংগ্রহম্।
> ভবিষ্যতশ্চ লোকস্য সর্বকর্মানুদর্শকম্॥
> সর্বশাস্ত্রার্থসম্পন্নং সর্বশিল্পপ্রবর্তকম্।
> নাট্যাখ্যং পঞ্চমংবেদ সেতিহাসং করোম্যহম্॥
> এবং সংকল্প ভগবান্ সর্ববেদাননুস্মরন্।
> নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাংগসম্ভবম্॥
> জগ্রাহ পাঠ্যম্ ঋগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
> যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বনাদপি॥
> বেদোপবেদৈঃ সম্বন্ধো নাট্যবেদো মহাত্মনা।
> এবং ভগবতা সৃষ্টো ব্রহ্মণা সর্ববেদিনা॥'

এই পবিত্র নাট্যবিদ্যাকে তিনি তেরোটি ভাগে বিভক্ত ক'রেছেন। নাট্য-বিদ্যার পারদর্শী হ'তে হ'লে এই ত্রয়োদশটি বিষয়ে জ্ঞানার্জন অপরিহার্য।

'রসাভাষা হ্যভিনয়াঃ ধর্মীবৃত্তি প্রবৃত্তয়ঃ।
সিদ্ধিঃ স্বরাস্তথা তোদ্যং গানং রংগশ্চ সংগ্রহঃ॥
উপচারস্তথা বিপ্রা মন্ডপাশ্চেতি সর্বশঃ।
ত্রয়োদশবিধো হ্যেষঃ হ্যাদিষ্ট্যো নাট্যসংগ্রহঃ॥'

(১) রস, (২) ভাব, (৩) অভিনয়, (৪) ধর্মী (৫) বৃত্তি, (৬) প্রবৃত্তি, (৭) সিদ্ধি, (৮) স্বর, (৯) আতোদ্য, (১০) গান, (১১) রংগ, (১২) উপচার, (১৩) মন্ডপ—এই তেরোটি বিষয়ে জ্ঞানলাভ ক'রলে পূর্ণ হয় নাট্যবিদ্যা-শিক্ষা।

(১) শৃংগার, হাস্য, করুণ, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত—এই আটটি হ'ল নাট্যরস। (২) রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা এবং বিস্ময়—এই আটটি হ'ল স্থায়ী ভাব। নির্বেদ, গ্লানি, শংকা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ. ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সুপ্তি, বিবোধ, অমর্ষ, অবহিত্থা, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস, বিতর্ক প্রভৃতি ৩৩টি হ'ল ব্যভিচারী ভাব। আর স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভংগ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু প্রলয়—এই আটটি হ'ল সাত্ত্বিক ভাব—অর্থাৎ মোট ৪৯টি হ'ল ভাব। (৩) আংগিক, বাচিক, আহার্য এবং সাত্ত্বিক এই চার প্রকারের হ'ল অভিনয়। (৪) লোকধর্মী এবং নাট্যধর্মী এই দুই প্রকারের হ'ল ধর্মী। (৫) ভারতী, সাত্বতী কৈশিকী আরভটী—এই চারটি হ'ল বৃত্তি। (৬) আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, ওড্র, মাগধী, পাঞ্চালী এবং মধ্যমা এই পাঁচ প্রকারের হ'ল প্রবৃত্তি। (৭) সিদ্ধি হ'চ্ছে দৈবিকী এবং মানুষী এই দুই প্রকারের। (৮) ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, ধৈবত, পঞ্চম এবং নিষাদ এই সপ্তবিধ হ'ল স্বর। (৯) তত, অবনদ্ধ, ঘন এবং সুষির—এই চার প্রকারের হ'ল আতোদ্য বা বাদ্য। (১০) প্রবেশ, আক্ষেপ, নিষ্ক্রাম, প্রাসাদিক এবং অন্তর—এই পাঁচ প্রকারের হ'ল গান। (১১) রংগ বিজ্ঞান (১২) বাহ্য ও আভ্যন্তর—এই দুই প্রকার হ'ল উপচার। (১৩) বিকৃষ্ট, চতুরস্র এবং ত্র্যস্র—এই তিন প্রকারের হ'ল রংগমন্ডপ। আরো নানা বিভাগসম্বন্ধ হ'চ্ছে এই অখিল নাট্যবিদ্যা।

এখন প্রাচীন ভারতীয় রংগমঞ্চের বিশিষ্ট রূপটি জানতে হ'লে তার কতকগুলি অংশ রংগপীঠ, রংগশীর্ষ, নেপথ্য, মত্তবারণী এবং প্রেক্ষামন্ডপ সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন। এই পাঁচটী অংশ নিয়ে আচার্য ভরত যথেষ্ট আলোচনা ক'রেছেন। নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার, সুবিখ্যাত রসভাষ্যকার আচার্য অভিনব গুপ্ত তাঁর ভাষ্য 'অভিনবভারতীতে' ভরতের উক্তির যথাযথ বিশ্লেষণ ক'রেছেন। দীর্ঘকালের ব্যবধান এবং সেই প্রাচীনবিদ্যার ধারা হ'তে বিচ্ছিন্ন

হবার জন্যে মহর্ষি ভরতের কোনো কোনো উক্তি এখনো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। তাই সেই সব স্থলে মতভেদের সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে। তবে মহর্ষির মূল উক্তি, আচার্য অভিনব গুপ্তের ভাষ্য এবং প্রাপ্ত নাটকাবলীর নাটকীয় নির্দেশাদি আলোচনা করে প্রাচীন ভারতীয় রংগমঞ্চের একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা যায়।

নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে নাট্যগৃহ নির্মাণের একটি পৌরাণিক ইতিহাস মেলে। মহেন্দ্রবিজয়োৎসবে দেবাসুর যুদ্ধের অনুকৃতিকে অবলম্বন ক'রে যখন প্রথম নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিল, তখন অসুরেরা বিঘ্ন উৎপাদন ক'রে অভিনয় পণ্ড ক'রে দেয়। এই বিঘ্নকারীরা রংগপীঠের ওপর আরোহণ ক'রে সূত্রধার এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রহার ক'রে সংজ্ঞাহীন ক'রে দিয়েছিল। তখন ইন্দ্র জর্জরদণ্ড দিয়ে বিঘ্নকারী অসুরদের বিতাড়িত করেন। এই অবস্থায় ভরত ব্রহ্মার নিকট নাট্যরক্ষার উপায় উদ্ভাবনের আবেদন জানালে ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে নাট্যবেশ্ম অর্থাৎ নাট্যগৃহ নির্মাণের নির্দেশ দান করেন। ফলে নিরুপদ্রবে নাট্যাভিনয় চলতে লাগলো।

এই কাহিনী থেকে এই কথাই অনুমান করা যেতে পারে যে, একেবারে প্রথমে হয় তো বর্তমানের যাত্রার মতো উন্মুক্ত স্থানে মুক্ত-অংগনেই অভিনয় হ'ত। তাতে রসবিমুখদের নানা উৎপাতে সময় সময় অভিনয় পণ্ড হ'য়ে যেতো। ফলে, সুরক্ষিত আবৃত স্থানে অভিনয়ের প্রয়োজন দেখা গেল এবং তারই জন্যে নির্মিত হ'ল নাট্যমণ্ডপ। নাট্যগৃহের আকৃতি এবং পরিমাণ সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রে লিখিত রয়েছে—

'বিকৃষ্টশ্চতুরস্রশ্চ ত্র্যস্রশ্চৈব তু মণ্ডপঃ।
তেষাং ত্রীণি প্রমাণানি জ্যেষ্ঠং মধ্যং তথাবরম্‌॥
অষ্টাধিকং শতং জ্যেষ্ঠং চতুঃষষ্টিস্তু মধ্যমম্‌।
কণীয়স্তু তথা বেশ্ম হস্তা দ্বাত্রিংশদিষ্যতে॥
দেবানাং তু ভবেজ্জ্যেষ্ঠং নৃপাণাং মধ্যমং ভবেৎ।
শেষাণাং প্রকৃতীনাং তু কণীয়ং সংবিধীয়তে॥
প্রেক্ষাগৃহাণাং সর্বেষাং ত্রিপ্রকারো বিধিঃ স্মৃতঃ।
বিকৃষ্টশ্চতুরস্রশ্চ ত্র্যস্রশ্চৈব প্রযোক্তৃভিঃ॥
কণীয়স্তু স্মৃতং ত্র্যস্রং চতুরস্রং তু মধ্যমম্‌।
জ্যেষ্ঠং বিকৃষ্টং বিজ্ঞেয়ং নাট্যবেদপ্রয়োক্তৃভিঃ॥'

এই পরিকল্পনা অনুসারে নাট্যমণ্ডপ তিন প্রকারের—বিকৃষ্ট, চতুরস্র এবং ত্র্যস্র অথবা ভাষান্তরে যথাক্রমে জ্যেষ্ঠ, মধ্যম এবং অবর। জ্যেষ্ঠ হবে ১০৮ হাত দীর্ঘ, মধ্যম হবে ৬৪ হাত এবং অবর হবে ৩২ হাত। এই ত্রিবিধ নাট্য-গৃহের মধ্যে দেবতাদের জন্য জ্যেষ্ঠ, রাজাদের জন্য মধ্যম এবং জনসাধারণের জন্য অবর গৃহকে নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। অস্র শব্দের মানে হচ্ছে

কোণ। ত্র্যস্র বলতে ত্রিভুজাকৃতি ক্ষেত্রকে বোঝানো হ'য়েছে। মহর্ষি ব'ল্‌ছেন —

'ত্র্যস্রং ত্রিকোণং কর্তব্যং নাট্যবেশ্ম প্রয়োক্তৃভিঃ।
মধ্যে ত্রিকোণমেবাস্য রংগপীঠং তু কারয়েৎ॥
দ্বারং তেনৈব কোণেন কর্তব্যং তস্য বেশ্মনঃ।
দ্বিতীয়ংচৈব কর্তব্যং রংগপীঠস্য পার্শ্বতঃ॥'

ত্রিকোণাকৃতি এই নাট্যগৃহের মধ্যে ত্রিকোণ রংগপীঠ নির্মাণ করতে হবে। এতে দ্বার থাকবে দু'টি। একটি প্রেক্ষাগৃহের কোণে আর একটি রংগপীঠের পশ্চাতে।

তবে চতুরস্র তথা মধ্যমটি মর্ত্যের মানুষের বিশেষ অভিনয়োপযোগী। কারণ, তার যথোপযুক্ত গঠন সংস্থানের জন্য অভিনয়ের গান এবং সংলাপ অধিকতরভাবে সুখশ্রাব্য হয়। অতিরিক্ত বড় নাট্যমণ্ডপ নির্মাণ করলে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অস্বাভাবিক উচ্চৈঃস্বরে সংগীত এবং সংলাপ প্রয়োগ করতে হবে। ফলে, বেসুরো শোনাবে। আর, সকল প্রযত্ন কণ্ঠেই প্রয়োগ করার জন্য ভাবের অভিব্যক্তি চোখেমুখে সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশিত হবে না। তাই, চতুরস্র প্রেক্ষাগৃহই প্রশস্ত ব'লে তার পরিমাপ এবং কারণ নির্দেশ ক'রে ভরত বলছেন—

'চতুঃষষ্টিকরান কুর্যাদ্দৈর্ঘ্যেন তু মণ্ডপম্।
দ্বাত্রিংশতঞ্চ বিস্তারান্ মর্ত্যানাং যো ভবেদিহ॥
অত ঊর্ধ্বংন কর্তব্যঃ কর্তৃভির্নাট্যমণ্ডপঃ।
যস্মাদব্যক্তভাবং হি তত্র নাট্যং ব্রজেদিতি॥
মণ্ডপে বিপ্রকৃষ্টে তু পাঠ্যমুচ্চারিতস্বরম্।
অবিস্মরণধর্মত্বাদ বিস্বরত্বংভৃশং ব্রজেৎ॥
যশ্চাপ্যাস্যগতো ভাবো নানাদৃষ্টি সমন্বিতঃ।
স বেশ্মনঃ প্রকৃষ্টত্বাদ্ ব্রজেদব্যক্ততাংপরাম্॥
প্রেক্ষাগৃহাণাং সর্বেষাং তস্মান্মধ্যমমিষ্যতে।
যাবৎ পাঠ্যংচ গেয়ংচ তত্র শ্রব্যতরং ভবেৎ॥'

দৈর্ঘ্যে ৬৪ হাত এবং বিস্তারে ৩২ হাত এই মর্ত্য মানুষোচিত মণ্ডপে রংগপীঠ, রংগশীর্ষ, নেপথ্য, মত্তবারণী এবং প্রেক্ষামণ্ডপের সংস্থান নির্দেশ করা প্রয়োজন। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, দর্শকাসনের দিক থেকে নেপথ্যগৃহপর্যন্ত যদি একটি রেখা টানা যায়, তা হলে সেইটি হবে দৈর্ঘ্য এবং অন্যদিকে যে ৩২ হাত রয়েছে, তাকে বোঝাবে বিস্তার ব'লে। নাট্যশালা তখন দুইভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগে রংগমঞ্চ ও অপরভাগে দর্শকসভা। ৩২ হাত পরিমিত ক্ষেত্রে দর্শকাসন স্থাপন করা হত। মনে হয়, তার সামনে ৩২ হাত রংগপীঠ, রংগপীঠের পশ্চাতে ৮হাত রংগশীর্ষ এবং তার পশ্চাতে ১৬

হাত ছিল নেপথ্যগৃহ। এই অংশগুলোর পরিমাপ এবং অবস্থান সম্বন্ধে নানা মতভেদ থাকায় সুষ্ঠু, গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এই সম্বন্ধে বর্তমান বাংলার প্রখ্যাত নাট্যতত্ত্ববিদ আচার্য সাধনকুমার ভট্টাচার্যের গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রংগপীঠ কারো কারো মতে দ্বিভূমিক হোতো। রংগপীঠের পৃষ্ঠে এবং নেপথ্যগৃহের সম্মুখে নির্মিত হ'ত রংগশীর্ষ। এই রংগশীর্ষ বিকৃষ্ট নাট্যগৃহে রংগপীঠ থেকে উন্নত এবং চতুরস্রে রংগপীঠের সংগে সমতল ভূমিতে অবস্থিত হবে। আহুতি, অর্ঘ্যদান প্রভৃতি এখানেই বোধ হয় সম্পাদিত হ'তো। রংগশীর্ষের ষটদারুকে নেপথ্যগৃহের দুইটি প্রবেশদ্বার থাকবে। এই রংগশীর্ষে নানাবিধ দৃশ্যসজ্জা ও যন্ত্রাদির বিন্যাস করা হত। নাটকে যথাসম্ভব বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তাঁরা বর্তমানের মতো বহুবিধ সেট এবং নানাবিধ চিত্রাদি অংকন করতেন। ভরত রংগশীর্ষের দারুকর্ম সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে বলছেন—

'এবং রংগশিরঃ কৃত্বা দারুকর্ম প্রযোজয়েৎ।
ঊহ-প্রত্যূহসংযুক্তং নানাশিল্প-প্রযোজিতম্॥
নানা-সঞ্জবনোপেতং নানাগ্রথিতবেদিকম্।
নানাবিন্যাস-সংযুক্তং যন্ত্রজালগবাক্ষকম্॥
সুপীঠধারণীযুক্তং কপোতালীসমাকুলং।
নানাকুট্টিমবিন্যস্তৈঃ স্তম্ভৈশ্চাপ্যুপশোভিতম্॥'

এরপর মত্তবারণী সম্বন্ধে ভরত বলছেন—

'রংগপীঠস্য পার্শ্বে তু কর্তব্যা মত্তবারণী।
চতুস্তম্ভসমাযুক্তা রংগপীঠপ্রমাণতঃ॥
অধ্যর্ধহস্তোৎসেধেন কর্তব্যা মত্তবারণী।
উৎসেধেন তয়োস্তুল্যং কর্তব্যং রংগমন্ডপম্॥'

এই মত্তবারণীর সংস্থান সম্বন্ধে বহুপ্রকার জটিলতা র'য়েছে নাট্যশাস্ত্রে এবং তার ভাষ্যে। ফলে এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। তবে আচার্য সাধনকুমার ভট্টাচার্য মহোদয় সংস্কৃত নাটকের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ সংগ্রহ করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছেন, তাই আপাতত যুক্তিসহ বলে মনে হয়। মত্তবারণী হচ্ছে রংগপীঠের দুই পাশের স্তম্ভযুক্ত সোপানপরম্পরা-বিশিষ্ট, গোলাকার উপাধানবেষ্টিত উচ্চ বেদিকা বা দ্বিতীয়ভূমি। সম্ভবত, এই স্থানটি অভিনয়কালে বিশ্রাম, প্রাসাদারোহণ, নাটকের ভেতরের নাটকীয় নৃত্যগীতাদি দর্শন প্রভৃতি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হ'ত।

বেশরচনাদির জন্য নেপথ্যগৃহের সংস্থান হ'ত রংগশীর্ষের পৃষ্ঠে এবং তার দুইটি দ্বার সম্মুখে এবং একটি দ্বার পার্শ্বে সন্নিবেশিত হ'ত। পাত্র-পাত্রীরা পাশের দ্বার দিয়ে বাইরে থেকে এসে নেপথ্যে প্রবেশ ক'রতেন এবং সামনের দ্বার

দু'টি দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতেন মঞ্চে।

প্রেক্ষামণ্ডপ ও দর্শকাসনের পরিকল্পনায় ভরত বাস্তুবিদ্যায়ও তাঁর যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। Accoustic সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্ট চিন্তা করতেন। মহর্ষি বলছেন—

'কার্যঃ শৈলগুহাকারো দ্বিভূমির্নাট্যমণ্ডপঃ।
মন্দবাতায়নোপেতো নির্বাতো ধীরশব্দবান্ ॥
তস্মান্নিবাতঃ কর্তব্যঃ কর্তৃভির্নাট্যমণ্ডপঃ।
গম্ভীরস্বরতা যেন কুতপস্য ভবিষ্যতি ॥'

পর্বতের গুহার মতো, দ্বিভূমি, স্বল্পবাতায়নযুক্ত, নির্বাক এবং গম্ভীর স্বরবান হবে নাট্যমণ্ডপ। নির্বাত এবং গুহাকার হবার জন্যে গীতবাদ্যধ্বনি সুগম্ভীর হ'য়ে শ্রুত হবে। রংগৃহের চতুর্দিকে আধুনিক ব্যালকনির মতো দ্বিতীয় তল নির্মিত হবে। রংগপীঠের নিকট থেকে দ্বারদেশ পর্যন্ত ক্রমোন্নত সোপানাকৃতি অর্থাৎ গ্যালারির মতো আসনশ্রেণীর ব্যবস্থা থাকবে। ইষ্টকের দ্বারা সুদৃঢ় ভিত্তি নির্মাণের পর ভূমিভাগকর্ম, দারুকর্ম, ভিত্তিলেপকর্ম, সুধাকর্ম, চিত্রকর্মাদির দ্বারা নাট্যগৃহকে সুগঠিত এবং সুদৃশ্য করার নির্দেশ দিয়েয়েছেন ভরত—

'ভিত্তিকর্মবিধিং কৃত্বা ভিত্তিলেপং প্রদাপয়েৎ।
সুধাকর্মবহিস্তস্য বিধাতব্যং প্রযত্নতঃ ॥
ভিত্তিষ্বথ বিলিপ্তাসু পরিমৃষ্টাসু সর্বতঃ।
সমাসু জাতশোভাসু চিত্রকর্ম প্রযোজয়েৎ ॥
চিত্রকর্মাণি চালেখ্যাঃ পুরুষাঃস্ত্রীজনাস্তথা।
লতাবন্ধাশ্চ কর্তব্যাশ্চরিতং চাত্মভোগজম্ ॥'

ভিত্তির দ্বারা দেয়াল, ভিত্তিলেপের দ্বারা প্লাস্টারিং, সুধাকর্মের দ্বারা চুণকামকরা, চিত্রকর্মের দ্বারা বিলিপ্ত ও পরিমার্জিত সমতল ভিত্তির ওপর স্ত্রী-পুরুষ এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির অংকন করাই বোঝাচ্ছে।

সোপানাকৃতি দর্শকাসন নির্মিত হবে ইষ্টক এবং কাষ্ঠ দিয়ে। প্রথম শ্রেণীটি হবে ভূমিভাগ হ'তে একহাত উঁচু, যাতে রংগপীঠ সহজে অবলোকন করা চলে। এই সম্বন্ধে তিনি বলছেন—'

'স্তম্ভানাং বাহ্যতশ্চাপি সোপানাকৃতিপীঠকম্।
ইষ্টক-দারুভিঃ কার্যং প্রেক্ষকাণাং নিবেশনম্ ॥
হস্তপ্রমাণৈরুৎসেধৈর্ভূমিভাগসমুত্থিতৈঃ।
রংগপীঠাবলোক্যং তু কুর্যাদাসনজং বিধিম্ ॥

নাটকীয় মূলরসানুযায়ী বর্ণবিশিষ্ট ছিদ্রবিহীন অথচ সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড রংগভূমির পশ্চাদ্ভাগে শোভা পেতো। যাকে বলা হ'ত যবনিকা। আদিরসে শ্যামবর্ণ, হাস্যে শ্বেতবর্ণ, করুণে ধূম্রবর্ণ, রৌদ্রে রক্তবর্ণ, বীরে স্বর্ণবর্ণ, ভয়ানকে কৃষ্ণবর্ণ বীভৎসে নীলবর্ণ, অদ্ভুতে পীতবর্ণ এবং শান্তরসে

ইন্দ্রকুন্দধবলবর্ণের যবনিকা ব্যবহৃত হ'ত। আবার কেউ কেউ সর্বরসেই অরুণবর্ণের যবনিকা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। দ্রুত প্রবেশের সময় যবনিকার সবেগ আন্দোলনকে বলা হ'ত অপটিক্ষেপ।

নেপথ্য থেকেই নাটকীয় নেপথ্যোক্তি হয় এবং আবশ্যকস্থলে কোলাহলাদি করা হ'ত। আলংকারিকেরা অভিনেতৃবর্গের প্রবেশ ও প্রস্থানের দু'টি দ্বারপথের উল্লেখ ক'রেছেন। নেপথ্য থেকে রংগমঞ্চে প্রবেশের সময় দুজন সুন্দরী কুমারী উক্ত দ্বারসম্মুখস্থ যবনিকা সরিয়ে পথ ক'রে দিতো। এই দ্বার দু'টির মধ্যস্থলে সম্ভবত যন্ত্রবাদকদের বসার স্থান থাকতো।

এই সুগঠিত রংগমঞ্চে আংগিক, বাচিক, আহার্য এবং সাত্ত্বিক—এই চতুর্বিধ উপায়ে অভিনয়ের পূর্ণতা সম্পাদনে তাঁরা নিরত হতেন। অংগের দ্বারা নিষ্পন্ন অভিনয় হচ্ছে আংগিক, বাক্যের দ্বারা বাচিক, বেশ রচনাদির দ্বারা আহার্য এবং স্তম্ভ-স্বেদাদি ফুটিয়ে তোলার দ্বারা সাত্ত্বিক অভিনয় সম্পাদিত হ'ত। এর মধ্যে অভিনয়ের সর্বাধিক সাফল্য নির্ভর করে আহার্যের ওপর—এই কথা বলছেন নাট্যশাস্ত্রকার এবং তদীয় ভাষ্যকার উভয়েই। নাটক দৃশ্যত্বের ওপরই বেশি নির্ভর করে বলে মঞ্চকল্পনার গুরুত্ব সর্বাধিক। মঞ্চের জগৎ—কলাকৌশলে রচিত বাস্তব জগৎ—অর্থাৎ বিধাতার সৃষ্ট বাস্তব জগতে illusion অথবা মায়ামাত্র। এই মায়াসৃষ্টির ওপরেই অভিনয়ের সার্থকতা। আর এই মায়াসৃষ্টিতে সর্বাধিক সহায়তা করে আহার্য-অভিনয়। পুস্ত-কর্ম অর্থাৎ নানাবিধ সেট এবং মূর্তিনির্মাণ, অলংকরণ, অংগরচনা অথবা বর্তমানের painiting এবং সঞ্জীব অর্থাৎ প্রয়োজনবোধে মঞ্চে জীবন্ত জীবাদির সমাবেশ প্রভৃতি আহার্য-অভিনয়ের আওতায় পড়ে। হাল্কা বস্তু দিয়ে পর্বত, রথাদি নির্মাণ ক'রে বাস্তবের মায়াসৃষ্টির জন্যে মঞ্চে সন্নিবেশ করে অভিনয়কে যতদূর সম্ভব realistic করার নির্দেশ দিয়েছেন ভরত। এই প্রসংগে বর্তমানের বিদগ্ধ সমালোচক ডঃ সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের কথাগুলো বিশেষ স্মরণীয়।—

It however, must be assumed that as models of hills and palaces have been prescribed by Bharata to be used on the stage, and as these were actually used, there were certainly some means for the shifting of such pustas. In ancient Indian theatre, neither there was any painted scene nor even the possibility of producing any light effect. In creating dramatic illusion, actors in these days had to depend mainly on their voice and skill in recitation and partly on dance, music, make-up and costumes. Conditions of stage representation prevalent in a particular age are mainly responsible for the particular pattern of dramatic literature produced in that age.

This is why we come across numerous description of time and place in rhythmic prose and verse in any Sanskrit drama. Shakespeare used long solioquies and descriptive passages in his dramas mainly to overcome the handicap imposed upon by the want of painted scene and suitable light arrangement in Elizabethan stage. Indian seers and artists, however invented the use of suggestive sets with pustas to overcome this difficulty long before the Europeans could conceive of it. It is really interesting that centuries before the use of even painted hanging scenes by European theatres, not to speak of the most modern device of sets, ancient Indian theatre attained success in creating dramatic illusion with suggestive sets.'

(S. Chatterjee *Our heritage* IX, Part II. P. 81)

পুস্তকব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল দর্শকের হৃদয়ে ব্যঞ্জনা উদ্রিক্ত করা ।বর্তমানে যেমন কোথাও কোথাও শুধু বিদ্যুতের খেলা এবং মঞ্চকলার যাদুর দ্বারাই দর্শককে মুগ্ধ করা হয়, তখন কিন্তু তা হ'ত না। দর্শককেও ভাবতে হবে, তার হৃদয়ের সুপ্ত রসবোধকে জাগ্রত ক'রতে হবে—এই ছিল নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ। এই প্রসংগে বলা চলে—

'The object of a dramatic presentation, according to the Indian ideal, is to evoke an aesthetic pleasure in the minds of the spectators and the propounders of theories in ancient India were fully conscious about the limitation of realism in the matter. In fact, stark realism was never favoured in any form of Indian art. This shows that ancient Indian theatre was very cautious regarding the use of accessories and a harmonius blending of the realistic and suggestive practices -- was the result.' (ঐ)

নাটকে একদিকে রয়েছে রসস্রষ্টা, আরেকদিকে রয়েছে রসভোক্তা—আর এদের মাঝখানে রয়েছে মঞ্চ ও অভিনেতা। রসভোক্তা তথা দর্শকের সম্বন্ধেও আমাদের এই অধিকারবাদের দেশে কিছুটা বাছ বিচার ছিল। অপরিচিত, শস্ত্রপাণি, অনাচারী, পীড়িত, পাষণ্ড এবং যারা অভিনয়ে অনভিজ্ঞ, নাট্যসভায় তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। অযোগ্য পাত্রে রস পরিবেশনে তাঁরা ছিলেন নারাজ।

মধ্যস্থ, সাবধান, অচঞ্চল, ন্যায়বাদী, নিরহংকার, 'রসভাবাভিজ্ঞ, সানন্দচিত্ত

এবং গুণদোষ নিরূপণে অভিজ্ঞ কলারসিকেরাই নাট্যসভার সদস্যপদ লাভে যোগ্য বিবেচিত হ'তেন। আমাদের আলংকারিদের ভাষায় দৃশ্য-শ্রব্য সকল কাব্যেরই আবেদন সহৃদয়ের নিকট। আর সেই সহৃদয়ত্ব প্রভৃত অনুশীলন-সাপেক্ষ। সহৃদয়ের সংজ্ঞাবিশ্লেষণে আলংকারিক বলছেন—

'যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্ বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তেঽহত্র হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ।'

'কাব্যের নিয়ত অনুশীলনের অভ্যাসবশে যাঁদের মলিন চিত্তদর্পণ স্বচ্ছ হ'য়ে গেছে এবং ফলে যাঁর শুদ্ধ হৃদয়-দর্পণে কাব্যবর্ণিত বস্তুর বিম্ব সুন্দর ভাবে প্রতিবিম্বিত হয় এবং সেই প্রতিবিম্ব দর্শনে যিনি আনন্দে তন্ময় হ'য়ে যেতে পারেন, তিনিই সহৃদয়। তাঁরা ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর কাব্যরস পরিবেশন ক'রতেন এই সহৃদয় সহমর্মীদেরই জন্য। আর এই নাট্যবেদের যাঁরা প্রয়োগ ক'রবেন, তাঁদেরও হতে হবে মহর্ষি ভরতের ভাষায় —'কুশলা যে বিদগ্ধাশ্চ প্রগল্ভাশ্চ জিতশ্রমাঃ'—সুনিপুণ, বিদ্বান, সাহসী এবং পরিশ্রমী।

মানুষের ঊষর জীবন-মরুতে আনন্দের অভিষিঞ্চনই হ'ল নাটকের কাজ। যুগযুগান্ত ধ'রে মানবসমাজ এই আনন্দের সন্ধানে ক'রেছে যাত্রা। নিখিল জ্ঞান, শিল্পকলা, যোগ এবং বিদ্যার আকর, ধর্ম, যশ এবং বুদ্ধির বিবর্ধক, লোকোপদেশজনক, সকল আর্তজনের বিশ্রান্তিজনক এবং আনন্দদায়ক হ'ল এই সার্থক নাটক—

'দুঃখার্তানাং শ্রমার্তানাং শোকার্তানাং তপস্বিনাম্।
বিশ্রান্তিজননং কালে নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি॥
ধর্ম্যং যশস্যম্ আয়ুষ্যং হিতং বুদ্ধিবিবর্ধনম্।
লোকোপদেশজননং নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি॥
ন তজ্‌জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
নাসৌ যোগো ন তৎকর্ম নাট্যেঽস্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে॥'

(না-শা ১।১১৪ ১৬)

চিরন্তন রসপিপাসুরা এই নাট্যরস আস্বাদন ক'রে 'আনন্দে করুক্ পান সুধা নিরবধি।' *

৬ষ্ঠ বংগ নাট্যসাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে বিশ্বরূপা রংগমঞ্চে ৩০শে মার্চ ইং ১৯৬৪ বিশেষ আমন্ত্রণে প্রদত্ত ভাষণ এবং ১৩৭১এর জ্যৈষ্ঠের মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে সরস্বতী

কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পুরস্কার' কবিতায় 'কবিকণ্ঠে' সরস্বতীর বন্দনা করে আর্তি নিবেদন করেছেন—

প্রকাশো, জননী, নয়নসমুখে
প্রসন্ন মুখছবি।
বিমল মানসসরসবাসিনী,
শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী,
বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী
কমলকুঞ্জাসনা,
তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন
খ্যাপার মতন আছি চিরদিন
উদাসীন আনমনা।...
শুধু ও-চরণ হৃদয়ে বিরাজে,
শুধু ওই বীণা চিরদিন বাজে,
স্নেহসুরে ডাকে অন্তরমাঝে—
আয় রে বৎস, আয়,
ফেলে রেখে আয় হাসি-ক্রন্দন,
ছিঁড়ে আয় যত মিছে বন্ধন,
হেথা ছায়া আছে চিরনন্দন
চিরবসন্ত বায়।'
সেই ভালো মা গো যাক যাহা যায়,
জন্মের মতো বরিনু তোমায়,
কমলগন্ধ কোমল দু'পায়
বার বার নমো নম।

শুধু কবিমানস নয়, শাশ্বত ভারতীয় মানসের এইটিই হল চিরন্তন আর্তি। আর তারই পরিণতিতে ভারতীর আরতি তথা সরস্বতীর সাধনা মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে। ঋতুচক্রের আবর্তনে ধরণীর দ্বারে তখন বসন্ত জাগ্রত বলে এই পুণ্য তিথিকে বাসন্তী পঞ্চমীও বলা হয়। বিদ্যামন্দিরে ও ঘরে ঘরে হয় জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী এই সর্বশুক্লার বন্দনা। বসন্ত ঋতুর অর্ঘ্য কিংশুক কুসুম এবং আম্র মুকুল এই পূজার অন্যতম উপচার। দেবীর সঙ্গে পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র,

মস্যাধার এবং লেখনীও হয় পূজিত। মন্ত্রে, ছন্দে এবং কালোচিত বস্ত্রসজ্জায় এ যেন সামগ্রিক সংস্কৃতিরই এক অধ্যাত্ম উৎসব।

এই পূণ্যতিথিতেই সারস্বতোৎসব পালনের জন্য ব্যবস্থা দিলেন বাঙালি নিবন্ধকার স্মার্ত-রঘুনন্দন।

'মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চমী যা শ্রিয়ঃ প্রিয়া।
তস্যাং পূর্বাহ্ণ এবেহ কার্যঃ সারস্বতোৎসবঃ ॥'

অতি প্রাচীন কালে সরস্বতী পূজা হত কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় ব্যবস্থা অনুসারে নবমীতে এবং শতপথ ব্রাহ্মণের মতে পূর্ণিমায়। বাংলার বাইরে বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থানে কোথাও কোথাও আশ্বিনের শুক্লা অষ্টমীতে সরস্বতী পূজা হয়ে থাকে। 'বিধান-পারিজাতে' আছে—

'আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে মেধাকামঃ সরস্বতীং।
মূলেনাবাহয়েদ্দেবীং শ্রাবণেন বিসর্জনম্ ॥'

রুদ্রযামলের নির্দেশ—'মূলঋক্ষে সুরাধীশ পূজনীয়া সরস্বতী।'

কালক্রমে শীতের জড়তার অবসানে নব বসন্তের রম্য পরিবেশে জাড্যনাশিনীর পূজায় বাঙালি হ'ল উদ্বুদ্ধ। জাড্য মানে জড়তা ও অজ্ঞানতা দুইই। বসন্তে নিসর্গজগতে দেখা যায় তরু-লতায়, নব কিশলয়ে-কুসুমে প্রাণের স্পন্দন। তারই সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মানবজীবনেও চেতনার জাগরণ অপেক্ষিত। তাই এই ঋতুতেই চৈতন্যময়ী দেবী সরস্বতীর আরাধনা বঙ্গমানসের এষণা।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় অনুশাসনে প্রতিটি ব্যক্তির নিত্য অবশ্যকরণীয় পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্যতম হল ব্রহ্মযজ্ঞ, তথা শাস্ত্রপাঠ তথা অধ্যয়ন। আজীবন জ্ঞানের নিত্য অনুশীলন ভারতীয় শাস্ত্র-শাসিত সমাজের বৈশিষ্ট্য। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পাঠ গ্রহণ সমাপ্ত করে সংসারে প্রবেশ করতে চলেছে অধীতবিদ্য কর্মার্থী। তখন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপদেশের দ্বারা তাকে গুরু স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন —'স্বাধ্যায়ান্ মা প্রমদ,—'অবশিষ্ট জীবনেও নিজের নিত্য অধ্যয়ন হতে কখনো বিরত হ'য়ো না।' জ্ঞানের নিত্য সাধনার দ্বারা মনের নিত্য মার্জনা ভারতীয় সংস্কৃতির বিধান। এই বিশেষ জীবনে প্রত্যয়নিষ্ঠ সমাজে শিক্ষা ছিল সর্বজনীন এবং সার্বকালিক। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর সাধনাও ছিল সর্বত্র প্রসারিত। আজকের সরস্বতী পূজাও সেই সাধনারই আনন্দময় অনুবর্তন।

বেদাঙ্গ নিরুক্ত গ্রন্থে সরস্বতী শব্দের দ্বারা নদী এবং দেবীবিশেষকে বোঝান হয়েছে। ঋগ্‌ভাষ্যে বলেছেন—'দ্বিবিধা হি সরস্বতী—বিগ্রহবদ্দেবতা নদীরূপা চ।' সরস্বতী শব্দের ব্যুৎপত্তি হচ্ছে সরস্ + বতুপ্ + ঙীপ্। 'সরস্' শব্দের অর্থ জ্যোতিঃ, জল এবং অমৃত। তাই, জ্ঞানের জ্যোতিতে অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করেন এই জ্যোতির্ময়ী দেবী সরস্বতী। অন্ধকার হতে আলোর পথে নিয়ে যাবার আকুতি তাই ঋষিকণ্ঠে—'তমসো মা জ্যোতির্গময়'। মৃত্যু হতে

অমৃতের পথে গমনের বাসনা আমাদের আছে বলেই বলি—মৃত্যোর্মা ইমৃতং গময়।' উপনিষদ্ বলছেন—বিদ্যার দ্বারাই অমৃতকে লাভ করা যায়—'বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।' সেই বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী যিনি—অমৃত অর্থে সরস্ + বতী, তিনিই হলেন সরস্বতী। লব্ধ জ্ঞানকে স্বর বা ধ্বনির দ্বারাই তো আমরা প্রকাশ করি। তাই 'দেবী পুরাণে' বলা হচ্ছে—

"স্বরাঃ স্বরণশীলত্বাদ্ গেয়াখ্যাং সপ্তকীর্তিতাঃ।
অতিপ্রাপণ-দানে বা তেন দেবী সরস্বতী॥"

লব্ধ জ্ঞানকে বাক্যের মাধ্যমে যেমন ব্যক্ত করা হয়, তেমনি সঙ্গীতের সুর-লহরীতেও প্রকাশ করা চলে। সেই সুর তথা স্বর হল—ষড়জ-ঋষভ-গান্ধার-মধ্যম-পঞ্চম-ধৈবত-নিষাদ সাতটি। তাই এই দেবী বাক্য এবং গান উভয়েরই অধিষ্ঠাত্রী। সুর এবং স্বর—দুইই তাঁর কৃপাসাপেক্ষ।

অমর সিংহের মতে ইনিই হলেন—ব্রাহ্মী, ভারতী, ভাষা, গীর্, বাক্, বাণী, সরস্বতী। শব্দ-রত্নাবলীতে এঁকে বিভিন্ন নামে পরিচিত করা হয়েছে, যেমন ইরা, সারদা, গিরা, গিরাং দেবী, গীর্দেবী, ঈশ্বরী, বাচা, বচসামীশা, বাগ্দেবী, বর্ণমাতৃকা। 'কবি কল্পলতায়' এঁকেই বলা হয়েছে—বাক্যেশ্বরী, অন্ত্য-সন্ধ্যেশ্বরী সায়ংসন্ধ্যাদেবতা। বৈদিক এবং পৌরাণিক নানা কাহিনী এবং তত্ত্বের নিষ্কর্ষস্বরূপ ঐতরেয় এবং শতপথ ব্রাহ্মণের সূত্রাকার বাক্যটিকেই সারস্বত সাধনার উৎস স্বরূপ বলা চলে—'বাগ্বৈ সরস্বতী'। যজুর্বেদের কথা অনুসারে বাক্যের দ্বারা ইন্দ্রকে বলাধান করায় এঁকে বলা হয় বাগ্দেবতা। ঋগ্বেদে দেবী সরস্বতীকে মাতৃগণের মধ্যে, নদীগণের মধ্যে এবং দেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা বলে বন্দনা করা হয়েছে—

'অম্বিতমে নদীতমে দেবীতমে সরস্বতি' (২—৪১—১৬)

সরস্বতী নদীর তীরে ছিল বৈদিক ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধনতীর্থ। পারসিক ধর্মাবলম্বীদের পুণ্যগ্রন্থ 'জেন্দ্-অবেস্তা'য় আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে 'হরখৈতী' নদীর উল্লেখ রয়েছে। সেইটিই হল বেদপ্রসিদ্ধা 'নদীতমা' সরস্বতী। হিমালয়ের প্লক্ষ প্রস্রবণ হতে উৎপন্ন হয়ে সিন্ধু, পাঞ্জাব, গুজরাট, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নানা ধারায় প্রবাহিত হয়ে সোমনাথের নিকটে প্রভাস তীর্থ-সমীপে সমুদ্রে আত্মসমর্পণ করেছে এই নদী। ভৌগোলিক কারণে নানাস্থানে সরস্বতীর ধারা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় তার আরেক নাম বিনশন। কিন্তু, তাকে কেন্দ্র করে যে সব তীর্থ সেকালে গড়ে উঠেছিল, তার চিহ্ন আজো বহু স্থানে বিদ্যমান। হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে ক্ষীণধারায়, গুজরাটের সিন্ধপুরে বিশাল বালুকাময় খাতে সূক্ষ্মধারায়, প্রভাসে শীর্ণধারায় এবং উত্তর প্রদেশের প্রয়াগে ত্রিবেণীর সরস্বতী ঘাটের সন্নিকটে দুর্গমধ্যে কূপাকারে আজও সরস্বতীর অস্তিত্ব আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। বৈদিক আর্যদের মতে সরস্বতীর পবিত্রতার জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং দেবতাগণ পূর্বকল্পে এর তীরেই

যজ্ঞ করেছিলেন। এই স্থানটিকে বলা হয় 'ব্রহ্মাবর্ত'। সর্বোত্তম তপঃস্থলী এবং রম্য বাসস্থান রূপে সরস্বতীর তীরকেই তাঁরা চিহ্নিত করেছেন। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে—'সরস্বতী-দৃশদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।

তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে॥'

যে কোন ধর্ম-কর্মে ভারতের সকল প্রদেশেরই সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বিভিন্ন পুণ্যতোয়া নদীকে আবাহন করার সময় সরস্বতীর নাম উচ্চারণ করেন।

'গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।

নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥'

বৈচিত্র্যময় ভারত একই সারস্বত-চেতনায় আজও সংঘবদ্ধ। একসময় এই সরস্বতী ছিল খরস্রোতা এবং পৃথুলা। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ৯৫ সংখ্যক সূক্তের অনবদ্য বন্দনায় সরস্বতীকে বলা হচ্ছে—'শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা করার জন্য সুরক্ষিত দুর্গের লৌহ কপাটের মত কাজ করছে সরস্বতী। বিপুল জলরাশি নিয়ে বেগে ধেয়ে চলেছে এই নদী, সুভগা সরস্বতী নানাভাবে জনজীবনকে করছে সমৃদ্ধ।'

'প্র ক্ষোদসা ধায়সা সস্র এষা সরস্বতী

ধরুণমায়সী পূঃ।

প্রবাবধানা রথ্যেব যাতি বিশ্বা অপো মহিনা

সিন্ধুরন্যাঃ॥

একা চেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী

গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ।

রায়শ্চেতন্তী ভুবনস্য ভূরের্ঘৃতং পয়ো দুদুহে

নাহুষায়॥

মহাভারতের 'শল্য-পর্বে' বলদেব তীর্থযাত্রায় সরস্বতী নদীকে দেখে সুপ্রীত। অনন্য ভক্তির সঙ্গে সরস্বতী নদীর মহিমা কীর্তন করে তিনি বলেছেন—

'সরস্বতী-বাসসমা কুতো গতিঃ?

সরস্বতী-বাসসমা কুতো গুণাঃ?

সরস্বতীং প্রাপ্য দিবং গতা জনাঃ।

সদা স্মরিষ্যন্তি নদীং সরস্বতীম্॥'

তিনি আরও বলেন—

'সরস্বতী সর্বনদীষু পুণ্যা

সরস্বতী লোক-সুখাবহা সদা।

সরস্বতীং প্রাপ্য জনাঃ সুদুষ্কৃতম্

সদা ন শোচন্তি পরত্র চেহ চ।'

যা হোক, একই সরস্বতী ভূলোকে নদীরূপে এবং মনোলোকে দেবীরূপে

বিরাজিতা। তাঁরই বন্দনা আমাদের এই সরস্বতী-পূজা। ঋগ্‌ভাষ্যে দেবী ভারতীকে আদিত্য-সম্বন্ধিনী এবং সরস্বতীকে পৃথিবী-সম্বন্ধিনী দেবতা বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে দুই দেবীই এক হয়ে গেছেন, বৈদিক অনেক দেব-দেবী পরবর্তী যুগে হারিয়ে গেলেও দেবী সরস্বতী কিন্তু সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হতে আজও পর্যন্ত গণজীবনে তাঁর স্থান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

বৈদিক যুগে পাঁচটি মানবগোষ্ঠী সরস্বতীর সাধনা করে অভ্যুদয় লাভ করেছিল। বলা হয়েছে—'পঞ্চজাতাঃ বর্ধয়ন্তী'। তারা হল—অণু, দ্রুহ্য, পুরু, তুর্বসু ও যদু। ঋষি, রাজা এবং জনগণ সরস্বতী নদীর তীরে দেবী সরস্বতীর তৃপ্তির জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন। তাকে বলা হত—'সারস্বত সত্র'। এই সরস্বতী-যাগ নিয়ে ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে অনেক কাহিনী রয়েছে। এই সারস্বত যজ্ঞে একটি 'মেষী'কে বলি দেবার ব্যবস্থা ছিল। শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রে তাই বলা হয়েছে—'তস্য সৌত্রামণস্যাশ্বিন ঃ পশুর্লোহিতেন বর্ণেন বিশিষ্ট ঃ সারস্বতী চ মেষী ইত্যেতৌ পশু উপালম্ভৌ সবনীয়স্য।'

শতপথ ব্রাহ্মণে সরস্বতীকে বদর ফল তথা কুল দেবার বিধি আছে, যেটা এখনও আমরা সরস্বতী পুজোয় করে থাকি। এখনও অনেকেই সরস্বতী পুজোয় কুল উৎসর্গ করে পরে নিজেরা গ্রহণ করেন। সরস্বতী পূজার পূর্বে কুল খাওয়ার রীতি অনেকের মধ্যেই নেই।

যজ্ঞ কালে অপশব্দ প্রয়োগ করলে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ 'সারস্বতী ইষ্টি'র অনুষ্ঠান করতে হবে। ব্যাকরণের অজ্ঞতার জন্যই অপশব্দের প্রয়োগ হয়। তাই, ব্যাকরণ ভাল করে শেখা প্রয়োজন। পতঞ্জলি 'মহাভাষ্যের' প্রথম আহ্নিকে উপদেশ দিচ্ছেন—'সারস্বতীম্' যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি :- আহিতাগ্নির-পশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়ং সারস্বতীমিষ্টিং নির্বপেদিতি'—প্রায়শ্চিত্তীয়া মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্'।

মনুর মতে সত্যের অপলাপ এবং মিথ্যা সাক্ষ্যের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সারস্বত যজ্ঞ করতে হবে। সেই যজ্ঞে চরু দিয়ে আহুতি দিতে হবে। নাট্যশাস্ত্রে আচার্য ভরতও বলছেন—'পায়সেন সরস্বতী সম্পূজ্যা'।

ভারতে এবং ভারতের বাইরে সরস্বতীর বহুবিধ মূর্তি পাওয়া গেছে। কোথাও তিনি একক উপবিষ্টা, কোথাও বা একাকী দণ্ডায়মানা, কোথাও বা ব্রহ্মার পরিবার রূপে দণ্ডায়মানা এবং কোথাও বা বিষ্ণুর পরিজন রূপে দণ্ডায়মানা। শাস্ত্রানুসারে তিনি শ্বেতপদ্মের উপর আসীনা। শিল্পশাস্ত্রকার ময়মুনির মতেও—'পদ্মাং লক্ষ্ম্যা সরস্বত্যা ওংকারশ্চ ত্রিবর্ণকম্'।

(ময়মত-১২-৬৬)

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের মতে সরস্বতী হলেন হংসবাহনা। দক্ষিণভারতের গদকে হংসবাহনা দ্বিভুজা, মহীশূরের নেলমঙ্গলে সারদা-মন্দিরে হংসবাহনা চতুর্ভুজা সরস্বতী মূর্তি দেখা যায়। লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে হংসবাহনা

চতুর্ভুজা সরস্বতীর মূর্তি রক্ষিত আছে। তাঁর দুই হস্তে বীণা, একহস্তে অক্ষমালা এবং আর এক হস্তে পুঁথি। মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর নিকট ধারানগরীর রাজা ভোজ-নির্মিত সরস্বতী মন্দিরে ঐ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলমান আক্রমণকারীরা মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন এবং মূর্তিকে সামনের সরোবরে ফেলে দেন। পরে তাকে উদ্ধার করে লণ্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বোমবাই-এর রাজস্থানে ময়ূর-বাহনা চতুর্হস্তা সরস্বতী মূর্তি দেখা যায়। কানিংহামের মতে সরস্বতী নদীর তীরদেশে ময়ূরের আধিক্যবশতঃ তাকেই বাহনরূপে কল্পিত করা হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির গ্রন্থশালায় মেষবাহনা, বীণাপুস্তকধারিণী সরস্বতী মূর্তি সংগৃহীত রয়েছে।

বৌদ্ধমতানুসারে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর শক্তি হলেন সরস্বতী। মঞ্জুশ্রীর বাহন হল সিংহ। তাই বৌদ্ধসরস্বতীও সিংহবাহনা। গান্ধার, লাহোর, বারাণসী এবং বুদ্ধগয়ায় সিংহবাহনা সরস্বতী পাওয়া গেছে। সনাতন, পৌরাণিক, বৌদ্ধ এবং জৈন নানা কাহিনীকে অবলম্বন করে নৃত্তসরস্বতী, বীণাহস্তাসরস্বতী, পঞ্চমুখসরস্বতী, বজ্রবীণাসরস্বতী, বজ্রসারদাসরস্বতী, আর্যবজ্রসরস্বতী, নীলসরস্বতী, সপ্ততন্ত্রী বীণাবাদিনীসরস্বতী প্রভৃতি বহুরূপধারিণী সরস্বতী মূর্তি যবদ্বীপ, লেনিনগ্রাড, তিব্বত এবং জাপানে মন্দিরে ও প্রত্নাগারে রক্ষিত আছে। এইভাবে বিচিত্ররূপা সরস্বতীর বিস্ময়কর বিশ্বপরিক্রমা ভারতীয় সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয়কেই সূচিত করে। ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যারও প্রসারে, বিশেষতঃ কাব্যে, নাট্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে, আবার দর্শনে, বিজ্ঞানে, ভাষাতত্ত্বে, প্রযুক্তিবিদ্যায় ভারতীয় প্রজ্ঞার অনন্যসাধারণ বিকাশ এই সারস্বত সাধনারই ফলশ্রুতি।

দেবীভাগবত, বায়ুপুরাণ ও গরুড় পুরাণে দেবী সরস্বতীর আবির্ভাব নিয়ে রয়েছে নানা বিচিত্র কাহিনী। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে বলা হয়েছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মূর্তিতে সরস্বতীর পূজা প্রথম প্রবর্তন করেন।—

'আদৌ সরস্বতী পূজ্যা শ্রীকৃষ্ণেণ বিনির্মিতা।
যৎপ্রসাদাৎ মুনিশ্রেষ্ঠ মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ॥
প্রতিবিম্বেষু তে পূজাং মহতীং তু মুদান্বিতাঃ।
মাঘস্য শুক্লপঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভেষু চ সুন্দরি॥
মদ্‌বরেণ করিষ্যন্তি কল্পে কল্পে লয়াবধি।
জিতেন্দ্রিয়াঃ সংযতাশ্চ ঘটে চ পুস্তকেঽপি চ॥'

মৎস্যপুরাণের ৩২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে কার্পণ্য না করে এইভাবে সারস্বত ব্রত উদযাপন করলে ইহলোকে বিদ্বান্‌, ধনবান্‌ এবং সুবক্তা হয়ে পরলোকে মহনীয় স্থান লাভ করা যাবে।

'বিত্তশাঠ্যেন রহিতো বস্ত্রমাল্যানুলেপনৈঃ।
অনেন বিধিনা যস্তু কুর্যাৎ সারস্বতং ব্রতম্ ॥
বিদ্যাবান্ অর্থযুক্তশ্চ রক্তকণ্ঠশ্চ জায়তে।
সরস্বত্যাঃ প্রসাদেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥'

স্বায়ম্ভুব মাতৃকাতন্ত্রের সারস্বত পটলের মতে নাভিপদ্মে মায়ের ধ্যানান্তে পূজা-যাগ-হোম সমাপন করতে হবে। তবে বাংলায় পূজা 'তন্ত্রসারের' পদ্ধতি অনুসারেই অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তার ধ্যানবর্ণিত রূপ হচ্ছে—

'চন্দ্রের নবীন কলা তিনি ধারণ করেছেন। কান্তি তাঁর শুভ্র। বক্ষো-ভারে ঈষৎ আনতাঙ্গী তিনি শ্বেতপদ্মে সমাসীনা। হস্তে লেখনী নিয়ে লিখনে তিনি উদ্যতা। পুস্তকের দ্বারা শোভমানা এই দেবী বাক্ সকল বৈভব প্রাপ্তির জন্য আমাদের রক্ষা করুন।—'

'তরুণ-শকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ।
কুচভর নমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে ॥
নিজ-কর-কমলোদ্যল্লেখনী-পুস্তকশ্রীঃ।
সকল-বিভব-সিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্দেবতা নঃ ॥'

উপনিষদ্ বলেছেন—'দ্বে বিদ্যে অধ্যেতব্যে—পরা অপরা চ।, ব্রহ্মবিদ্যা এবং লৌকিকী বিদ্যা দুইই ভারতের প্রার্থনা। ইহকালকে তাঁরা অস্বীকার করেন্নি। জীবনকে রসে, আবার বসেও রাখার বাসনা তাঁদের পূর্ণ মনুষ্যত্ব দান করেছিল। তাই, এই দেবীর কাছে বেদবিদ্যার সঙ্গে বিবিধ শাস্ত্র এবং ললিতকলারও প্রার্থনা তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে—

'বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্বাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ।
ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ ॥

জীবনের পূর্ণতার জন্য যে অষ্টবিধ শক্তির প্রয়োজন, সেইগুলি তো তাঁরই তনু। তাই, তারো জন্য তাঁর কাছে নিবেদিত হয় আর্তি—

'লক্ষ্মীর্মেধা ধরা তুষ্টির্ গৌরী পুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ।
এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতী ॥

সরস্বতীর বন্দনা করেই মহাভারতাদির পাঠ শুরু হত—

'নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥'

'জয়' শব্দের অর্থ হচ্ছে মহাভারত। আলংকারিক আচার্য দণ্ডী সাহিত্য-তত্ত্বের গ্রন্থ 'কাব্যাদর্শের' আরম্ভে বন্দনা করেছেন এই সর্বশুক্লা সরস্বতীকেই—

'চতুর্মুখ-মুখাম্ভোজ-বন-হংস-বধূর্ মম।
মানসে রমতাং-নিত্যং সর্বশুক্লা সরস্বতী।'

বাঙালী কবি কৃত্তিবাসও বলেন—

'সরস্বতী অধিষ্ঠান, আমার শরীরে।
তাই কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতী-বরে।'

এমন কি মুসলমান কবি সুকুর মহম্মদ 'গোপী চন্দ্রের সন্ন্যাসের কথায় বলেন—

'নমো মাতা সরস্বতী বিখ্যাত সংসারে'

বর্তমানের সঙ্গীতকুলপতি ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের প্রতি প্রাতে সরস্বতীর বন্দনার কথা ভুবন-বিদিত। বৈদিকী বন্দনার ধারাকে অনুসরণ করে আজো চলেছে সুরভাষায় সরস্বতীর নিত্য নব নব রূপ-কল্পনা। আধুনিক সংস্কৃত কবি কবিশেখর বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণের বন্দনা প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যায়—

'হংসাসীনাং কমল-নিলয়াং মৌলি-বদ্ধেন্দুলেখাং
ধ্যানাতীতাং ত্রিভুবনময়ীং চিন্ময়ীং চিদ্বিলাসাং।
রম্যাং শুদ্ধাং পরমসুখদাং পাবনীং বিশ্বধাত্রীং
বন্দে বাণীং বিবুধজননীং ভারতীং জ্ঞানদাত্রীম্॥'

(কাব্যকুসুমাঞ্জলি)

বাহুল্য ভয়ে কবিকুলচক্রবর্তী কালিদাসের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তাঁর নাটকের আশুম প্রার্থনা আমরাও উচ্চারণ করি—'সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাম্।'

'বৈদিকী সাধনার মাধ্যমে সমাজে এবং রাষ্ট্রে সরস্বতী মহনীয় আসনে অধিষ্ঠিতা হোন্।' (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-ভরতবাক্য)।

পিতৃপূজা ও দেবীপূজার মহামিলনে মহালয়া

মহালয়ার পুণ্যতিথি ভারতের সামাজিক জীবনে সর্বজনীন উৎসবের আনন্দময় দিন। ধর্মকেন্দ্রিক ভারতবর্ষ জগতের আনন্দযজ্ঞে নানা উৎসবের মাধ্যমে অনুভব করেছে উপনিষদের সদুক্তির মাহাত্ম্য—'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চ ন'—ব্রহ্মের আনন্দকে যে জানতে পারে সে কোন কিছুতেই ভয় পায় না। আমাদের ঋষি পিতামহেরা ছিলেন জীবন রসিক। তাঁদের ধর্মের সংজ্ঞা—যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ—জাগতিক অভ্যুদয় এবং পারলৌকিক মুক্তি দুটিকে নিয়েই তাঁদের ধর্ম। তাই, নানা ঋতুতে তিথিতে, পর্বে বিচিত্রভাবে ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁরা করেছেন আনন্দের পথে যাত্রা। 'মহালয়া' তাই নিয়ে আসে উৎসবের আহ্বান। তবে এই উৎসব পিতৃপুরুষ এবং মহাদেবীর আরাধনায় জীবনকে করে সমুন্নত ; জীবিত এবং মৃত সকল মানুষের প্রতি ভালবাসায় হৃদয়কে করে প্রসারিত।

সৌর আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের নাম 'মহালয়' তার অমাবস্যা তিথিকে বলা হয় 'মহালয়া'। 'মহ পূজায়াম্ মহ উৎসবে'। মহ শব্দের একটি মানে পূজো আর একটি মানে উৎসব। 'মহঃ আলীয়তে অস্যাম্ (অমাবস্যায়াম্) ইতি মহালয়া।' বিশেষভাবে মহ তথা পূজো এবং উৎসব এই অমাবস্যাকে অবলম্বন করে অনুষ্ঠিত হয় বলেই এইটি মহালয়া অমাবস্যা।

আবার বলা হয়—'মহালয়ঃ—মহতাং যোগিপ্রভৃতীনাম্ আলয়ঃ,' কিংবা 'মহদাদীনাং লয়ো যস্মিন'-মহালয়ঃ স্ত্রিয়ং টাপ্-মহালয়া। মহাযোগীদের সাধনার যোগ্য সময় এই মহালয়া। মহান ব্যক্তিবর্গের জীবন পিতৃপূজো এবং শক্তি সাধনায় এই তিথিতে লয় হয়ে যায় বলে এইটি মহালয়া।

মহালয়ায় পিতৃপক্ষ বা অপর পক্ষ শেষ হল। পরদিন থেকে শুরু হল দেবীপক্ষ বা পূর্বপক্ষ। স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে—'পূর্বপক্ষো দেবানাম্, অপরপক্ষ পিতৃণামিতি'। মহালয়া অমাবস্যাতে যে কৃষ্ণপক্ষের পরিসমাপ্তি, তাই হল অপরপক্ষ বা পিতৃপক্ষ। এই পক্ষে স্বর্গতঃ পিতৃপুরুষের উদ্দেশে নিত্য বিশেষ তর্পণ এবং মহালয়া অমাবস্যায় পর্বদিন বলে বিশেষ পার্বণ শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্তব্য। ভবিষ্যপুরাণে বলা হয়েছে—

'অমাবস্যায়াং যৎ ক্রিয়তে তৎপার্বণমুদাহৃতম্।
ক্রিয়তে পর্বণি বা যৎ তৎ পার্বণমুদাহৃতম্।'

তিথিতত্ত্বে বলা হয়েছে—'মহালয়ে কন্যাগতাপরপক্ষ'। মহালয়ার পার্বণ-

শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্তব্য। যদি কোন কারণে না হয়, তাহলে দীপান্বিতায় সেটি করতেই হবে।

'যেয়ং দীপান্বিতা রাজন্ খ্যাতা পঞ্চদশী ভুবি।
তস্যাং দদ্যান্ন চেন্দত্তং পিতৃণাং বৈ মহালয়ে॥' (তিথিতত্ত্ব)

যমলোক থেকে মর্ত্যলোক এই সময়ে পিতৃপুরুষেরা আসেন এবং ভূত চতুর্দশীতে তাঁরা আবার স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁদের পথকে আলোকিত করার জন্য উল্কা দান করা হয়।—

'যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মহালয়ে।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা বর্ত্ম প্রপশ্যন্তো ব্রজন্তু তে॥'

মহালয়া থেকে দীপান্বিতার মধ্যে পার্বণ শ্রাদ্ধ না করলে—

'নিঃশ্বস্য পিতরো যান্তি শাপং দত্ত্বা সুদারুণম।'

এই অমাবস্যায় পিতৃপূজো সেরে দেবীপূজোয় প্রবৃত্ত হতে হবে প্রতিপদ থেকে। পিতৃপক্ষ এবং দেবীপক্ষের সন্ধিলগ্ন হল এই মহালয়া। পিতৃপূজোর দ্বারাই দেবীপূজোর অধিকার অর্জন করতে হবে। পিতৃপূজো এবং দেবীপূজোর মহামিলন কাল হল এই মহালয়া। এই অমাবস্যার আগে এবং পরে দুই দিকেই শ্রদ্ধা সহকারে মহতের সাধনায় তথা পিতৃপূজো এবং দেবীপূজোর দ্বারা আমরাও মহান হবার চেষ্টা করি। তাইতো এই অমাবস্যা সর্বতোভাবে মহালয়া।

সনাতনী হিন্দুর জীবনে যে আচরণবিধি বা কোড্ অফ্ কনডাক্ট্ তাতে রয়েছে নিত্য পাঁচটি কাজের অবশ্য করণীয়তা। ব্রহ্মযজ্ঞ তথা বেদপাঠ তথা শাস্ত্রচর্চা, দেবযজ্ঞ তথা দেবার্চনা, পিতৃযজ্ঞ তথা স্বর্গত পিতৃ-পুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ তর্পণ, নৃযজ্ঞ তথা অতিথিসেবা এবং ভূতযজ্ঞ তথা পশুপক্ষীকে আহার্যদান। 'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনীপরে'— এই হল হিন্দুর জীবনবেদ। বিশ্বভুবনের সকলের প্রতিই রয়েছে প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। নিত্য বেদাদি শাস্ত্র পাঠের দ্বারা পরিশীলিত চিত্তটি নিয়ে ইহলোকের এবং স্বর্গত সকল জীবের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রীতি নিয়ে সমুন্নত জীবনের অধিকারী হওয়াই জীবনের লক্ষ্য। তারই ধারা পথে পিতৃপূজো তথা শ্রদ্ধা সহকারে স্বর্গতদের প্রতি কর্তব্য পালন হচ্ছে এই শ্রাদ্ধ। গোভিল গৃহ্যসূত্রের নির্দেশ-'শ্রদ্ধান্বিতঃ শ্রাদ্ধং কুর্বীত'। ধর্মকার্যে সুগভীর প্রত্যয়ই হল শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাহীনের শ্রাদ্ধের অধিকার নেই। দেবল-সংহিতায় তাই বলা হয়েছে—'প্রত্যয়ো ধর্মকার্যেষু তথা শ্রদ্ধেত্যুদাহৃতা।

নাস্তি হ্যশ্রদ্ধধানস্য ধর্মকৃত্যে প্রয়োজনম্।'

শ্রাদ্ধতত্ত্বে তাই বলা হচ্ছে—'শ্রদ্ধয়া অন্নাদের্দানং শ্রাদ্ধম্।' মহর্ষি বৃহস্পতির মতে এই শ্রাদ্ধ হল পাঁচ রকমের।

'নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং তথৈব চ।
পার্বণঞ্চেতি মনুনা শ্রাদ্ধং পঞ্চবিধং স্মৃতম্॥'

মহালয়া অমাবস্যা বিশেষ পর্বদিন। তাই এই দিনের করণীয় শ্রাদ্ধও পার্বণ শ্রাদ্ধ। তৃপ্তির জন্য যে মন্ত্রপূত জল প্রদান করা হয়, তাই হল তর্পণ। পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্যতম পিতৃযজ্ঞ এই তর্পণের মাধ্যমে নিত্য সম্পাদিত হয়। নশ্বর দেহের মধ্যে অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্ব ঋষিদের আবিষ্কার। বিদ্যুৎ শক্তি এবং কাঁচের বাল্ব যেমন পৃথগ্‌ বস্তু, তেমনি দেহ এবং দেহীও পৃথক। জীর্ণ বসনের মত জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে আত্মার নূতন দেহ পরিগ্রহের জন্য যাত্রাই হল মৃত্যু। বাল্বের বিনাশে যেমন বিদ্যুতের বিনাশ হয় না। তেমনি এই পাঞ্চভৌতিক দেহের বিনাশে দেহী তথা আত্মারও বিনাশ হয় না। আত্মার স্থানান্তরে দেহান্তরে অবস্থিতির প্রত্যয় থেকেই শ্রাদ্ধ তর্পণের উদ্ভব।

শ্রাদ্ধ এবং তর্পণের মন্ত্রে রয়েছে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত হবার অপূর্ব আকুতি। ছন্দে, ঝংকারে, অর্থে মন্ত্রের মাহাত্ম্য মনকে করে প্রশস্ত। প্রথমেই করা হয় তীর্থ-আবাহন। কুরুক্ষেত্র (হরিয়ানায়), গয়া (বিহারে), গঙ্গা (সমগ্র উত্তর ভারতে), প্রভাস (গুজরাটে), পুষ্কর (রাজস্থানে) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রান্তের তীর্থকে আবাহন করে নিখিল ভারতীয় ঐক্যচেতনায় চিত্তকে করা হয় সমৃদ্ধ।—

'কুরুক্ষেত্র-গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে (শ্রাদ্ধকালে বা) ভবন্তিহ॥'

গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী প্রভৃতি ভারতের পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের পুণ্যতোয়া নদীগুলিকে আবাহনের দ্বারা সর্বভারতীয় ভাবগত সংহতিকে করা হয় উদ্দীপ্ত। প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতার অপবুদ্ধি থেকে চিত্তকে মুক্ত করা হয় এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।—

'গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্‌ সন্নিধিং কুরু॥'

এই মন্ত্রপাঠে সনাতন ধর্মীয় ভারতীয়ের কাছে তাই ভারতের কোন অংশই অপবিত্র বা ত্যাজ্য নয়। এই মন্ত্রে প্রত্যয়শীল ব্যক্তিই বিবেকানন্দের বীরবাণী উপলব্ধি করতে পারেন—'সমগ্র ভারতবর্ষই আমার স্বদেশ। ভারতবাসী মাত্রই আমার ভাই।' ইতিহাসে দেখা গেছে হিন্দু ভারতে বিভিন্ন রাজার প্রশাসন সত্ত্বেও ধর্ম এবং সংস্কৃতির ঐক্যসূত্রেই সকল ভারতবাসী সেদিন ছিল সংঘবদ্ধ। এক রাজ্যের লোক নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে অন্য রাজ্যে তীর্থযাত্রা করতেন। জিজিয়া-করাদি স্থাপনের মাধ্যমে মুসলমান শাসনে এল তার প্রতি বাধা। ধীরে ধীরে এল সংকীর্ণতা।

হিন্দুর ধর্মানুশীলনসঞ্জাত উদার অনুভূতিরই পরিণতি বিশ্বপ্রেমে উত্তরণ। এই অনুষ্ঠান নিয়মিত করতে করতেই তাঁরা শেষে অনুভব করতেন আচার্য শঙ্করের বাণীর মর্মরূপ।—

'মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্‌॥'

আস্তিক এবং নাস্তিক বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীপরতন্ত্রতা যখন ছলে বলে কৌশলে অন্য মতাবলম্বীদের নির্লজ্জ নিষ্ঠুর হত্যার মাধ্যমে সভ্যতাকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে তখন এই সমুদার মানবতার প্রয়োজন ঘোষণা করে আরনল্ড্ টয়েনবী বলছেন—'In this superemely dangerous moment of world history the Indian wa is the only way of salvation.' তর্পণের মন্ত্রে নিজের স্বর্গত পিতৃপুরুষের সঙ্গে সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরার সকল প্রয়াত মানুষের, এমনকি ইহ এবং পূর্বজীবনের প্রয়াত শত্রুরও প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন অভিব্যক্ত।—

'আ-ব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা দেবর্ষি-পিতৃ-মানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥
যে বান্ধবা অবান্ধবাঃ বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্‌ক্ষিণঃ॥'

শ্রাদ্ধের মন্ত্রে নিজের পিতৃপুরুষের সঙ্গে পিণ্ডদান করা হচ্ছে, যাদের মা-বাবা-বন্ধু কেউ নেই সেই সব অজ্ঞাতকুলশীল প্রয়াত ব্যক্তিদেরও জন্য।

'যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্—
নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথাঽন্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ
প্রয়াস্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ॥'

সংস্কৃত ভাষা জেনে মন্ত্রার্থ উপলব্ধি করে শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রাদ্ধ তর্পণেরই ফলশ্রুতি এই সার্বভৌম মানব-প্রেম। চর্যার মাধ্যমে চর্চার সার্থকতা। তাই বলা হয়—'আচারপ্রভবো ধর্মঃ'।

অর্জিত সম্পদে কেবল নিজের ভোগ নয়, সকলের মধ্যে বিলিয়ে দেবার মধ্যেই তার সার্থকতা তাঁরা খুঁজে পান। ভোগ্য বস্তু সংগ্রহের মাধ্যমে নিজের জীবনের মানোন্নয়ন নয়, সর্বজনের মধ্যে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বেচ্ছায় স্বোপার্জিত অর্থের বণ্টনেই তাঁদের সন্তোষ। বেদাবিহিত জ্ঞান, দাতা, শ্রদ্ধা, অতিথি এবং অন্নের বিবর্ধনই শ্রাদ্ধকারীর কামনা। শ্রাদ্ধান্তে আশীর্বাদগ্রহণ কালে তিনি বলেন—

'দাতারো নোঽভিবর্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্ বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি॥
অন্নং চ নো বহু ভবেদ্ অতিথীংশ্চ লভেমহি।
যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিস্ম কঞ্চন॥
অন্নং প্রবর্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু॥

অপরের সম্পদ এবং প্রাণ ছিনিয়ে নেওয়া রাজনৈতিক দৃষ্টিতে যে কালে

আইনসঙ্গত এবং গৌরবজনক বলে ঘোষিত হয়, তখন নিজের সম্পদ অপরকে বিলিয়ে দেবার এই এষণা যুগান্তরের সূচনা করে।

জীবন-মৃত্যুর দোলায় বাঁধা সংসারে যে দিন-তিথি-মাস-ঋতু-বৎসররূপে মহাকাল নিত্য লীলা করে চলেছেন শ্রাদ্ধের মাধ্যমে তাঁদেরও জানান হয় প্রণতি।

'বসন্তায় নমস্তুভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমোনমঃ।
বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞঋতবে চ নমঃ সদা ॥
হেমন্তায় নমস্তুভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ।
মাস-সংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ ॥'

সবশেষে শ্রাদ্ধান্তে উপনিষদের মন্ত্র পাঠ করে মাটির পৃথিবীকে মধুময় দেখা এবং করার সংকল্প ঘোষণা করেন শ্রাদ্ধকারী—

'মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥
মধু নক্তমুতোষসো, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাংস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥

এই অনুভূতিই তো ভাষান্তরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে হয়েছে উচ্চারিত—

'এ দ্যুলোক মধুময় মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী'

মহালয়ায় পিতৃপূজা সেরে শ্রদ্ধা-শুদ্ধ চিত্তে দেবীপূজায় হতে হবে প্রবৃত্ত। আমাদের শ্রদ্ধাকে পিতৃলোক হতে দেবলোকে নিয়ে যায় এই মহালয়া। প্রতিপদ থেকে মহাদেবীর পূজায় শান্তি, শক্তি এবং তৃপ্তির সন্ধানে যাত্রা করে সাধক। বিশ্বভুবন এবং মানবচিত্তে দেবীবন্দনার মন্ত্র হয় তখন মন্দ্রিত। মহামাতৃকার চরণে জীবনকে বিলীন করে দেবার প্রেরণা নিয়ে মহালয়া আমাদের জানায় আহ্বান—

আয়ন্তু সর্বতঃ সর্বে দেবীপূজা সমাগতা।
পিতৄন্ সম্পূজ্য লোকেঽস্মিন্ যান্তু দেবীপদাশ্রয়ম্ ॥

শক্তি-সাধনায় দেবী চণ্ডী

জীবন ও জগতের অন্তরালে এক মহতী শক্তির অস্তিত্ব ভারতীয় ঋষির আবিষ্কার। তাঁদের দৃষ্টিতে তিনি কল্যাণী এবং লীলাময়ী। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আজকের উন্নত বিজ্ঞানও এই সত্যে উপনীত। প্রাচীন ঋষির সাধনালব্ধ অনুভূতি এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিকের তত্ত্বানুসন্ধান ইদানীং একই সত্যে প্রতিষ্ঠিত। এখন বিজ্ঞানের গবেষণাগারে শক্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণ যেমন চলছে, তেমনি ঘরে, বনে, মনের কোণে, পথে প্রান্তরে মন্দিরে চলেছে শক্তিসাধনার ব্যক্তিগত ও সর্বজনীন আয়োজন। সর্বজনের হিতার্থে সর্বজনের মিলনে শক্তিসাধনার লোকপ্রিয় রূপ এই সর্বজনীন দুর্গাপূজা। বাঙালীর সামাজিক জীবনে আপামর জনসাধারণের এইটিই হল সর্বতোব্যাপ্ত অনুষ্ঠান। আর্থিক দৈন্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, গোষ্ঠী বা সরকারবিশেষের তত্ত্বগত যত অনীহাই থাকুক না কেন, জনতা জনার্দনের হৃদয় হতে স্বত উৎসারিত ভক্তির আর্তি মাতৃচরণে নিবেদিত হবেই—এটা বস্তুগত সত্য।

দুর্গোৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ হল মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সপ্তশতী চণ্ডীপাঠ। এই অংশে সাতশত মন্ত্র থাকায় তাকে 'সপ্তশতী' বলা হয়। এই পুণ্য গ্রন্থের আরাধ্যা দেবী দুর্গাও চণ্ডী এবং চণ্ডিকা নামে বহু যুগ ধরেই বন্দিতা। চণ্ডী বলতে গ্রন্থবিশেষ এবং মহাদেবী—দুইকেই বোঝান হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত ত্রয়োদশ অধ্যায়টিই হল দেবীমাহাত্ম্য। এইটিই 'চণ্ডী' নামে বিখ্যাত শাক্ত শাস্ত্র, শক্তিসাধকদের সর্বাধিক প্রিয় এবং অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থরত্ন। এই চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিত দেবীই চণ্ডী নামে সমধিক প্রসিদ্ধা। তিনিই যুগে যুগে দেশে দেশে বিচিত্র রূপে মর্মজ্ঞ সাধকের দ্বারা বন্দিতা লোকজীবনে পূজিতা। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বর্ষীয়ান্ সাধক থেকে শুরু করে অজ্ঞ অবোধ শিশু পর্যন্ত সকলেই মাতৃনামে আত্মহারা। তাই, দেবীপূজার সর্বাতিশয়ী ধারা এবং সর্বতঃপ্রসারী রূপ ভারতীয় গণজীবনের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

এই দেবীবন্দনার উৎসানুসন্ধানে যাত্রা করলে স্বাভাবিক ভাবেই যেতে হয় বৈদিক সাহিত্যের ঊর্ধ্বলোকে। পরবর্তীকালে যিনি অসুরনাশিনী চণ্ডী, দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, অভয়দায়িনী অভয়া, মাঙ্গল্যদায়িনী সর্বমঙ্গলা, কালাতীতা কালিকা, রাষ্ট্রশক্তিরূপিণী রাষ্ট্রী, তিনিই মহাশক্তিরূপে বেদে আবির্ভূতা। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে সাধকের সাধনার বৈচিত্র্যে মহাশক্তি বিভিন্ন রূপে হন প্রকটিতা। চণ্ডীপাঠের সময় ঋগ্বেদের যে দেবীসূক্ত পাঠ করা হয় তাতে, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ এবং বহু ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদেও শক্তি সাধনার সন্ধান যথেষ্টই মেলে। এমনকি ভারতের বাইরেও গ্রীসের রহী,

এশিয়া মাইনরের সিবিলী, মিশরের ইস্‌হার এবং আইসিস্, ভূমধ্যসাগরের ক্রীট দ্বীপে সিংহবাহিনী শৈলবাসিনী দেবীর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। মাতৃ তথা শক্তিসাধনার বিশ্বপরিক্রমা ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয়। ভারতীয় দেবী-বন্দনার এই প্রকার বিশ্বতোব্যাপ্ত প্রসারে বিস্মিত হতে হয়।

পরব্রহ্মের বৈদিকী সাধনার সঙ্গে পরা শক্তির তান্ত্রিকী তপস্যার ধারাও সমান্তরালভাবে ভারতে চিরকালই বয়ে চলেছে। আগম এবং নিগম দুইকে নিয়েই ভারতীয় সংস্কৃতি। যিনি পরব্রহ্ম তিনিই আবার পরাশক্তি। এ যেন টাকার এপিঠ-ওপিঠ। অগ্নি এবং তার দাহিকা শক্তির মত পর-ব্রহ্ম এবং পরা-শক্তিও অবিনাভূত এক অদ্বৈত মূর্তি। এই প্রত্যয় থেকেই ভারতে বিশ্বপ্রেমের প্রসার। তাই 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যার' প্রবক্তা, অদ্বৈতপ্রজ্ঞায় স্থিত আচার্য শংকরের তত্ত্বানুভূতির লৌকিক প্রকাশ হ'ল—

"মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥"

'বিশ্ব জননী মহাশক্তি দেবী পার্বতী আমার মাতা, বিশ্বজনক দেবাদিদেব মহেশ্বর হলেন পিতা, কল্যাণের পথিকেরা সবাই আমার বন্ধু এবং ত্রিভুবনই আমার স্বদেশ।' জগন্মাতাকে বন্দনা করলে জগদ্বাসীমাত্রকেই ভ্রাতা বলে বরণ করা যায়। তখন শ্রেণীশত্রু, গণশত্রু, হিদেন, কাফের এবং প্রতিক্রিয়াশীল বলে কাউকে মনে করা যায় না।

উপনিষদের ঋষি বলেছেন—

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্য পরাত্মনঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥"

সাধকের কল্যাণের জন্যই চৈতন্যময়, অদ্বিতীয়, অখণ্ড পরব্রহ্মের রূপ-প্রকল্প। সসীম জীবের প্রতি করুণায় সীমার বন্ধনে অসীমের দেহ ধারণ, অরূপের রূপ-পরিগ্রহ। করুণায় তিনি নেমে আসেন। সাধনায় মানুষ তাঁকে পায়। যুগ যুগ ধরে জীব এবং ব্রহ্মের, মানুষ এবং মহামাতৃকার এই লীলা চলে আসছে। ভক্তির আর্তিতে, নিষ্ঠার একাগ্রতায় 'কোন কোন ভাগ্যবানে' তাঁরে 'দেখিবারে পায়'।

কেনোপনিষদের ঋষির দৃষ্টিতে বহু পূর্বে সুরলোকে দেবাসুর সংগ্রামে বিজয়-গর্বিত দেবতাদের সম্মুখে 'উমা' রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ। শক্তি-সচেতন অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি দেবগণ ব্রহ্মপুরুষের সামনে শক্তিপ্রকাশে যখন ব্যর্থ, তখনি হঠাৎ নীল আকাশের বুকে বিদ্যুদ্‌বর্ণা 'হৈমবতী উমার' আবির্ভাব।—

'স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহু শোভমানাম্ উমাম্ হৈমবতীম্।'

বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময়ী যোগমায়া উমাই শ্রুতিরূপিণী ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশিকা। তিনি ঋগ্‌বেদে অম্ভৃণ ঋষির কন্যা দেবী বাগ্‌রূপে আবির্ভূতা; আত্মস্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন মহাশক্তি মহাদেবী রূপে। সর্বশক্তির উৎস এবং বিশ্ব

চরাচরে স্রষ্টী ও অধিষ্ঠাত্রী রূপে তিনি বিরাজমানা। তিনি ঘোষণা করলেন —"রুদ্র, বসু, আদিত্য এবং সর্বদেবরূপে আমিইতো সর্বত্র বিচরণ করি। দেবশত্রুহন্ত্রী এবং সকলেরই ধারয়িত্রী ও নিয়ন্ত্রী আমিই রাষ্ট্রশক্তি —

"অহং রুদ্রেভির্ বসুভিশ্চরা-
ম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।"

বেদবন্দিতা এই মহাদেবীই পরবর্তী কালে সনাতনী মহাশক্তি। বিভিন্ন লীলায় তিনি বহুরূপধারিণী কখনও নারায়ণী, কখনও ব্রহ্মাণী, আবার কখনো মাহেশ্বরী। নৃমুণ্ডমালিনী চামুণ্ডা, তমোময়ী নিয়তি, আবার সর্বপ্রকাশমানা পরমা প্রকৃতিও তিনি। সসীম মানুষের প্রতি অনন্ত করুণায় অসীমা চিন্ময়ী এই মহাশক্তি মন্দিরে মন্দিরে মৃণ্ময়ী প্রতিমাতে যুগান্তরে আবির্ভূতা।

মৃকণ্ডু ঋষির পুত্র মার্কণ্ডেয়-কথিত পুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 'দেবী-মাহাত্ম্যে'ই দেবী চণ্ডী বা চণ্ডিকার প্রতিষ্ঠা। দুর্গা, অম্বিকা, ভগবতী, পরমেশ্বরী প্রভৃতি বহু নামে এই গ্রন্থে আখ্যাতা হলেও মুখ্যতঃ তিনি 'চণ্ডিকা' নামেই পরিচিতা। এই দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ডী নামেই বেশি পরিচিত। এই মহদ্‌গ্রন্থে তিন কালের তিনটি বিশিষ্ট ঘটনাকে আশ্রয় করে মহাদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে। প্রথমে এই মহামায়া যোগমায়ার আনুকূল্যেই ভগবান বিষ্ণু মধু এবং কৈটভ নামক দৈত্যযুগলকে হত্যা করেন।

দ্বিতীয় ঘটনা হল—কামার্ত, ক্রুদ্ধ এবং মদান্ধ মহিষাসুরের নিধন। আর তৃতীয় হল দেবীর হস্তে শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ। সঙ্গে চণ্ড-মুণ্ড-রক্তবীজাদি বহু অসুরের ধ্বংস-সাধন।

চণ্ডীর কাহিনী হল—রাজর্ষি সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি অতি ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয় স্বজনগণের দ্বারা লাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত এবং নির্বাসিত হয়ে মনের দুঃখে বনে এসেছেন। তবুও আত্মজনদের প্রতি মোহ তাঁদের কাটেনি। লাঞ্ছনাকারী স্বজনদের জন্য তাঁদের বিনিদ্র উৎকণ্ঠার শেষ নেই। সুরথ আর সমাধি সেখানে তপস্যারত ঋষি মেধসের কাছে এই মোহের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মেধাবী মেধস্ বললেন—এ মহামায়ারই মায়া। মহাশক্তির কৃপা না হলে এই মায়ার হাত থেকে মুক্তি নেই। সেই মহাশক্তির নানা মন্বন্তরে জন্মকর্মের বিস্ময়কর লীলা বলতে শুরু করলেন মহর্ষি।

মহাপ্রলয়ে কারণ-সমুদ্রে অনন্তশয্যায় যোগনিদ্রায় মগ্ন ভগবান বিষ্ণু। তাঁর কাণের ময়লা হতে উদ্ভূত হল দুটো অসুর—মধু এবং কৈটভ। ক্ষুধার্ত তারা বিষ্ণুর নাভিকমলে সমাসীন প্রজাপতি ব্রহ্মাকে উদরসাৎ করতে উদ্যত।

প্রসুপ্ত বিষ্ণুকে জাগাবার জন্য ভয়ার্ত ব্রহ্মার কণ্ঠে তখন ধ্বনিত হল মহামায়া তথা যোগনিদ্রারূপিণী মহাকালিকার স্তুতি-বন্দনা।—

"ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারঃ স্বরাত্মিকা।
পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী।"

স্তবে তুষ্ট মহাকালিকা নিদ্রার আবরণ অপসারিত করলেন। বিষ্ণু হলেন জাগ্রত। শরণাগত ব্রহ্মাকে রক্ষার জন্য পাঁচ হাজার বছর ধরে মধু-কৈটভের সঙ্গে বাহুযুদ্ধ করেও তিনি অপরাজিত। দৈবী মায়ায় মোহিত, দর্পিত দৈত্যদ্বয় মহাবিষ্ণুকে বর দিতে চাইলে বিষ্ণু বললেন—

"ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি।
কিমন্যেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম।"

'সন্তুষ্ট হইলে যদি মাগি এই বর।
মম হস্তে লভ মৃত্যু নহে অন্য বর।'

প্রলয়-পয়োধি জলে দাঁড়িয়ে দানবও সেদিন সত্যের সাধক। বলল তথাস্তু। তবে জলহীন স্থলে এই মৃত্যু ঘটাতে হবে। শ্রীহরি তখন নিজের উরুর ওপর রেখে সুদর্শন চক্র দিয়ে দানবদ্বয়ের মস্তক ছেদন করলেন। প্রতিষ্ঠিত হল মহাকালিকার মাহাত্ম্য। মহাভয়ঙ্করী ভীমরূপা এই দেবীই আবার রূপ, সৌভাগ্য, শান্তি, কান্তি ও মহতী শ্রীর প্রতিষ্ঠাত্রী। তাঁর উপাসনায় সিদ্ধ সাধক অতুলনীয় বলে বলীয়ান্ হয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে করেন বশীভূত। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁরই অভয়পদে প্রাণ সমর্পণ করে মধু-কৈটভের মত দৈত্যের নিপীড়ন হতে রক্ষা পেলেন। তারই স্মরণে কত যুগ পরেও বাঙালী মাতৃসাধক রামপ্রসাদ গান বেঁধেছেন—

"অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি শমন-ভয় রেখেছি।।"

আবার কালান্তরে শক্তিমদমত্ত দৈত্যাধিপতি মহিষাসুরের অত্যাচারে দেবলোক বিপর্যস্ত। পরাজিত দেবতারা দ্যুলোক হতে বহিষ্কৃত, শরণার্থী হয়ে ভূলোকে বিচরণরত। ব্রহ্মার বরে দানবরাজ অমর। নিরুপায় দেবকুল ব্রহ্মাকেই নেতা করে গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুর শরণাপন্ন। অসুরের অন্যায় ঔদ্ধত্যের সংবাদে ক্রোধোদ্দীপ্ত নারায়ণের মুখমণ্ডল হতে নির্গত হল সুমহৎ তেজোরাশি। তার সঙ্গে মিলিত হল লাঞ্ছনাক্ষুব্ধ দেবগণের পবিত্র মন্যুজনিত দেহোদ্ভূত সমুজ্জ্বল তেজঃপুঞ্জ। দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত প্রজ্বলিত অনলতুল্য সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হতে সহসা আবির্ভূত হলেন দিব্যলাবণ্যবতী অপরূপা এক দেবীমূর্তি। সহস্র বাহুসমন্বিতা মহালক্ষ্মী নামে পরিচিতা ইনি মহাশক্তি তথা দেবী চণ্ডিকার রাজসী মূর্তি। কখনও আবার অষ্টাদশভুজা রূপেও ইনি পূজিতা হন। পদ্মাসনা এই দেবীর করে অক্ষমালা, কমণ্ডলু, শঙ্খ, পদ্ম এবং নানাবিধ অস্ত্র। দেবগণও প্রত্যেকে নিজ নিজ অস্ত্র হতে নূতন করে

আরো এক একটি অস্ত্র উৎপন্ন করে এই মহাদেবীকে দিয়ে রণসাজে সজ্জিত করলেন। অট্টহাস্য সহকারে ভীষণ হুংকারে দশ দিক কম্পিত করে তুমুল যুদ্ধে অসংখ্য দানব সৈন্য, এবং তাদের সেনাপতিদের তিনি ধ্বংস করলেন। ফলে মায়াবী মহিষাসুর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নানা রূপ ধারণ করে ভীষণ যুদ্ধ এবং ঘোর গর্জন করতে লাগল মেধস্ ঋষির ভাষায় তখন মাতা 'চণ্ডিকা' রূপিণী।

"ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্।
পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা।"

অসুরের তর্জন গর্জনকে হেলায় উপেক্ষা করে দেবী বললেন—

"গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্।
ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ॥"

"আমি মধুপানে রত যবে গর্জ ততক্ষণ।
তোমারে বধিলে সুখী হবে দেবগণ॥"

তারপর দেবী চণ্ডিকা প্রচণ্ড বিক্রম শাণিত খড়্গাঘাতে মহিষাসুরের শির দেহ হতে ছিন্ন করলেন। মাতৃশক্তিকে কামবলুষিত চিত্তে, ভোগের দৃষ্টিতে দেখায় মহাশক্তির হস্তে হল মহিষাসুরের নিধন। শক্তিকে ভক্তি করতে হবে, ভোগ করতে চাইলেই হবে দুর্ভোগ। তখন কৃতজ্ঞ চিত্তে ষোড়শোপচারে পূজান্তে দেবগণ 'চণ্ডিকা' নামে মাতৃশক্তিকে করলেন বন্দনা।—

"যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বক্তুমলং বলঞ্চ
সা 'চণ্ডিকা'খিল-জগৎ-পরিপালনায়
নাশায় চাশুভ-ভয়স্য মতিং করোতু॥

শূলেন পাহি নো দেবি, পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টা-স্বনেন নঃ পাহি চাপ-জ্যা-নিঃস্বনেন চ॥
প্রাচ্যাং-রক্ষ প্রতীচ্যাং চ 'চণ্ডিকে' রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য চোত্তরস্যাং তথেশ্বরি॥"

চণ্ডী গ্রন্থের অষ্টম চরিতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহাসরস্বতী হ'লেন চণ্ডিকার জ্ঞান-শক্তির প্রকট-প্রতিমা। শুম্ভ, নিশুম্ভ, রক্তবীজ, ধূম্রলোচন প্রমুখ কামনিষ্ঠ, ক্রোধকুটিল, লোভসর্বস্ব দানবগণকে বহুবিধ মূর্তি ধারণান্তে নিহত করে তিনি ঘোষণা করলেন—'বিশ্বভুবনে আমি একাই অদ্বিতীয়া মহাশক্তি। অন্য সব মূর্তি যা দেখ্‌ছ, সবতো আমারি বিভূতিমাত্র।'—

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট! ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥
ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী 'চণ্ডিকা' চণ্ডবিক্রমা।
পশ্যতামেব দেবানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত॥"

দানবদলনী মহিষাসুরমর্দিনীর আবির্ভাবের মূলে রয়েছে পরাক্রান্ত আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে নির্যাতিতের সংঘবদ্ধ অভিযান। তাঁর চিরন্তন প্রতিশ্রুতি বিশ্ব মানবের পরম আশ্বাস—

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরি-সংক্ষয়ম্।।"

আবার দেখি, মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে রয়েছে 'দুর্গা-স্তুতি'। তাতে এই মহাশক্তিকে 'চণ্ডী' নামেই বন্দনা করা হয়েছে। দুর্যোধনের বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিলেন—'শত্রুকে পরাজিত করার জন্য দুর্গাস্তোত্র পাঠ কর'—

"পরাজয়ায় শত্রূণাং দুর্গাস্তোত্রমুদীরয়"।

তখন অর্জুন রথ হতে নেমে নতজানু হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে যে দুর্গাস্তুতি পাঠ করেছিলেন তাতে আছে—

"ভদ্রকালি। নমস্তুভ্যং মহাকালি নমোঽস্তু তে।
চণ্ডি। চণ্ডে। নমস্তুভ্যং তারিণি বরবর্ণিনি।।"

মহাভারতেরই বিরাট পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভ্রষ্টরাজ্য যুধিষ্ঠির বিপন্মুক্তির জন্য কারুণ্যময়ী এই মহাশক্তিরই বন্দনা করে বলছেন যে দুর্গতি হতে ত্রাণ করেন বলেই তো তিনি আবার দুর্গা—

"দুর্গাৎ তারয়সে দুর্গে তৎ ত্বং দুর্গা স্মৃতা জনৈঃ।"

দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্যকে অবলম্বন করে ভারতের আধুনিক ভাষাসমূহেও নানা কাব্য পরবর্তী কালে রচিত হয়েছে। তাতে কবিকল্পনায় মূল কাহিনীর কোথাও কোথাও পরিবর্তনও ঘটেছে। বিখ্যাত শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ পাঞ্জাবী এবং হিন্দীতে 'চণ্ডী-চরিত্র' কাব্য রচনা করেন। তিনি নিজে চণ্ডীপাঠ করতেন এবং অমৃতসরে স্বর্ণমন্দিরে এবং আরো বহু গুরুদ্বারে দেবী চণ্ডীর মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করেন। স্বর্ণমন্দিরের সেই সব দেবীমূর্তি পরে 'দুর্গিয়ানা' মন্দিরে অপসারিত করা হয়। তিনি তাঁর অসির নামকরণ করেছিলেন 'ভগবতী'। গুরু গোবিন্দের 'চণ্ডীচরিত্রে' উজ্জয়িনীর রাজকন্যা চণ্ডী স্বর্গ হ'তে বিতাড়িত ইন্দ্রের প্রার্থনায় শার্দূলপৃষ্ঠে আরোহণ করে অসুরদের ধ্বংস করেন। মহারাষ্ট্রের তুলজাপুরে এবং গুর্জরের জুনাগড়ে ব্যাঘ্রবাহনা দেবী চণ্ডীর অর্চনা এখনো হয়।

উড়িষ্যার শাক্ত কবি সারলা দাস 'বিলঙ্কা রামায়ণ' এবং 'চণ্ডী পুরাণে' লোকজীবনে দেবী চণ্ডীকে সর্বমঙ্গলা রূপে বর্ণনা করে তাঁর বহুবিধ লীলা লৌকিক কাহিনীর মাধ্যমে বর্ণনা করেন।

বাংলার 'মঙ্গল কাব্যে' তো 'চণ্ডী-মঙ্গল' এক বিরাট স্থান অধিকার করে রয়েছে। বৈদিকী পরাশক্তি তথা তান্ত্রিকী মহাদেবী বাংলার ভক্ত কবিদের দ্বারা গৃহবধূ, গৃহকন্যা, গৃহদেবতারূপে 'চণ্ডীমঙ্গল' ও 'মনসা-মঙ্গলে'র নানা

কাহিনীতে লোকজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিতা। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডী মঙ্গলের' প্রথমেই রয়েছে—

"স্ত্রীলোকের পূজা লৈতে চণ্ডী কৈল মতি।
পদ্মাবতী সনে মাতা করিলা যুকতি॥"

সপ্তশতী চণ্ডীতে দেবীকে বন্দনা করা হয়েছে—

'সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ-সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

মঙ্গল কাব্যের দেবী 'মঙ্গলচণ্ডী' যুগান্তরে সেই পৌরাণিকী ও তান্ত্রিকী মহাশক্তিরই লোকায়ত সংস্করণ বলেই মনে হয়। 'মঙ্গল' শব্দটি এই পরম্পরারই দ্যোতক। সংস্কৃত ভাষায় দেবীপুরাণ, দেবীভাগবত, বৃহদ্ধর্মপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণাদিতেও দেবী চণ্ডিকার বৈদিক এবং লৌকিক রূপের নানা লীলা এবং মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলি এই সব কাহিনীর দ্বারা প্রভাবিত। তারপরে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, হেমচন্দ্র, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল এমনকি রবীন্দ্রনাথেও দেবী চণ্ডীর তথা মহাশক্তির বিচিত্র বর্ণনা ও বন্দনা মেলে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠে' মায়ের ত্রিমূর্তি এবং 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র ও সঙ্গীত চণ্ডীতত্ত্বেরই এক যুগোপযোগী অভিনব আবির্ভাব। ভক্তকবি রামপ্রসাদ মনে করেন তাঁর সকল শক্তি মাতৃশক্তিরই লীলামাত্র। সাধকের মনঃ-প্রাণ-দেহ শক্তিরূপিণী মায়েরই চৈতন্যময় এবং আনন্দময় যন্ত্রমাত্র। শ্রী অরবিন্দের ভাষায়ঃ—

"And afterwards you will realise that the divine Shakti not only inspires and guides, but initiate and carries out your works ; all your movements are originated by her, all powers are hers ; mind, life and body are conscious and joyful instruments of her action means for her play ; moulds for her manifestation in the physical universe. ("The Mother" P. 30)

এই দেবী চণ্ডীই আবার অম্বিকা। ইন্দ্রিয়াদি অন্তঃশত্রু এবং দানবাদি বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষার জন্য দেবী 'চণ্ডিকার' কাছেই আর্তি নিবেদিত হয়েছে 'চণ্ডী'র চতুর্থ অধ্যায়ে—

"শূলেন পাহি নো দেবি, পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।"

আর একটি বাস্তব সত্য এই যে উনবিংশ শতকে বাংলার তথা ভারতের রাষ্ট্রসাধনা এই চণ্ডীচেতনার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। একের কাছ হতে অপরের কাছে নিছক প্রশাসনিক ক্ষমতার হস্তান্তরের মাধ্যমে কেবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শের রূপায়ণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য কখনও ছিল না। এই সংগ্রামের মূলে ছিল এক অধ্যাত্ম জীবনদর্শন। মাতৃমুক্তির জন্য সন্তানের গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগ এবং আত্মসমর্পণ যোগের

মাধ্যমে দুশ্চর তপস্যাই ছিল ভারতের মুক্তিসংগ্রামের বৈশিষ্ট্য। বৈদিক ঋষি ব'লেছেন— 'পুত্রোঽহং পৃথিব্যাঃ।'

মৃন্ময়ী মাতৃভূমি এই চিন্ময়ী মহাদেবীরই ভৌম রূপ। 'ঋগ্বেদের' ঋষির ধ্যানদৃষ্টিতে মাতৃভূমি প্রাণদায়িনী, অন্নদায়িনী, স্তন্যদায়িনী, কল্যাণী মাতা। 'অথর্ববেদের' 'পৃথিবীসূক্ত' ধরিত্রী বন্দনার অনবদ্য স্তুতি। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' এবং 'নারায়ণোপনিষদে' এই ধরিত্রীই শস্য ও সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'শ্রী'। সপ্তশতী চণ্ডীতে দেখেছি 'মহী' স্বরূপে মহাদেবীর অবস্থিতি।

"আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।"

তন্ত্রসাধকের দৃষ্টিতে এই পরমা শক্তিই জন্মদাত্রী মাতা, দুগ্ধামৃতদানে মানবশিশুর প্রাণরক্ষায়ত্রী পয়স্বিনী গো এবং দেশমাতৃকা রূপে আমাদের কাছে আবির্ভূতা।—

"সর্বপ্রসূর্ জন্মভূমিঃ জননী গো পয়স্বিনী।
মহাশক্তের্ জগন্মাতুঃ প্রতিরূপা সুশোভনা॥"

সসীম মূর্তিকে অবলম্বন করে অসীম ব্রহ্মের সাধনার কৌশল ভারতীয় প্রজ্ঞার মনোবিজ্ঞানসম্মত আবিষ্কার। তাই, দেশমাতৃকার পূজার মাধ্যমে বিশ্বমাতৃকার সাধনা আমাদের চিরন্তন পন্থা। শক্তি তথা মাতৃসাধনার বৈদিকী ও তান্ত্রিকী ধারা দুটি ঊনবিংশ শতকে বঙ্গভারতের নবজাগ্রত মনোভূমিতে রচনা করেছিল এক অপূর্ব গঙ্গা-যমুনা সংগম। সেই পূত ধারায় নিষ্ণাত হয়ে সেদিন মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রী 'অধিভারতী'কে অন্নদানরতা মাতৃমূর্তি এবং দুর্গতিনাশিনী মহাদেবী রূপে দিব্য দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে স্তুতি রচনা করেছেন 'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থে।—

"মাতর্-নমামি ভবতীং সতীদেহ-রূপাং
মাতর্ নমামি বসুধাতল-পুণ্যতীর্থাং।
মাতর্ নমামি পদ-যুগ্ম-ধৃত সমুদ্রাং
মাতর্ নমামি হিম-গৌর-কিরীট-ভূষাম্॥
হেমাভা হরিদম্বরা পদতলে নীলাম্বু-লীলাঞ্চিতা
স্নিগ্ধা স্নিগ্ধ-তরংগিণী সুরধুনী পীযূষ-নিঃস্যন্দিনী।
সূর্যেন্দু-প্রতিবিম্বিতাম্বর-লসৎ-প্রালেয়-মৌলি-জলা
সৌম্যা স্যাদধিভারতী ভয়হরা নিত্যান্নদা শান্তয়ে॥"

তারপরেই রচিত হল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' এই চেতনার ধারাপথেই। যা মনন করলে ত্রাণ পাওয়া যায় তাই হল মন্ত্র। আর সেই মন্ত্রকে যিনি দর্শন করেন, তিনি হলেন ঋষি।—

"ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ॥"

আজ হতে শতবর্ষেরও পূর্বে ভূদেবের পরেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যান-দৃষ্টিতে মৃন্ময়ী মাতৃভূমি চিন্ময়ী মহাশক্তিরূপে হলেন বন্দিতা। রচিত হল

ভারতের মুক্তি যজ্ঞের বৈদ্যুতিক শক্তিসঞ্চারী সর্বজনীন মঙ্গলমন্ত্র—'বন্দে মাতরম্'। এই বীজমন্ত্রকেই ধ্যান করে ভারতের মুক্তিপাগল সন্তানেরা 'জীবন মৃত্যু'কে 'পায়ের ভৃত্য' করে আত্মোৎসর্গের অদম্য শক্তি লাভ করেছিল। যুগযুগান্তবাহী অধ্যাত্মসাধনার ভিত্তিতে ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তিসংগ্রাম জগতের ইতিহাসে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। ভক্তির সঙ্গে মাতৃশক্তির চরণে আত্মোৎসর্গের এষণাই এর বৈশিষ্ট্য। ছলে-বলে কৌশলে পাবার এবং পাইয়ে দেবার কৌটিল্য ঘোষণা এবং তার জন্য নির্লজ্জ প্রমত্ত প্রতিযোগিতা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কখনও তাই দেখা যায়নি। বৈদিক সাহিত্যের উত্তুংগ শৈলশীর্ষ হতে চন্ডীচেতনাশ্রিত যে মাতৃবন্দনার ধারা প্রবাহিত হয়েছিল, তারই পরিণতিতে বঙ্গভারতের নবজাগরণে দেশমাতৃকার বন্দনা গান দুর্গতিহারিণী মহাশক্তির উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠে উদ্‌গীত হয়েছিল—

'বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্।
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং-বরদাং মাতরম্॥
সপ্তকোটি-কণ্ঠ-কলকল-নিনাদ-করালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈধৃত-খর-করবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাম্ অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্।
বন্দে মাতরম্।

শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্ ।'

তাই, বিপ্লবী, যোগী, ঋষি অরবিন্দ সেদিন 'দেশকে আমি মা বলিয়া জানি' বলে মাতৃমুক্তি সাধনে মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীপূজিতা দেবী ভবানীর চরণে বিন্ধ্যাচলে বক্ষোরক্তে রঞ্জিত বিল্বপত্রের অঞ্জলি দিয়ে মাতৃমুক্তির ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। প্রবর্তিত হয়েছিল দেশমাতৃকার পূজা। ১৩৩২ বঙ্গাব্দে দুর্গাপূজাকে অবলম্বন করে দেশমাতৃকাকে পূজার জন্য ভারতমাতার ধ্যানমন্ত্র রচনা করেছিলেন 'মাতৃচরণাশ্রিত সন্তান' গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

"বন্দে ভারতমাতরং হিতরতাং ধর্মার্থদাং মোক্ষদাম্
আরাধ্যাম্ ঋষি সেবিতাম্ অনুপমাং শস্যান্বিতাং শোভনাম্ ।
ফুল্লাব্জাং শৈলরম্যাং সুবিমল-সলিলাং শ্যামলাং রত্নভূষাং ।
ত্রৈলোক্য-প্রীতি-গীতাং হিমগিরি-মুকুটাং সাগরৈধৌতপাদাম্ ।
মন্ত্রস্তু—হ্রীং দেশমাতৃকায়ৈ নমঃ ।

চণ্ডীচেতনার সঙ্গে দেবভাবনা মিলিত হয়ে বাংলার শারদপ্রান্তে কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথকেও উদ্বুদ্ধ করেছে আনন্দময়ী মহাশক্তির বন্দনায়—

"আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।
ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ
দুই নয়নে স্নেহের হাসি ললাট-নেত্র অগ্নিবরণ।
তোমার মুক্ত কেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি।
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী।
ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥"

আসুরিক সম্পদ এবং শক্তিতে প্রমত্ত মানুষ দৈবী চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়ে অশান্ত। মাতৃশক্তির বিস্মৃতি এবং উৎকট ভোগাসক্তিতে সভ্যতা আজ সংকটাপন্ন, বিশ্বজননীর অস্বীকৃতিতে বিশ্বভ্রাতৃত্ব আজ পরাকৃত। দেশে দেশে চলেছে নরমেধযজ্ঞের নারকীয় অনুষ্ঠান। শান্তির নামে নেমে এসেছে শাস্তি। সাম্যের স্থান গ্রহণ করেছে কাম্য। সভ্যতার এই সংকট লগ্নে বিষন্নতামুক্ত প্রসন্ন জীবনের প্রত্যাশায় মনীষী শক্তিসাধক কবিশেখর বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণের কণ্ঠে নিবেদিত চণ্ডীপ্রণতি হোক আমাদের অবলম্বন—

"সংসার-দুঃখশমনীং শরদিন্দুশোভাং।
স্মেরাননাং দশভুজাং সুরসঙ্ঘ-শক্তিম্ ।
চণ্ডীং মনোজ্ঞবসনাং জগতাং বিধাত্রীং
বিশ্বস্য পালনকরীং শুভদাং নমামঃ ॥"

বন্দে মহাকালিকাম্

মহাশক্তির এক বন্দনীয় রূপে এই মহাকালিকা। শ্যামা বা কালী নামে বঙ্গ ভারতের সংস্কৃতিতে তিনি এক অনন্যসাধারণ স্থান অধিকার করে আছেন। বিশেষতঃ, বিশ্বের যেখানেই বাঙালী সেখানেই মা কালী। বাঙালীর মানস-লোক আলো করে আজো দাঁড়িয়ে আছেন কালী। তাই বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় জাতীয় উৎসব এই কালীপূজোকে স্বীকার না করে উপায় নেই।

জীবন ও জগতের অন্তরালে এক ঐশী মহাশক্তির লীলা ভারতীয় ঋষির অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার। আধুনিকতম বিজ্ঞানও গণনা, গবেষণা, সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, নিরীক্ষণ, পরীক্ষণ, যুক্তি ও বিচারের দ্বারা সেই সত্যেই উপনীত। প্রতিটি ক্রিয়া যেমন শক্তির পরিচয় বহন করে চলেছে, তেমনি প্রতিটি বস্তুও শক্তির সমন্বিত অবস্থামাত্র। ইদানীং বিজ্ঞান বলে যে প্রতিটি জড় পরমাণুও শক্তিময়। আমাদের সাধকেরা বলেন মহাশক্তির বিচিত্র লীলাবিলাস এই জগৎপ্রপঞ্চ। প্রাচীন ঋষি এবং আধুনিক বিজ্ঞানী পৃথক্ পথে যাত্রা করে একই তীর্থে আজ উপনীত, একই সত্যে প্রতিষ্ঠিত। উপলব্ধ সত্য এবং অর্জিত জ্ঞানকে জীবনে সার্থক করে তোলাই হল ভারতের চিরন্তন সাধনা। চিন্তাকে চর্যায় রূপায়িত করার দেশকালোচিত এষণাই ছিল আমাদের ঋষি-পিতামহের ঘোষণা। কায়-মনো-বাক্যে ঐক্য সাধনার পরাকাষ্ঠা তাঁদের জীবন। তাই দেখি জ্ঞানী, ধ্যানযোগী, সত্যসাধকের জীবনেও লৌকিক পূজোর্চনা। শ্রীশ্রী শ্যামাপূজো তারই এক অনন সাধারণ দৃষ্টান্ত।

Materialism নামে পরিচিত জড়বাদ তথা বস্তুবাদ উন্নত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আজ প্রত্যাখ্যাত। ঋষিরা বলেছেন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। বর্তমান বিজ্ঞানও বলে জড় বলে কোন বস্তু নেই। প্রতিটি বস্তু হচ্ছে শক্তির সমবায় তথা conglomeration of energy। এক একটি বস্তু শক্তির এক এক ধরণের প্রকাশ। পারমাণবিক বিজ্ঞানের সংবাদ হল প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুর মধ্যে চলেছে এক প্রচণ্ড শক্তির লীলা। জড় বস্তু বা matter সম্বন্ধে ধারণার বিরাট পরিবর্তন অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের ফলশ্রুতি। ভারতীয় ঋষির উপলব্ধ সত্য আজ বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হয়ে গ্রহণীয় সত্যরূপে নন্দিত হল।

ঋগ্‌বেদের দেবীসূক্ত হতে আরম্ভ করে উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্রসাহিত্যে এই শক্তিসাধনার ধারা বিচিত্রভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ভাষানুসারে তন্ত্রের ঘোষণা হচ্ছে একই মহাশক্তি সর্বভূতে বিরাজিতা—"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।"

ঋগ্‌বেদের রাত্রিসূক্তের আটটি শ্লোকে অর্থের ব্যঞ্জনায় দেবী মহাকালিকার অস্তিত্ব স্পষ্টই অনুভব করা যায়। যেমন—

'রাত্রি ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ।
বিশ্বা অধিশ্রিয়োধিত ॥ ১
ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ।
জ্যোতিষা বাধতেতম ॥ ২

'তমোময়ী রাত্রিরূপিণী দেবী দীপ্তিময়ী। তিনি অশেষ প্রকারের শোভা ধারণ করে নক্ষত্ররূপ চক্ষু দিয়ে আমাদের দেখছেন। উচ্চ নীচ সকলকেই তিনি আচ্ছন্ন করেন। কালাতীতা মরণধর্মরহিতা তিনি মৃত্যুর অন্ধকার এবং জীবনের জ্যোতিঃ দুইই দান করেন।' শতপথ ব্রাহ্মণে ভয়ঙ্করী ঘোরা কৃষ্ণা 'নির্ঋতি' দেবীর যে বন্দনা তাও এই দেবী কালীকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

মহাভারতের সৌপ্তিক পর্বে রক্তাস্যা, রক্তনয়না, রক্তমাল্যানুলেপনা, পাশহস্তা, কালরাত্রিরূপিণী, ভয়ঙ্করী কালীর সাক্ষাৎ পাই ধ্বংসের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহাদেবীর দেহ হতে কৌশিকী নামে এক দেবী মূর্তি বেরিয়ে গেলে কৃষ্ণবর্ণ হয়ে তিনি কালিকা নামে পরিচিতা হলেন।—

'তস্যাং বিনির্গতায়াস্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া ॥' (৫।৮৮)

চণ্ডীতেই আবার দেখা যায় শুম্ভ-নিশুম্ভের অনুচর চণ্ডমুণ্ডকে দেখে ক্রোধে মসীবর্ণা হলেন দেবী অম্বিকা। তাঁরই ললাট হতে অসিপাশধারিণী করালবদনা কালী হলেন আবির্ভূতা। তিনি বিচিত্র নরকঙ্কালধারিণী, নরমালাবিভূষণা, অতি ভীষণা।—

'ততঃ কোপং চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি।
কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূৎ তদা ॥
ভ্রূকুটি কুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাদ্ দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী ॥
বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা ॥ (৭।৫-৭)

কালিকা-পুরাণ, দেবী পুরাণ এবং আরো নানা পুরাণ গ্রন্থে, তার পরে তন্ত্র ও যামল গ্রন্থাদিতে নানাভাবে এই দেবী কালিকা বন্দিতা হয়েছেন। শক্তি সাধনার নির্দেশক গ্রন্থ হল তন্ত্ররাজি। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হচ্ছে মহাকালকেও গ্রাস করেন যে আদ্যা দেবী তিনিই হচ্ছেন কালী। তিনি সকলের আদিভূতা এবং কালস্বরূপা।

'কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতা।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা ॥'

কালসংগ্রহণাৎ কালী সর্বেষামাদিরূপিণী।
কালত্বাদ্ আদিভূতত্বাদ্ আদ্যা কালীতি গীয়সে॥"

এই তন্ত্রে সদাশিব কালীর এই অভিনব রূপের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনিয়েছেন। "উপাসকদের কাজের সুবিধার জন্য গুণ এবং ক্রিয়া অনুসারে দেবীর রূপ প্রকল্পিত হয়ে থাকে। শ্বেত-পীতাদি সকল বর্ণ যেমন কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, তেমনি সকল ভূত তথা জীবজগতে উৎপন্ন সব কিছু কালীতেই প্রবেশ করে। এই জন্যই যোগীদের হিতের জন্য নিগুর্ণা নিরাকারা কালশক্তির বর্ণ কৃষ্ণ রূপে বর্ণিত হয়েছে। তিনি আবার কল্যাণরূপিণী রূপে ললাটে চন্দ্রচিহ্ন ধারণ করে অমৃত পরিবেশন করছেন। চন্দ্র-সূর্য-অগ্নির প্রতীক। তিনটি নয়নের দ্বারা জগৎকে তিনি দর্শন ও দিবা-রাত্রির দ্বারা পরিচালনা করছেন। সকল প্রাণীকে গ্রাস করেন এবং কালদণ্ডের দ্বারা চর্বণ করেন বলে তাদের রক্ত তাঁর বসনরূপে কল্পিত। বর এবং অভয় মুদ্রায় জীবকে তিনি রক্ষণ ও কার্যে প্রেরণ করেন। রজোগুণজাত বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে আছেন বলেই তিনি রক্ত-পদ্মাসনে উপবিষ্টা। মোহময়ী মদিরা পান করে সর্বসাক্ষিস্বরূপিণী তিনি কালসম্ভূত ক্রীড়াশীল সৃষ্টিকে দর্শন করেন।"

পশ্চিমবঙ্গের প্রচলিত শ্যামাপূজায় 'কালীতন্ত্রে' ধৃত বর্ণনাই আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দের 'তন্ত্রসার' অনুসারে গৃহীত হয়েছে। সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং গাম্ভীর্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এই ধ্যানমন্ত্রে। সংস্কৃতজ্ঞ সাধকের উদাত্ত কণ্ঠে দেবভাষায় রচিত এই ধ্যানমন্ত্র বিশুদ্ধ উচ্চারণে উদ্গীত হলে পূজাস্থলে দিব্য ভাবপরিমণ্ডল রচিত হবেই।—

'করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ-খড়্গবামাধোর্ধ্ব-করাম্বুজাং।
অভয়াং বরদাং চৈব দক্ষিণোর্ধ্বাধপাণিকাম্॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চিতাম্॥
কর্ণাবতংসতানীত-শবযুগ্মভয়ানকাং।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং।
সৃক্কদ্বয়-গলদ্রক্তধারা-বিস্ফুরিতাননাম্॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং।
বালার্কমণ্ডলাকার লোচন-ত্রিতয়ান্বিতাম্॥
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি-মুক্তালম্বি-কচোচ্চয়াং।
শবরূপমহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্॥

শিবাভির্ঘোর-রাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাং।
মহাকালেন চ সমং বিপরীত রতাতুরাম্ ॥
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্ ।
এবং সংচিন্তয়েৎ কালীং সর্বকামার্থসিদ্ধিদাম্ ॥'

ত্যাগী ও প্রেমিক ভক্তের আরাধ্য এই মহাকালী মহাকালের শক্তিমূর্তি। কাল অনন্ত। কালীও তাই অনন্তশক্তি। অনন্ত অতীত এবং অসীম ভবিষ্যৎ কালীমূর্তির মধ্যে নিত্যরূপে শাশ্বতভাবে বিরাজিত। সৃষ্টি ও ধ্বংস, প্রকাশ ও বিনাশ এই মহাশক্তিরই দ্বিবিধ বিকাশ। আমাদের ঋষি-পিতামহেরা অনুভব করেছেন বিনাশের মধ্যে অপার করুণা, কাজী নজরুলের ভাষায়—ধ্বংসের বুকে সৃষ্টির নব পূর্ণিমা'। কারুণ্য, সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং 'ধ্বংসের অবিনাভূত বিগ্রহ এই মহাকালী। ভক্তের ধ্যাননেত্রে মহাপ্রকৃতির, চিন্ময়ী মহাশক্তির পরিপূর্ণ চিত্র এই মহাকালিকা।

দুই হস্তে তিনি পালন করেন, আর দুই হস্তে করেন বিনাশ। বামদিকের খড়্গ এবং মুণ্ড ধ্বংসের প্রতীক। দক্ষিণ হস্তের একটিতে বর ও আর একটিতে অভয়-মুদ্রায় কল্যাণৈষণা প্রকটিত। দাক্ষিণ্যযুক্তা বলেই তিনি দক্ষিণাকালী, মঙ্গল তথা ভদ্র দান করেন বলেই ভদ্রকালী। সার্মাগ্রকতার পূর্ণ অভিব্যক্তি এই অভিনব দেবী-বন্দনা। গলদেশে মুণ্ডমালা। সেই মুণ্ড আবার ঠিক পঞ্চাশটি। মস্তক হচ্ছে জ্ঞানশক্তির আধার। জ্ঞানকে প্রকাশ করা হয় বাক্যের মাধ্যমে। বাক্য হচ্ছে বর্ণসমষ্টি। দেবভাষা সংস্কৃতে বর্ণমালা হচ্ছে পঞ্চাশটি —'অ হতে ক্ষ' পর্যন্ত। এই পঞ্চাশটি বর্ণের মাধ্যমেই তাদের বিচিত্র বিন্যাসের দ্বারা শব্দ গঠন করে নিখিল জ্ঞানকে প্রকাশ করা হয়। এই পঞ্চাশটি বর্ণের মালিকা শব্দব্রহ্মের বহিরঙ্গ প্রকাশ। জ্ঞানশক্তির উৎস এই মহাকালিকা। তাই কণ্ঠে তাঁর জ্ঞানমন্ত্রের প্রতীক পঞ্চাশটি মুণ্ড। মাতৃমূর্তির ঘনকৃষ্ণ আলুলায়িত কেশরাশি মৃত্যুর রহস্যের দ্যোতক। বর্ণ পশ্চাতে তাঁর—ঘন কৃষ্ণ। 'মহামেঘপ্রভা শ্যামা'—তিনি! আকাশ অনন্ত, সমুদ্র অনন্ত—তাই নীল। তিনিও অনন্তা। তাই ঘন নীল। আকাশ এবং সাগরের মত নিরাকারা এবং অসীমা বলেই তিনিও কৃষ্ণবর্ণা। দিগ্‌দেশের সীমাতীতা বলেই তিনি দিগম্বরী। কর্মের মুখ্য অবলম্বন হস্ত কর্মশক্তির দ্যোতক। সেই হস্তরাজি তাঁর মেখলা। জীবের কর্মশক্তির উৎস তিনি; কর্মফলের আশ্রয়ও তিনি। ত্রিনয়নে অন্ধকারবিনাশী চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি। এই ত্রিনয়ন দিয়ে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান-ত্রিকালকেই তিনি দেখেন। আবার সত্য, শিব ও সুন্দরেরও প্রতীক তাঁর এই ত্রিনয়ন। পীনোন্নত বক্ষোদ্বয় ক্ষীরামৃতে পূর্ণ। এক স্তন্যধারায় সন্তানকে পালন করেন, অন্য স্তনামৃতে সাধককে নিজের অমৃতময় স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়ে থাকেন। শ্বেত দন্তপংক্তির দ্বারা রক্তিম জিহ্বাকে দংশন করে সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণকে সংযত করার

শিক্ষা দান করছেন। চরণতলে ব্রহ্মপুরুষ শিব মহাশক্তির অধীনতাই বিজ্ঞাপিত করছেন। মহাপ্রকৃতিরূপিণী তিনি নিয়ত সৃষ্টিশীলা, লীলাপরায়ণা। তাইতো জগৎ নিয়তই গমনশীল, পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে চলেছে! প্রতীচ্য কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের সত্যটি এখানে স্বীকৃত হয়েছে—

'The old order changeth
Yielding place to new,
And God fulfils Himself
in many ways, lest one good custom
should corrupt the world.'

শ্মশান তাঁর বাসস্থান অর্থাৎ শয়নস্থান। নিখিল জীবের অন্তিম শয়ন শ্মশানে। সেই শ্মশানেই আসন পেতে সর্বজীবজননী তিনি পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী দরিদ্র, সবল-দুর্বল, পুণ্যাত্মা-পাপকর্মা সকলকেই কোলে আশ্রয় দেন। আধি-ব্যাধি, রোগ-শোক, বিরহ সন্তাপ সবই মুছিয়ে দেন এই শ্মশানবাসিনী কল্যাণী মাতা তাঁর কল্যাণ হস্তের স্পর্শে। করালবদনা তিনি আবার সুখ-প্রসন্নবদনা। শান্তি, শক্তি, ভুক্তি, মুক্তির দাত্রী এই মাতা কালিকা।

কালিকা, বিষ্ণুধর্মোত্তর, পদ্ম, ভবিষ্য ও দেবী পুরাণে এবং খিল হরিবংশে রুদ্রাণীরূপে তিনি বর্ণিতা। দশমহাবিদ্যারূপেও দশবিধ মূর্তিতে তিনি বিবিধ লীলায় সাধকের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছেন। যেমন—

'কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥'

এ ছাড়াও বিবিধ লীলা এবং কৃপার স্মরণে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধকদের দ্বারা তিনি শ্মশানকালী, ভদ্রকালী, সিদ্ধকালী, আদ্যাকালী, অর্ধকালী, গুহ্যকালী, রক্ষাকালী, মহাকালী, বিমলা কালী, রটন্তী কালী, শ্যামলা কালী, চামুণ্ডা কালী, হংসকালী, ফলহারিণী কালী রূপে বন্দিতা হন। তবে 'ব্রহ্মযামলে' 'আদ্যাস্তোত্রে' বলা হয়েছে 'কালিকা বঙ্গদেশে চ'—বঙ্গভূমিতে 'কালিকা' নামেই তিনি বিশেষভাবে পূজিতা। আর সেই পূজাও বেশির ভাগই অনুষ্ঠিত হয় কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'তন্ত্রসার,' পরমহংস ব্রহ্মানন্দের 'শাক্তানন্দতরঙ্গিণী', এবং পূর্ণানন্দ পরমহংসের 'তারা রহস্য,' গ্রন্থের বিধি অনুসারে। তন্ত্রানুসারে শক্তিসাধনার পুণ্যপীঠ এই বঙ্গভূমি। শক্তির বন্দনায় বাংলার ভক্তিশুদ্ধ চিত্ত উদ্বেল হয়ে ওঠে। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, ভক্ত রামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণ, সাধক সর্বানন্দ, তারাসাধক বামাক্ষ্যাপা, পরমহংস রামকৃষ্ণদেব, আচার্য নিগমানন্দ এবং আরো কত সাধক তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন এই বাংলার সাধনতীর্থে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবও আন্তরজীবনে

সর্বভূতে মাতৃত্বের দর্শনে সাধক হন কামজিৎ। কামের বিনাশে আসে প্রেম। প্রেমই হল মানুষে মানুষে মিলনের যোজকশক্তি তথা সিমেন্ট। বিদ্বেষের বিষবাষ্প এবং অহংকারের ঔদ্ধত্য আজ সভ্যতাকে সংকটাপন্ন করেছে। তাই মহাকালিকার বন্দনার দ্বারা অহংকারের বিনাশ এবং প্রেমের বিকাশে সংকল্প গ্রহণ করুক বিশ্বমানব।—

'বন্দে দানবনাশিনীং ভয়হরাং বন্দে মহাকালিকাম্।'

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
৩	১০	সবারই	সবারি
৩	৩২	Converted	Converled
৬	৩০	অমানবিক	আমানবিক
৯	২৩	Parents if	Parents f
১০	২৪	মনুষ্য	মনুষ্য
১০	৩৩	অ-আ-ক-খ	আ বা ঘ
১১	৩	স্বপ্নাবিষ্ট	সপ্নাবিষ্ট
১১	১৯	নিরীশ্বরবাদী	নিরীশ্বরবাদী
১২	২৯	suicides increased	suicldes incroased
২১	৩২	self-destruction	self-desstructin
২৩	৪	extreme	rexireme
২৪	৩৪	পরিব্রাজক	পরিব্রজক
৩০	২	সুফলাং	সফলাং
৩৩	১৭	রাখী-বন্ধন	রাখী, বন্ধন,
৩৫	১২	throat	throst
৫৯	২৯	অভিলাষ	অ ভলাষ
৭৫	১২	রামমোহন	রমেমোহন
৭৮	২৪	ভাষায়	ভাযার
৯২	৫	প্রশংসনীয়	প্রসংসনীয়
৯৩	৩	more perfect	re perfectmo
৯৪	১০	ব্যাধিষু	ব্যাধিযু
„	২১	convulsions	convlsin
„	২৬	sound	sond
৯৮	১১	renaissance	reneissance
১০৪	৮	আঞ্চলিক	আঞ্চলক
১০৪	২১	অরবিন্দ	অরাবিন্দ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
১০৫	৪	scripture	scipture
"	১৩	on	n
"	"	and	end
১১৯	৩২	sarojini	sarajturi
১২০	১২	have	haue
১২৭	৩২	which	whick
১৩৫	১২	used	rsed
১৪৯	১৮	দেবভাষেতি	দেবভাযেতি
১৫১	৪	whether	wether
১৫৮	২৯	গ্রন্হনা	গ্নন্হনা
১৬২	১৬	পশ্চিমবঙ্গ	পশ্চিমঙ্গ
১৬৬	৩৩	wi h	withe
১৬৯	২	teaching	terching
২০৪	১৪	সৌভাগ্যের	সৌভাগেরে
২০১	১৭	রামতনু	রামতানু
২০৯	২৬	রামতনু	রাজতনুজ
২১০	২১	রাজনারায়ণ	রাজানারায়ণ ।
২২১	২০	even	Eeven
২২৫	২৯	তথাপি	তথয়াপি
২২৬	৩২	গুরু	গুর
২৩১	২৪	ধর্মার্থ	ধর্মর্থ
	৩০	সংকল্প্য	সংকল্প
	৩৩	থর্বণাদপি	থর্বনাদপি
২৩৪	১৮	করান্	করান
২০৯	২৪	নাট্যেঽস্মিন্	নাটেঽস্মিন্
২৪৮	৬	যতোঽভ্যুদয়	যতেঽভু দয়
২৫০	২৫	ত্যাজ্য	ত্যাজ্য
২৫৫	৫	মহম্মাদি	মহম্য